গবেষণা-গ্রন্থ

যুদ্ধশিশু

একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী

নৌপ্রকৌ. সাজিদ হোসেন
কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

গবেষণা-গ্রন্থ

যুদ্ধশিশু

একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী

ছবি : ভাস্কর সুসান ক্লিনার্ড

গবেষণা-গ্রন্থ

যুদ্ধশিশু

একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী

নৌপ্রকৌ. সাজিদ হোসেন
কিশোর মুক্তিযোদ্ধা
মধুপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প [সেক্টর - ৭]

খড়িমাটি

গবেষণা-গ্রন্থ
যুদ্ধশিশু
একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী
নৌপ্রকৌ. সাজিদ হোসেন

লেখক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সূত্র সংরক্ষিত

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০২২
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৯

প্রচ্ছদ সুকান্ত চৌধুরী

প্রকাশক খড়িমাটি, কদম মোবারক লেইন, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭১১ ৯০৩২১২

পরিবেশক উজান, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা

মুদ্রণ দ্য খড়িমাটি প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম

বিনিময় ৫০০ টাকা

Juddhashishu Ekattore Orunodoyer Ognishakki (War Babies of'71) by MarEngr. Sajid Hussain
Second Published in February Book Fair 2022
First Published in February Book Fair 2009
Published by Kharimati, Kodom Mubarok Lane, 35 Momin Road
Chattogram, Bangladesh, +88 01711 903212
e-mail : kharimatibd@gmail.com
www.kharimati.com

Price : 500 taka 500rs 30$

ISBN 978-984-96406-9-1

উৎসর্গ

দেলোয়ারা বেগম
যুদ্ধোত্তরকালে পাবনা বীরাঙ্গনা হাসপাতালের সেবিকা

এবং
রায়ান বাদল
কানাডায় দত্তকায়িত বাঙালি যুদ্ধশিশু
কানাডায় নির্মিত 'ওয়ার বেবীজ' তথ্য-চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র

লেখকের অন্যান্য প্রকাশনা

১. কসমিক কল্পলোকে (বৈজ্ঞানিক কল্পকথা) - খড়িমাটি প্রকাশন বইমেলা ২০২১
২. সাতসমুদ্রে পঁচিশ হাজার নটিক্যাল মাইল (সামুদ্রিক নিবন্ধ সমাহার) - খড়িমাটি প্রকাশন বইমেলা ২০২০
৩. ক্যাম্পের কিশোর (মুক্তিযুদ্ধ) - খড়িমাটি প্রকাশন বইমেলা ২০১৯
৪. সাগর নীলে পংক্তিমালা (কবিতা) - হাতেখড়ি প্রকাশন বইমেলা ২০১৮
৫. ঠিকানা সমুদ্রে (সামুদ্রিক নিবন্ধ সমাহার) - আদি প্রকাশন বইমেলা ২০১৭
৬. রঙ বাহারি সমুদ্র-জীবন! (সামুদ্রিক নিবন্ধ সমাহার) - আদি প্রকাশন বইমেলা ২০১৬
৭. সমুদ্রচারণের প্রতিধ্বনি (সামুদ্রিক নিবন্ধ সমাহার) - আদি প্রকাশন বইমেলা ২০১৬
৮. সমুদ্র পথিক (সমুদ্র-ভ্রমণকাহিনী) - আদি প্রকাশন বইমেলা ২০১৫
৯. সাগরনীলে গল্পগাথা (গল্পগুচ্ছ) - আদি প্রকাশন বইমেলা ২০১৫
১০. বিজ্ঞান বিপ্লবে বিস্ময়কর ভবিষ্যত! (সাইন্স-ফ্যাক্টশন) - অন্বেষা প্রকাশন বইমেলা ২০১২
১১. মহাকাশের অতিথি (কল্পবিজ্ঞান) - অন্বেষা প্রকাশন বইমেলা ২০১১
১২. মেইডেন ভয়েজ (সমুদ্র-ভ্রমণকাহিনী) - অন্বেষা প্রকাশন বইমেলা ২০১০
১৩. এ প্রোপোজাল ফর এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ইন বাংলাদেশ (গবেষণা) - ভিডিএম (ভার্লাগ ড. মুলার) জার্মানী ২০১০
১৪. একাত্তরের যুদ্ধশিশু (মুক্তিযুদ্ধ) - সময় প্রকাশন বইমেলা ২০০৯
১৫. কিশোর মুক্তিযুদ্ধ কোষ [সম্পাদনা: অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন; রচনা: ২০ জন লেখক] (মুক্তিযুদ্ধ) - সময় প্রকাশন বইমেলা ২০০৮
১৬. নভোলোকে রূপালী জোয়ার (কল্পবিজ্ঞান) - বিজয় প্রকাশনী বইমেলা ২০০৬
১৭. নভোনীল (কল্পবিজ্ঞান) - সূচীপত্র প্রকাশনী বইমেলা ২০০৫
১৮. অটোক্যাড ২০০২ - ২য় খন্ড: অ্যাডভান্সড ড্রইং (কম্পিউটার) - পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স বইমেলা ২০০৪
১৯. অটোক্যাড ২০০২ - ১ম খন্ড: হাতেখড়ি (কম্পিউটার) - পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স বইমেলা ২০০৩
২০. এসো কম্পিউটারের রাজ্যে (কম্পিউটার) - জ্ঞানকোষ প্রকাশনী বইমেলা ২০০২
২১. কম্পিউটার: জানার আছে অনেক কিছু (কম্পিউটার) - মাওলা ব্রাদার্স বইমেলা ২০০১
২২. একাত্তরের প্রমিথিউস (মুক্তিযুদ্ধ) - কলম্বিয়া প্রকাশনী বইমেলা ২০০০
২৩. এ প্রোপোজাল ফর এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ইন বাংলাদেশ (গবেষণা) - ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, সুইডেন ১৯৯৮

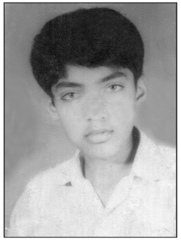

উপক্রমণিকা

জানুয়ারি ১৯৭২ সাল। বয়স ১২। নওগাঁর উত্তরে সীমান্তবর্তী মধুপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে মাত্র কয়েকদিন আগে ফিরেছি নিজ জেলা শহর পাবনায়। ফিরলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণ ভস্মীভূত আমাদের বাড়িতে। প্রবেশের মুহূর্তে বাসার ভেতরে পাঁচটি মাথার খুলিই ছিল পোড়োবাড়িতে ফিরে পাওয়া 'জিনিসপত্র'! অভিমান, রাগ, ক্ষোভ, প্রতিশোধ... বিজয়ের আনন্দের অবকাশ কোথায়? নিজেরাসহ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে শহীদ, অত্যাচারিত, ধর্ষিত — এরকম বিপর্যস্ত মন নিয়েই আবার শুরু হল যাত্রা। আর আসলে সারা বাংলার সবাই ছিল নিকটাত্মীয়; শুধু জামাত-রাজাকার দালালচক্র ছাড়া।

অল্পদিনের মধ্যেই নতুন একটা সম্মানসূচক শব্দ উচ্চারিত হল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠে। বীরাঙ্গনা! সেইসঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে আরো এক শব্দ... বীরাঙ্গনা-শিশু [যুদ্ধশিশু]! পাবনা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিদেশে ওইসব শিশুদেরকে পাঠানোর সময়ে আমার মনে হতো নিষ্পাপ শিশুগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ফসল। তারা কেন যাবে নির্বাসনে! যুদ্ধকালে ধর্ষণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি যুদ্ধাপরাধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে, পাকিস্তানি সেনাচক্র, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, পাকিস্তানি সেনাদের এদেশীয় দালালচক্র (জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রসংঘ, রাজাকার বাহিনী, আল-বদর, আল-শামস, শান্তি কমিটি ও মুসলিম লীগ) বিদ্রোহী বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংস করে অনুগত পাকি-বাঙালি জাতিসত্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সংঘটিত করেছে বর্বর 'গণধর্ষণ'। সেই লক্ষ্যপূরণে জন্ম দিয়েছে ২৫ হাজার যুদ্ধশিশুর। কয়েক লক্ষ বাঙালি নারীকে অপমানের মাধ্যমে পুরো বাঙালি জাতিকে অপমান করেছে তারা।

এই ঘৃণ্য অপরাধের বিচার চাই।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সাজিদ হোসেন [রুশো]
কিশোর মুক্তিযোদ্ধা
মধুপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প [সেক্টর- ৭]

ছবি : সংগৃহীত

মৃত্যুর দুয়ার থেকে... ৯ বার!

১৯৫৯ : মৃত জন্ম!
১লা সেপ্টেম্বর: জন্মের পর... আমার কোনো নড়াচড়া ছিলনা। চোখ বন্ধ। হৃৎস্পন্দনও অস্পষ্ট। ডা: এস বি দে-র কাছে মনে হয়েছিল যে আমি মৃত! প্রায় আধঘণ্টা পর, আম্মার কথায়, আমার শরীরের ওপরে ডাক্তারের হাতের স্পর্শ ও ঝাঁকুনিতে হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট হয়, চোখ খুলি এবং কেঁদে উঠি। তারমানে জন্মের আধঘণ্টা পর বেঁচে উঠলাম!

১৯৬৫ : দোতলা থেকে পতন!
(৬ বছর বয়সে) দোতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যায়; তবে বেঁচে থাকি!

১৯৬৭ : নাইট্রিক এসিডে ডিমভাজি খেয়েও বেঁচে গেলাম!
তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ে এক সকালে আমার নাস্তার ডিমটা ভুল করে সরিষার তেলের বদলে নাইট্রিক এসিড মেশানো সরিষার তেলে ভাজা হয়ে যায়! নানী ভুল করে চাচার কলেজের প্র্যাকটিক্যালের জন্য কেনা নাইট্রিক এসিডের সোনালি রঙের বোতল, সরিষার তেল মনে করে, রান্নাঘরে নিয়ে এসে আগের সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রাখে। আর সেটাতেই ঘটে সেই বিপত্তি। নাইট্রিক এসিডের স্বাদ নেয়ারও সৌভাগ্য (!) হল। যাহোক, আবারো বেঁচে গেলাম!

১৯৭১ : রাজাকার ও শান্তি কমিটির হাতে আটক!
জুলাই : সীমান্তবর্তী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার ত্রিমোহনীতে আমি আর আব্বা ধরা পড়ি রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকদের হাতে। অনেক কৌশলে বেঁচে যাই।

২০০৩ : গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট!
১৩ জানুয়ারি : মেরিন একাডেমি থেকে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে যাওয়ার পথে, গরুকে বাঁচাতে গিয়ে, ব্রীজের সঙ্গে গাড়ির (একাডেমির মাইক্রো ০১৩৯) সজোরে ধাক্কা লাগে; আমি এবং ড্রাইভার জামাল প্রাণে বেঁচে গেলেও যথেষ্ট আহত হই; একমাস বিছানায় ছিলাম। সেযাত্রায় বেঁচে গেলাম।

২০১৬ : মস্তিষ্কে অপারেশন!
২৩ ফেব্রুয়ারি : 'সিএসএফ রাইনোরিয়া'-জনিত কারণে মস্তিষ্কে অপারেশন (ভেলোরে প্রায় ৭-ঘণ্টাব্যাপী)। মস্তিষ্কের মেনিনজাইটিস-সহ ঝুঁকি থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেলাম!

২০১৮ : হৃদয়ে হাতুড়ির বাড়ি!
২৮ ফেব্রুয়ারি : হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়ায় আঘাত (কার্ডিয়াক অ্যাটাক)। ইউনাইটেড হাসপাতালে একটি স্টেন্টিং-সহ চিকিৎসায় সুস্থ্য হয়ে উঠি।

২০১৯ : হাতির হাত থেকেও বেঁচে গেলাম!
২ আগস্ট : প্রতিদিনের প্রাত:ভ্রমনের (দীর্ঘ ২৮ বছরের অভ্যাস) সময়ে একাডেমির দক্ষিণে কবর স্থানের পাশে হঠাৎ মুখোমুখি অতিকায় এক বুনোহাতির! মাত্র ১৫/২০ গজ দূরে। তার ডান চোখ একটা গাছের আড়ালে থাকায় আমাকে দেখতে পাচ্ছিলনা। প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও, আল্লাহতায়ালার ওপরে ভরসা রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম; কারণ দৌড়ালে পায়ের শব্দ টের পেয়ে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু! বাহ... একটু পর সে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল। আমিও আমার পথে চলতে শুরু করলাম।

২০২১ : করোনার করাল থাবায়!
৫ জুন : মার্চ ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত, করোনায় আক্রান্ত পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের মিছিলে আমিও আক্রান্ত হলাম; পরিবারসহ। ২৪শে জুন সনদ পেলাম – করোনামুক্ত!

পুনশ্চ ...
বর্তমানে, মহান আল্লাহতায়ালার দয়ায় সুস্থভাবেই বেঁচে আছি এবং সোৎসাহে আনন্দময় জীবন কাটাচ্ছি। প্রিয়পাঠক, দোয়া করবেন।

– সাজিদ হোসেন (রুশো)

কৃতজ্ঞতা

ব্যক্তিবর্গ

মাদার তেরেসা - বিশ্বনন্দিত মানবসেবী
অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন - ইতিহাসবিদ ও গবেষক
সুসান ব্রাউনমিলার - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]
আবদুল গাফফার চৌধুরী - সাংবাদিক ও কলাম-লেখক
অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল - দেশের অগ্রপথিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক
ফরিদ আহমেদ - স্বত্বাধিকারী, সময় প্রকাশন
ডা. জিওফ্রে ডেভিস - যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বীরাঙ্গনাদের সেবাদানকারী চিকিৎসক [অস্ট্রেলিয়া]
সান্ড্রা সিম্পসন - সাহায্যকর্মী ও ঢাকায় 'ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের' প্রতিষ্ঠাতা [কানাডা]
বিচারপতি কে. এম. সোবহান (প্রয়াত) - নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রধান
ড. নিলীমা ইব্রাহিম (প্রয়াত) - লেখক এবং 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইয়ের রচয়িতা
বীণা ডি'কস্টা - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক [অস্ট্রেলিয়া]
আর. চার্লি কার্পেন্টার - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক
কাই গ্রেগ, ডোনা শার্কে এবং জ্যুলিয়া বালদি - আর. চার্লি কার্পেন্টারের পরামর্শক
রবিন হুইলার এবং বেটসি জোস-থোটা - আর চার্লি কার্পেন্টারের গবেষণা সহযোগী
রেমন্ড প্রভেনশার - 'ওয়ার বেবিজ' তথ্যচিত্রের নির্মাতা [কানাডা]
লিজ ট্রোটা - সাংবাদিক, আমেরিকার এনবিসি টেলিভিশন
নয়নিকা মুখোপাধ্যায় - বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক, প্রভাষিকা, ল্যাংকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
হাসান মাহমুদ [ফতে মোল্লা] - লেখক, কানাডা প্রবাসী
মুস্তাফা চৌধুরী - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক, কানাডা প্রবাসী
কবি নাসির আহমেদ - সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক সমকাল
আহসান হাবীব - সম্পাদক, মাসিক উন্মাদ
আলী হাবীব - দৈনিক জনকণ্ঠ
আখতার হোসেন - দৈনিক জনকণ্ঠ
অদিতি রহমান - সাংবাদিক
কানিজ রসুল - কর্মকর্তা, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, পাবনা [সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত]
আলম খোরশেদ - বিশদ বাংলা, চট্টগ্রাম
সুমিমা ইয়াসমিন, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম
ফাহমিদা ইয়াসমিন, ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
হিমেল, আরিফ, সৌরভ, শান্তনা, সন্জয়, মাহবুব, ফাহিম - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী
[হিমেল ও আরিফ 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' শীর্ষক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও-চিত্রের নির্মাতা]
অমি রহমান পিয়াল - গবেষক ও লেখক
হার্জি মালিক - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক
লিসা কাতাইয়ামা - শিক্ষানবিশ সম্পাদক, অনলাইন পত্রিকা 'মাদার জোনস'
পিটার ট্যাচেল - সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী
লরা স্মিথ-স্পার্ক - সাংবাদিক, বিবিসি
ডেবরা ডিলায়েট - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক
সিওভান ম্যাকেভয়-লেভি - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক
ডেবরা ইয়পসন - যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক
সিয়ান পাওয়েল - সাংবাদিক
সিয়ানা পাসিক - কানাডা প্রবাসী বসনীয় যুদ্ধশিশু
ম্যাথিউ হেজ - সাংবাদিক
জর্জ জাহ্ন - মেইল অ্যান্ড গার্ডিয়ান অনলাইন [সারায়েভো, বসনিয়া-হারজোগোভিনা]
আইদা কার্কেজ-রবিনসন - লেখক, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস
শাকিল আহমেদ ইবনে মাহমুদ - নিবন্ধ রচয়িতা, সাপ্তাহিক হলিডে
কবি জাকির - 'যুদ্ধশিশু' কবিতার রচয়িতা
আলহাজ অ্যাড. আমজাদ হোসেন [বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সাংসদ] - আমার পিতা
অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস [মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক ও সাবেক সাংসদ] - আমার মা
মুহম্মদ আজিজুল হক - লেখক ও সাবেক যুগ্ম-সচিব [আমার শ্বশুর]
সিতারা আজিজ - [আমার শাশুড়ি]
মেহের নিগার বুলা [প্রধান শিক্ষয়িত্রী (১৯৯৩ - ২০০৫) ও সভাপতি (২০২২-অদ্যাবধি) মেরিন একাডেমি কেজি স্কুল] - আমার স্ত্রী
সিয়াম সাজিদ দীপ্র, নিসর্গ নিগার দ্যুতি ও বহ্নিশিখা নিগার দিয়া - আমার পুত্র ও দুই কন্যা এবং অসংখ্য বন্ধু-প্রিয়জন

গ্রন্থ

'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' - নীলিমা ইব্রাহিম, 'ফিরে দেখা ৭১' - ইন্টারনেট সংস্করণ,
'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ - কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' - শামীমা বিনতে রহমান সম্পাদিত

ওয়েবসাইট

জাতিসংঘ, ইউএনডিপি, বিবিসি, দৃষ্টিপাত, ফিল্মঅপশন, ম্যাকুমবা ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন, উইকিপেডিয়া, মুক্ত-মনা, জেনোসাইড বাংলাদেশ, জেন্ডারসাইড, জেনোসাইড টেক্সট, সচলায়তন,
রেফারেন্স ডট কম, বাংলাদেশ মেরিনার্স ডট কম

প্রতিষ্ঠান

জাতিসংঘ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, একুশে টিভি, এনটিভি, এটিএন বাংলা, অরকা [ওল্ড রাজশাহী ক্যাডেটস অ্যাসোসিয়েশন]

পত্রিকা

নিউজউইক, দি নিউইয়র্ক টাইমস, দি গার্ডিয়ান, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আমাদের সময়

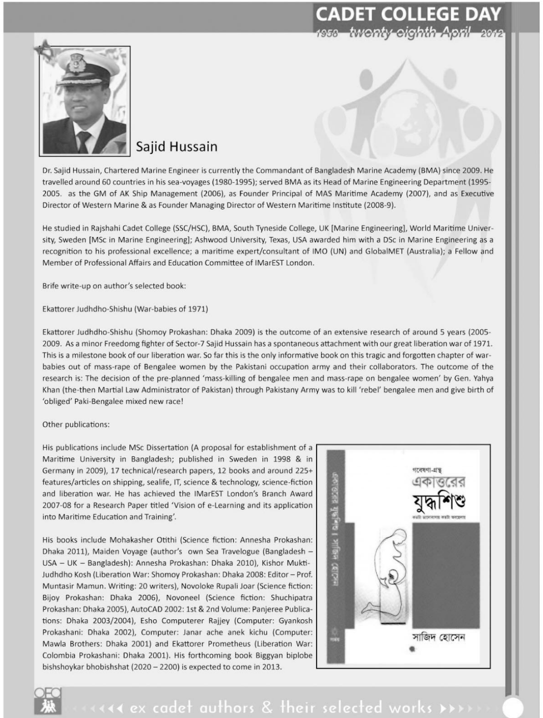
CADET COLLEGE DAY

1958 twenty eighth April 2012

Sajid Hussain

Dr. Sajid Hussain, Chartered Marine Engineer is currently the Commandant of Bangladesh Marine Academy (BMA) since 2009. He travelled around 60 countries in his sea-voyages (1980-1995); served BMA as its Head of Marine Engineering Department (1995-2005. as the GM of AK Ship Management (2006), as Founder Principal of MAS Maritime Academy (2007), and as Executive Director of Western Marine & as Founder Managing Director of Western Maritime Institute (2008-9).

He studied in Rajshahi Cadet College (SSC/HSC), BMA, South Tyneside College, UK [Marine Engineering], World Maritime University, Sweden [MSc in Marine Engineering]; Ashwood University, Texas, USA awarded him with a DSc in Marine Engineering as a recognition to his professional excellence; a maritime expert/consultant of IMO (UN) and GlobalMET (Australia); a Fellow and Member of Professional Affairs and Education Committee of IMarEST London.

Brife write-up on author's selected book:

Ekattorer Judhdho-Shishu (War-babies of 1971)

Ekattorer Judhdho-Shishu (Shomoy Prokashan: Dhaka 2009) is the outcome of an extensive research of around 5 years (2005-2009. As a minor Freedomg fighter of Sector-7 Sajid Hussain has a spontaneous attachment with our great liberation war of 1971. This is a milestone book of our liberation war. So far this is the only informative book on this tragic and forgotten chapter of war-babies out of mass-rape of Bengalee women by the Pakistani occupation army and their collaborators. The outcome of the research is: The decision of the pre-planned 'mass-killing of bengalee men and mass-rape on bengalee women' by Gen. Yahya Khan (the-then Martial Law Administrator of Pakistan) through Pakistany Army was to kill 'rebel' bengalee men and give birth of 'obliged' Paki-Bengalee mixed new race!

Other publications:

His publications include MSc Dissertation (A proposal for establishment of a Maritime University in Bangladesh; published in Sweden in 1998 & in Germany in 2009), 17 technical/research papers, 12 books and around 225+ features/articles on shipping, sealife, IT, science & technology, science-fiction and liberation war. He has achieved the IMarEST London's Branch Award 2007-08 for a Research Paper titled 'Vision of e-Learning and its application into Maritime Education and Training'.

His books include Mohakasher Otithi (Science fiction: Annesha Prokashan: Dhaka 2011), Maiden Voyage (author's own Sea Travelogue (Bangladesh – USA – UK – Bangladesh): Annesha Prokashan: Dhaka 2010), Kishor Mukti-Judhdho Kosh (Liberation War: Shomoy Prokashan: Dhaka 2008: Editor – Prof. Muntasir Mamun. Writing: 20 writers), Novoloke Rupali Joar (Science fiction: Bijoy Prokashan: Dhaka 2006), Novoneel (Science fiction: Shuchipatra Prokashan: Dhaka 2005), AutoCAD 2002: 1st & 2nd Volume: Panjeree Publications: Dhaka 2003/2004), Esho Computerer Rajjey (Computer: Gyankosh Prokashani: Dhaka 2002), Computer: Janar ache anek kichu (Computer: Mawla Brothers: Dhaka 2001) and Ekattorer Prometheus (Liberation War: Colombia Prokashani: Dhaka 2001). His forthcoming book Biggyan biplobe bishshoykar bhobishshat (2020 – 2200) is expected to come in 2013.

ex cadet authors & their selected works

ওল্ড ফৌজিয়ানস এসোসিয়েশন কর্তৃক সম্মাননা

সূচীপত্র

অধ্যায়- ১ : বাংলাদেশে কেন যুদ্ধশিশুর জন্ম! ১৭

মুক্তিযুদ্ধকালে গণধর্ষণ ও যুদ্ধশিশুর জন্ম

জেনোসাইড

বিদ্রোহী বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংস করে অনুগত

'পাকি-বাঙালি' জাতিসত্তা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র!

অধ্যায়- ২ : বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু ২৭

কারা যুদ্ধশিশু?

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুর সংখ্যা

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

মুক্তিযুদ্ধকালের যৌন-সন্ত্রাস

অধ্যায়- ৩ : বাংলাদেশে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু বিষয়ক পদক্ষেপ ৪৭

পাবনার বীরাঙ্গনা হাসপাতালের দৃশ্যপট

মাদার তেরেসার আঁচলে যুদ্ধশিশু

বীরাঙ্গনার মনোবেদনা

বাংলাদেশে বীভৎস যৌন-সন্ত্রাস

জাতীয় সমস্যার পরিদৃষ্টিতে যুদ্ধনারী ও যুদ্ধশিশু

যুদ্ধশিশুদের দত্তকায়ন

বীরাঙ্গনাদের জন্য সেবাদান কার্যক্রম

ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন

অধ্যায়- ৪ : নারীর শরীরও যুদ্ধক্ষেত্র! ৮৯

সাহসী বাঙালি নারীর দুর্বিনীত প্রতিবাদ!

যুদ্ধের অস্ত্র রূপে ধর্ষণ

ধর্ষিতার নাজুক অবস্থান এবং গর্ভপাত

গর্ভপাতের নৈতিক সঙ্কট

অধ্যায়- ৫ : বিশ্বের যুদ্ধশিশু ১০৯

দেশে দেশে যুদ্ধশিশু

ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন আইডেন্টিটি প্রজেক্ট ২০০১

যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের যুদ্ধশিশুদের প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি

কেস স্টাডি: বসনিয়া-হারজেগোভিনা

কেস স্টাডি : পূর্ব তিমুর
কেস স্টাডি : দারফুর

অধ্যায়- ৬ : যুদ্ধশিশুর অধিকার, সংশ্লিষ্ট যুদ্ধাপরাধ এবং বিচার ১৩১
শিশু অধিকার কনভেনশন
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ
লিঙ্গভেদ, জাতিসত্তা এবং যুদ্ধশিশুর অধিকার
যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার-ভাবনা
যুদ্ধশিশু এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি
অধিকারের দ্বন্দ্ব
প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা এবং নীরবতা: ধারণা এবং বাস্তবতার উভয়-সঙ্কট

অধ্যায়- ৭ : উপসংহার ১৭৫
পরিশিষ্ট ১৭৯
১. বাংলাদেশ ছেড়ে নতুন নীড়ের পথে যুদ্ধশিশুরা
২. নির্বাসিত যুদ্ধশিশু একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী!
৩. বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু - ১ ও ২
৪. বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু 'অস্ট্রেলীয় গীতা'!
৫. পূর্ব তিমুরের যুদ্ধশিশু রাই
৬. সঙ্গীতজ্ঞ যুদ্ধশিশু এরিক ক্ল্যাপটন
৭. যুদ্ধশিশু বিষয়ক কয়েকটি চলচ্চিত্র
৮. ওয়ার বেবিজ (নেস ডে লা হাইন) - রেমন্ড প্রভেনশারের একটি তথ্য-চলচ্চিত্র
৯. রেমন্ড প্রভেনশার - জীবনচিত্র
১০. পিতার পাপ - ধর্ষণে জন্ম নেয়া শিশুর রেখাচিত্র
ম্যাথিউ হেজের কলমে 'ওয়ার বেবিজ' চলচ্চিত্র
ওয়ার বেবীজ - একটি বিশ্লেষণ
ওয়ার বেবীজ - একটি পর্যালোচনা
১১. সীয়ানা পাসিক : ব্যাক টু বসনিয়া
১২. বসনীয় যুদ্ধশিশুদের মনে সুপ্ত প্রশ্ন
১৩. যুদ্ধশিশু বিষয়ক সঙ্গীত
১৪. যুদ্ধশিশু বিষয়ক কবিতা
১৫. যুদ্ধশিশু বিষয়ক সংবাদ
১৯৭৫ : যুক্তরাজ্যে নামল 'অপারেশন বেবী-লিফট'
২৮ মে ২০০৪ : নাজি উত্তরাধিকার–জার্মান সেনাদের ঔরসে ৫০ হাজার ডাচ যুদ্ধশিশু!
১৭ এপ্রিল ২০০৫ : ডেনমার্কের বিস্মৃত শত্রু-সন্তান
১৬ মে ২০০৫ : যুদ্ধশিশুরা ফিরছে তাদের উত্তরাধিকারে
১১ জুন ২০০৫ : যুক্তরাষ্ট্রে দত্তকায়িত শিশুরা ফিরছে ভিয়েতনামে
২২ জুলাই ২০০৬ : তিমুরে জাতিসংঘের লজ্জার উত্তরাধিকার
২৯ অক্টোবর ২০০৬ : অবিচারের কারণে সেনা-সন্তানেরা ক্ষুব্ধ
১৬. বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধশিশু 'জয়'
১৭. যুদ্ধশিশু শিখার মেয়ে ক্যাটারিনার সঙ্গে কিছুক্ষণ : ২০১৫ সালের ২২শে নভেম্বরে চট্টগ্রামের শিশুস্বর্গে
১৮. একাত্তরের যুদ্ধনারী-যুদ্ধশিশুদের সেবক ডা. জিওফ্রে ডেভিস

বি.দ্র: *লেখক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সূত্র সংরক্ষিত।*
অধিকাংশ ছবি ইন্টারনেটের সংশ্লিষ্ট সাইট থেকে সংগৃহীত।
এই বইয়ের সকল অংশ যে কোনোরকম দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ মুক্ত।

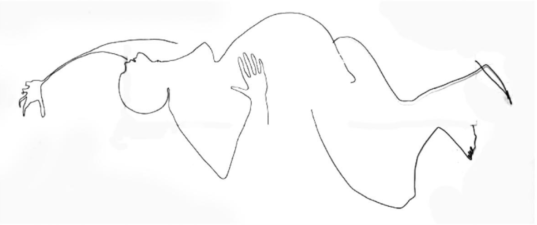

ছবি: ভাস্কর সুসান ক্লিনার্ড

অধ্যায় - ১

বাংলাদেশে কেন যুদ্ধশিশুর জন্ম!

মুক্তিযুদ্ধকালে গণধর্ষণ ও যুদ্ধশিশুর জন্ম

শ্রদ্ধেয় পাঠক, সভ্যতার ইতিহাসের এই অসভ্য পর্বটি সম্পর্কে সম্যক অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে একটু ফিরে তাকাতে হবে অতীতের পাতায়। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরে 'তেইশ বছর ধরে' পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পশ্চিমাদের কোনো আন্তরিকতা ছিল না। বাঙালিরা বুদ্ধিমান হলেও, কূটচালে পাঞ্জাবিরা কুখ্যাত! অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পূর্বের ওপরে পশ্চিম আবির্ভূত হয় প্রভু রূপে! অতএব গড়ে ওঠেনি প্রয়োজনীয় কোনো সম্পর্ক। উন্নয়ন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি বা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ভারসাম্য নিশ্চিত করতেও ব্যর্থ হয় পাকিস্তানের 'কেন্দ্রীয়' প্রশাসন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমীদের উপনিবেশ বা বাজারে পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েও, পূর্ব পাকিস্তানকে আবারও স্বাধীন হয়ে যেতে হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, "[পাকিস্তানের তেইশ বছরে] আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন"! এবার দৃষ্টি দেয়া যাক পাকিস্তান সৃষ্টির দৃশ্যপটে।

১৯৪৭ সালে, পূর্ববাংলা এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধু, পাঞ্জাব,

বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে মুসলিম লীগের 'মুসলিম নেতা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়, ইসলামী নয় বরং, মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। তবে, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে হয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেসময়ে পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী ভারত-পাকিস্তানের জন্ম অর্থাৎ স্বাধীনতার বিপক্ষে গিয়ে, অবস্থান নিয়েছিল বৃটিশরাজের পক্ষে। ইসলাম ধর্মের প্রতি উদাসীন জিন্নাহর পক্ষে, মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়ার সুবাদে, মুসলিম নেতা হওয়া সহজ থাকলেও ইসলামী নেতা হওয়া ছিল অসম্ভব। অতএব পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই 'ইসলাম ধর্ম' ছিল দূর প্রান্তে। পাকিস্তান জন্মের পরে জিন্নাহ এবং তার পশ্চিম পাকিস্তানি সঙ্গীরা মুসলমানিত্বকেও একপাশে ঠেলে দিয়ে 'পাকিস্তানি' জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইতিহাস বলে, হাজার বছরের বাঙালি জাতি সবসময়েই প্রতিবাদী; অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে, রক্ত দিয়েছে, কিন্তু কখনোই পরাজিত হয়নি। অতএব, সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এবং তুলনামূলকভাবে বুদ্ধিমান বাঙালিদের পক্ষে ক্রমশ প্রাধান্য পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় ভীত পাকিস্তানিদের প্রথম লক্ষ্য হয় 'বাঙালি জাতিসত্তা'। প্রথমেই ধাক্কা আসে বাংলা ভাষার ওপরে। তথাকথিত 'হিন্দু ভাষা'-র অপবাদে, হয় বাংলা ভাষাকে আরবী হরফে লিখতে হবে, না হয় একেবারে ভুলে গিয়ে ব্যবহার করতে হবে পাকিস্তানের মাত্র ৬ শতাংশ নাগরিকের ভাষা উর্দু! সে উদ্যোগ সফল না হলেও পরের পদক্ষেপগুলো ব্যর্থ হয়নি। ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলা (বা পূর্ববঙ্গ) প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নতুন নাম পূর্ব পাকিস্তান। পঞ্চাশের দশকে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদেরকে নির্বাচনে বিজয়ের পরেও বারবার ক্ষমতা গ্রহণে এবং দেশ পরিচালনায় যাওয়ার বিরুদ্ধে নানামুখী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা, ষাটের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা, বিতর্কিত শিক্ষা কমিশন চালু করার অপচেষ্টা, পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক সমাজপাঠ বই (যেমন, 'দেশ ও কৃষ্টি' ইত্যাদি) স্কুলে আবশ্যিকভাবে পাঠ্য করা, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সড়ক-রেল-নৌ পথ বন্ধ করা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করা, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালি নেতাদের সুযোগ না দেয়া, জাতীয় অর্থায়নে পূর্বকে গৌণ করা, প্রতিরক্ষায় পূর্বকে অরক্ষিত রাখা - সবই ছিল বাঙালি জাতিসত্তাকে নির্মূল করার বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ।

'আমাদের একটি জীবন নিধন যেথায় করবি তোরা, সেখানেই লক্ষ হয়ে জন্ম নিয়ে জাগব মোরা...' গানটির মতো পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের 'তেইশ বছরের রক্তাক্ত' ইতিহাসের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে বাঙালির জাতিসত্তা

আরো প্রবলবেগে। সেই জাগরণের প্রথম পর্বের নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্বাংশের নেতৃবৃন্দ – শের-এ-বাংলা আবুল কালাম মোহাম্মদ ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। তবে চূড়ান্ত পর্বে এসে নেতৃত্বের শীর্ষ-অবস্থানটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে যায় ষাটের দশকে বাঙালি তারুণ্যের প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। তীব্র জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত ছয়দফার আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে তিনি হন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট এবং গণমানুষের আস্থাভাজন 'বঙ্গবন্ধু'।

ইতিহাসের এই পর্বে বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের পরিকল্পনায় আইয়ুব খানের বদলে আবির্ভূত হয় বর্বর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। বিশেষত, ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের দেশব্যাপী উত্তেজিত জনতার অভূতপূর্ব ব্যাপক এবং সম্ভবত চূড়ান্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনে বিচলিত হয়ে পড়ে পশ্চিমা সামরিক গোষ্ঠী। তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙে দেয়া হয় মন্ত্রীপরিষদ। ২২শে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি শীর্ষ জেনারেলরা মিলিত হয় এক সভায়। ওই সভায় 'অপারেশন সার্চলাইট' শীর্ষক ভয়ঙ্কর সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযান প্রণয়ন করে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। হালকা নীলরঙা অফিস-প্যাডে পাঁচটি পাতায় ষোলোটি অনুচ্ছেদে পেন্সিলে রচিত হয় বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের মহাযজ্ঞ – অপারেশন সার্চলাইট। অপারেশন সার্চলাইটের মৌলিক ধারণা-প্রেরণা-চেতনা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ভিয়েতনামের 'মাইলাই ধ্বংসযজ্ঞ'। উল্লেখ্য, সত্তরের ওই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের ৯৮.৪% শতাংশ অর্জন করেছিল আওয়ামী লীগ। সেসময় থেকেই তারা উপলব্ধি করেছিল যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের সেই উত্তাল উত্থানকে উৎপাটিত করতে হলে জাতিসত্তা ধ্বংসে সশস্ত্র অভিযান (অপারেশন সার্চলাইট) পরিচালনা করতেই হবে। ২২শে ফেব্রুয়ারির ওই সভায় সামরিক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "কিল থ্রী মিলিয়নস অব দেম অ্যান্ড দ্য রেস্ট উইল ইট আউট অফ আওয়ার হ্যান্ডস" (সূত্রঃ রবার্ট পেন, *ম্যাসাকার* [১৯৭২], পৃষ্ঠা- ৫০)। যার গূঢ় অর্থ দাঁড়ায়, 'তাদের ত্রিশ লক্ষকে হত্যা কর, বাকিরা আমাদের হাতের মুঠোয়।' পরোক্ষভাবে যার অর্থ দাঁড়ায়, 'বাঙালি জাতিকে ধ্বংস কর, পূর্ব পাকিস্তানের মাটি দখল কর।' উনিশশ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের মধ্যরাত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুরু করে তাদের সুপরিকল্পিত বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের সশস্ত্র আগ্রাসী পর্ব 'অপারেশন সার্চলাইট'।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই চূড়ান্ত আঘাতের (অপারেশন সার্চলাইট) বিষয়ে সম্পূর্ণ-নিশ্চিত না হলেও আশঙ্কায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অনেক পূর্বেই সাতই মার্চের ভাষণে সম্যক দিকনির্দেশনা দিয়েই রেখেছিলেন আওয়ামী লীগসহ সমগ্র জাতিকে। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত শেষবাণী ধারণ করে রেখেছিলেন রেকর্ডারে। ২৫-২৬শে মার্চের মধ্যরাতের পরপরই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান এবং সেই রাতেই তা বেতারে প্রচারিত হওয়ার [সূত্রঃ 'উইটনেস টু সারেন্ডার': সিদ্দিক সালিক] পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ। ১৯৪৭ সালে পাওয়া 'অপস্বাধীনতার' ফসল পূর্ব পাকিস্তান, সুদীর্ঘ ২৩ বছর পরে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে নতুন নাম 'বাংলা দেশ'-রূপে [পরে বাংলাদেশ] স্বাধীন হয়ে যায়। পাকিস্তানি আগ্রাসী বাহিনীকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শুরু হয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। শামিল হয় সমগ্র জাতি। ব্যতিক্রম ছিল জামাতে ইসলামী, ছাত্রসংঘ, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগের মতো ছোট ছোট তথাকথিত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী। ২৬শে মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম শহরে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবং পরে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত একটানা প্রচারিত হয় বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণা। ১০ই এপ্রিলে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাজুদ্দিন-নজরুলের প্রত্যক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় কয়েক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জীবন বাঁচানোর জন্য ভারতে আশ্রয় নেয় এক কোটি বাঙালি। অবিশ্বাস্য সাহসী প্রত্যাঘাতে নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয় আসে বাঙালির। মুক্তিবাহিনীর কাছে পরাজিত হয় আগ্রাসী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী দালাল জামাতে ইসলামী (পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামী), ইসলামী ছাত্রসংঘ (পরবর্তীকালে ইসলামী ছাত্রশিবির), রাজাকার বাহিনী, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী। ১৬ই ডিসেম্বরে, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় পূর্ব কমান্ডের সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর কাছে পরাজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয় বাঙালির বিজয়। তবে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে, ওইসব শত্রুর হাতে প্রাণ হারায় জল্লাদ ইয়াহিয়া নির্দেশিত 'থ্রী মিলিয়ন' বা ৩০ লক্ষ স্বজন। সম্ভ্রম হারায় কমপক্ষে আড়াই লক্ষ নারী। ১৯৭২ সালে সেইসব যুদ্ধনারী বা বীরাঙ্গনার গর্ভে জন্ম নেয় অন্তত ২৫ হাজার যুদ্ধশিশু।

জেনোসাইড

জেনোসাইড শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই। মাস কিলিংয়ের অর্থে 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, গণহত্যা জেনোসাইডের একটি অংশমাত্র। 'জাতিসত্তা ধ্বংস' বললে বিষয়টার অর্থ সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়। জেনোসাইড মানে ইচ্ছা করে এবং পরিকল্পিত পন্থায় কোনো বর্ণ, গোত্র, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা জাতিকে নির্মূল বা ধ্বংস করা। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে জেনোসাইডের সঠিক সংজ্ঞায়ও রয়েছে আংশিক পার্থক্য। একটা আইনগত সংজ্ঞা পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড (সিপিপিসিজি ১৯৪৮) কনভেনশনে।

এই কনভেনশনের ২ নম্বর আর্টিকেলে জেনোসাইডকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "কোনো জাতীয়, বর্ণগত, গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগত, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এখানে বর্ণিত যে কোনো কর্ম সাধন করা হলে তাকে জেনোসাইড বলা হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে গোষ্ঠির সদস্যদেরকে হত্যা, শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করা, আংশিক বা পূর্ণরূপে গোষ্ঠীগত কাঠামো ধ্বংসের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোষ্ঠীগত অবস্থার ওপরে চাপ প্রয়োগ করা, কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মনিরোধ করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে নিরূপিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং জোর করে এক গোষ্ঠীর শিশুদেরকে ভিন্ন গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।"

পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (ICTY 1993) এবং রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (ICTR 1994) ধর্ষণ এবং যৌন সন্ত্রাসকে অপরাধ এবং জেনোসাইডের সুস্পষ্ট কর্মরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে ধর্ষণ এবং যৌন সন্ত্রাসকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে প্রমাণের উত্তম আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও জেনেভা কনভেনশনে 'ধর্ষণ'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিদ্রোহী বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংস করে অনুগত 'পাকি-বাঙালি' জাতিসত্তা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র!

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের এদেশীয় দালাল জামাত-রাজাকার চক্র কর্তৃক কেন এত ধর্ষণ আর কেনইবা সংঘটিত হয়েছিল সেই যৌন সন্ত্রাস? সেসব কি ছিল সৈনিকদের যৌনানন্দের জন্য? প্রামাণিক তথ্য বলে যে, সারা পৃথিবীতে যুদ্ধকালে আগ্রাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক

যত দেশে যত গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সবই ছিল সুপরিকল্পিত এবং আগ্রাসী-কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নির্দেশে। কোনো ক্ষেত্রে অন্যতম যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে যৌনসন্ত্রাস প্রয়োগ করে আক্রান্ত মানুষদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য, আবার কোনো ক্ষেত্রে জাতিসত্তা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পুরুষ নিধনের পাশপাশি নারীর গর্ভে নিজ জাতির সন্তান জন্ম দিয়ে নতুন [সংকর] জাতিধারা সৃষ্টি করার মাধ্যমে 'এথনিক ক্লিনজিং' করার জন্য! বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তানি সেনাচক্রের পরিকল্পনায় ছিল বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস করে সেখানে নতুন এক সংকর জাতির প্রবর্তন করা।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের 'অ্যাবরশন প্রোগ্রাম' পরিচালনায় সমস্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ড. জিওফ্রে ডেভিস তার 'দি চেঞ্জিং ফেস অব জেনোসাইড - বাংলাদেশ ১৯৭১-৭২' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন: "তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সার্বিক পরিকল্পনায়, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি, যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব তত বেশি, বিবাহিত বা অবিবাহিত বাঙালি নারীকে গর্ভবতী করার জন্য ইসলামাবাদের নির্দেশ ছিল। এর পেছনের মৌলিক যুক্তিটি ছিল যে এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির অখণ্ড জাতি-সত্ত্বা বিনষ্ট হবে যা কিনা বাঙালির গর্ব। ওই বর্বর সিদ্ধান্তের আংশিক ভিত্তি ছিল প্রচলিত একটা মুসলিম বিশ্বাসের ওপরেও; যেখানে মনে করা হয় যে, একজন উত্তম পুত্র সবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে শুধুমাত্র নিজের পিতা (এক্ষেত্রে পাকিস্তানি পিতা) ছাড়া!"

পরিকল্পনাটা ছিল মোটামুটিভাবে এরকম। এক কোটি সাধারণ মানুষকে ভারতে পালিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু। [মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে] আরো এক কোটি বাঙালিকে বিতাড়ন করাটা সেসময়ের প্রেক্ষিতে খুবই সহজ ছিল। [মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে] ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে পারার সামর্থ্যে (!) ওই সংখ্যাকে এক কোটিতে বৃদ্ধি করাটাও সম্ভব ছিল তাদের জন্য। এই হিসেবে একাত্তর সালের সাত কোটি বাঙালির মধ্যে বাকি থাকতো আর চার কোটি। ত্রিশ লক্ষ শহীদের অধিকাংশ পুরুষ হওয়ার প্রেক্ষিতে, তখনো বেঁচে থাকা চার কোটির মধ্যে তিন কোটি নারী বলে ধারণা করা যুক্তিযুক্ত। এই তিন কোটি নারীকে ক্রমাগত ধর্ষণ করে গর্ভবতী করার ফলে জন্ম নিত বাঙালি শিশুর পরিবর্তে 'পাকি-বাঙালি' শঙ্কর শিশু! সূচীত হতো নতুন জাতিসত্ত্বা। ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতো বাঙালি জাতিসত্ত্বা! এই ছিল মহা-পরিকল্পনা। তবে, এই ভয়াবহ মহাপরিকল্পনার বিপরীতে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞায় এবং আমাদের অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর

অসম সাহসিকতায় অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে শুধু বেঁচেই যায়নি বাঙালি জাতিসত্তা; তীব্র জাতীয়তাবোধে উন্মেষ ঘটে বাঙালি জাতির। [দ্রষ্টব্য: মুক্তিযুদ্ধকালেই গৃহীত চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথমটি ছিল জাতীয়তাবাদ।]

তবে বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে, সম্ভাব্য পরাজয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে, সহযোদ্ধা জামাত, আল-বদর ও আল-শামসের সহযোগিতায় তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতির 'বুদ্ধি-সত্তা' অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে। সেটা ছিল পরাজিত ব্যর্থ উন্মাদ পাকিস্তানি সেনাচক্রের মরণ-কামড়! উল্লেখ্য, বিজয়ের পরে ৩১ ডিসেম্বরে 'স্টপ জেনোসাইড' তথ্য-চলচ্চিত্রের নির্মাতা জহির রায়হানকে অপহরণ (এবং হত্যা) ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ঘটনা। এরকম পৈশাচিক যুদ্ধাপরাধীদের কি ধরনের বিচার করব আমরা – স্বাধীন বাংলার নবীন প্রজন্ম? কোন শাস্তিতে পুরস্কৃত (!) করব পাকিস্তানি সেনাচক্রের পুরোধা জল্লাদ ইয়াহিয়া খান ও তার আগ্রাসী সেনাবাহিনীকে?

পাকিস্তানের, বিশেষত সেদেশের নবীন প্রজন্মের দুর্ভাগ্য এই যে, পঞ্চাশ-ষাটের দশক ধরে এবং ১৯৭১ সালে পূর্বাংশের স্বদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সেনাচক্রের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের (ধ্বংসযজ্ঞ, জাতিসত্তা ধ্বংস ও গণধর্ষণ) উত্তরাধিকারের দায় তাদেরকে মেনে নিতে হবে। সেই দায় মেনে নিয়ে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে অভিশপ্ত পাকিস্তানি জাতিকে বাঙালির কাছে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করে যেতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, আমাদের বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী সোচ্চার কণ্ঠ বারবার উচ্চারণ করবে, 'মিলবে না ক্ষমা!' রাষ্ট্রীয় সফরে, ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে বারবার পাকিস্তানিদেরকে যেতেই হবে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগতেই হবে সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পোস্টার

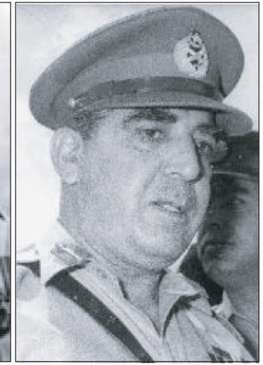
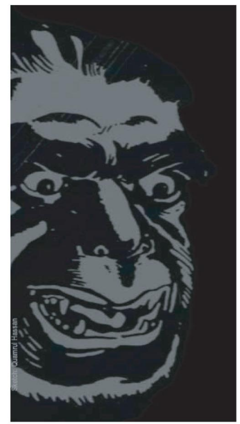

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
একাত্তরের ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা ও গণধর্ষণের
মূল পরিকল্পনাকারী

একাত্তরের ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা ও গণধর্ষণ

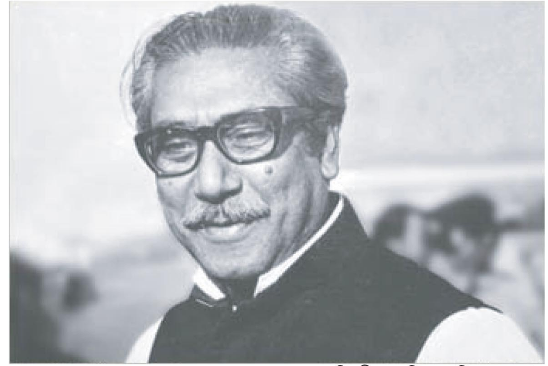

ধ্বংসের বিপরীতে সৃষ্টির স্থপতি ও রূপকার
–ছবি : আলহাজ মোহাম্মদ জহিরুল হক

মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ
তাজউদ্দিন আহমেদ

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর হাতে
পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ

অধ্যায় - ২
বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু

কারা যুদ্ধশিশু?

যুদ্ধকালে 'যৌন-সন্ত্রাসের' মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরাই যুদ্ধশিশু। দেশে দেশে আগ্রাসী আক্রমণের সময়ে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত পরিকল্পিত যৌন-সন্ত্রাসে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য যুদ্ধশিশু। এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে। এরা সবাই অসামরিক মায়ের গর্ভে বিদেশি, আগ্রাসী বা হানাদার সামরিক সেনার ঔরসজাত সন্তান। পারস্পরিক সম্পর্কহীন এবং পারিবারিক বন্ধনহীন পরিবেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি বা শত্রুর সঙ্গে শুয়ে' এরকম অবাঞ্ছিত জন্মদান চরমভাবে নিন্দার্হ এবং অযাচিত। কথাশিল্পী পার্ল এস বাক এশিয়ায় মার্কিনি আগ্রাসনের ফলে বিশেষত ভিয়েতনামে মার্কিন ঔরসজাত শিশুদেরকে অভিহিত করেছেন 'আমেরাশিয়ান'। আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদেরকে কি নাম দেয়া যায়? অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নরওয়েতে এমনটাই ঘটেছে অগুণতি সংখ্যায়। জার্মান পিতার ঔরসে নরওয়েজীয় মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া এরকম এক শিশুই পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত 'অ্যাবা' সঙ্গীত দলের গায়ক অ্যানি-ফ্রিড লিংস্ট্যাড। এর চেয়েও মর্মান্তিক কথাটি হল, এটা ধর্ষণের চেয়েও বেশিমাত্রার হতে পারে; যখন এটা ঘটে কোনো একজন সৈন্যের হতাশার ফলাফল হিসেবে বা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে একটি পরিকল্পিত প্রয়োগে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে, রোমান দৃষ্টিভঙ্গিতে, মাদার তেরেসা বলেছিলেন যে এরকম কারণে গর্ভবতী হওয়া মেয়েদের গর্ভপাত না করাই উচিত। অবশ্য এই মন্তব্যের জন্য তাকে তীব্রভাবে সমালোচিত হতে হয়েছে।

বিশেষভাবে সুবিদিত যুদ্ধশিশুর একটি দল হল আমেরাশিয়ান। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সৈন্য কর্তৃক এশিয়ার জাতিসমূহের নারীদের গর্ভজাত শিশুদের ক্ষেত্রে কথাশিল্পী পার্ল এস বাক ব্যবহার করেছেন এই শব্দটি। তুলনামূলকভাবে এসব শিশুরা কিছুটা সৌভাগ্যবান কারণ আইনত স্বীকৃত পরিচয় থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে ভিসা ও ইমিগ্রেশন পাওয়া সহজলভ্য হয়েছে। তবে নিজদেশের নিজ সমাজে, বিশেষত যেখানে জাতিগত সত্তার পবিত্রতা বিবেচিত হয় সনাতনী গুরুত্বে, সেখানে তাদেরকে নানা রকমের বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু কিছু দ্বীপে মার্কিন ঔরসজাত স্থানীয় মেয়েদের গর্ভজাত শিশুদেরকে 'মেলিনি' বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি আসলে 'মেরিন' শব্দের স্থানীয় উচ্চারিত রূপ।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক আটশ নারী ধর্ষিত হয়েছে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে হাইতিতে শুধুমাত্র স্বৈরাচার টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ষণকে রাজনৈতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পিটার গর্ডন ও কেট ক্রেহান রচিত 'ডাইয়িং অব স্যাডনেস' শীর্ষক ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ইউএনডিপি-র প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধে বসনিয়ায় ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মুসলিম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। এসব নারীদের অনেককেই তথাকথিত ধর্ষণ-ক্যাম্পে রেখে জোরপূর্বক অন্তঃসত্ত্বা করে সার্বীয় শিশু জন্মদানে বাধ্য করা হয়েছে!

ধর্ষণের মাধ্যমে শত্রুর ঔরসে জন্ম নেয়া শিশুর অভিধা হিসেবে ব্যবহৃত 'যুদ্ধশিশু' শব্দটির ভিন্ন দু'একটা অর্থও রয়েছে; বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। অর্থনীতির হিসাবপত্রে ওয়ার বেবী বা যুদ্ধশিশু মানে হল এমন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যার শেয়ারের মূল্য বেড়ে গেছে যুদ্ধকালে; প্রায়শ এসব প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে সামরিক ঠিকাদার। আবার, যুদ্ধশিশু শব্দটি, যুদ্ধকালে আগ্রাসনের মাঝে নানাবিধ ঝামেলার মুখোমুখি হওয়া বা পতিত হওয়া শিল্পকেও নির্দেশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক এবং বিমান শিল্পসমূহ এরকম আপদকালীন সময়ে 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে সরকারের কাছ থেকে বিপুল সাহায্য-সমর্থন পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুর সংখ্যা

আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারীকে অত্যাচার, ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়েছে। সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গত কারণেই এটা নিয়ে

রয়ে গেছে মতভিন্নতা। বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে ধর্ষিতার সংখ্যা ২ লক্ষ; মার্কিন গবেষক সুসান ব্রাউনমিলারের মতে এই সংখ্যা অনেক বেশি – ৪ লক্ষ। এসব ধর্ষিতা নারীদের একটি বিরাট অংশ গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। ধারণা করা হয় যে, বিপুল সংখ্যক গর্ভপাতের পাশাপাশি তাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ২৫ হাজার যুদ্ধশিশু।

ভিন্ন একটা সূত্রে জানা যায়, ইটালীয় এক চিকিৎসা জরিপে ধর্ষিতার সংখ্যা পাওয়া যায় ৪০,০০০। লন্ডনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড্ প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের [আইপিপিএফ] নিরূপণে এই সংখ্যা ২ লক্ষ। যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক ড. জিওফ্রে ডেভিস দাবী করেছিলেন যে এই সংখ্যা আরো বেশি। কতজন ধর্ষিত নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল এবং বাচ্চা প্রসব করেছিল তা অনির্দিষ্ট। সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ৩ লক্ষ। তবে এই সংখ্যা নিরূপণের পন্থাটি খুব বেশি সরল ছিল না। ড. ডেভিসের মতে প্রায় ২ লক্ষ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল তার ধারণা, কোনো গবেষণালব্ধ উপাত্ত নয়।

অন্যদিকে হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানি সূত্র দাবি করে যে ধর্ষিতার সংখ্যা 'অনেক কম'। তবে লক্ষ্যণীয় যে তারা 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক' ধর্ষণের দায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি! ড. নিলীমা ইব্রাহীম তার 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে ধর্ষিতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। যুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধু এসব অত্যাচারিত নারীকে 'বীরাঙ্গনা' বলে অভিহিত করেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সেটা ছিল সমাজে ওইসব নারীদের সম্ভাব্য অসহায় অবস্থানকে যথাসম্ভব হ্রাস করার সচেতন প্রয়াস। পরবর্তীকালে 'বঙ্গবন্ধু-বিহীন বাংলাদেশে' সে প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে, সে প্রশ্ন করতেই পারে নবীন প্রজন্ম।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ের সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বিচারপতি কে এম সোবহান [চেয়ারপারসন, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র], সিস্টার মার্গারেট মেরি [সুপেরিয়র, মিশনারিজ অব চ্যারিটি], ড. জিওফ্রে ডেভিস, আইপিপিএফ ব্যক্তিবর্গ যেমন ওডার্ট ভন শুলজ প্রমুখ প্রকাশ করেছিলেন যে ২৩ হাজার গর্ভপাত করা হয়েছিল ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে। সেসব ক্লিনিকের পরিচালনায় ছিল বৃটিশ, মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয় চিকিৎসকগণ। সহযোগিতায় ছিল বাঙালি চিকিৎসকগণ। গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এটাই ছিল ১৯৭২ সালের গোড়াতে পাওয়া গর্ভপাত সম্পর্কিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য। সেসময়েই ঢাকায় বিদেশী চিকিৎসকেরা স্থাপন করে বেশ কয়েকটা গর্ভপাত/প্রসব কেন্দ্র যা সেবা সদন নামে পরিচিতি পায়।

এটা সহজেই অনুমেয় যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশে যুদ্ধশিশুর সংখ্যা নিরূপন করাটা ছিল 'অবাস্তব'! সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বাইশটি সেবা সদনে তিনশ থেকে চারশ শিশুর জন্ম হয়েছিল। কানাডীয় ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সেসময়ে অধিকৃত এবং মুক্ত বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে এসে আলোচনা করেছিলেন লীগ অব রেড ক্রস সোসাইটি এবং ইউনিসেফ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। পরে অটোয়ায় ফিরে গিয়ে সদর দপ্তরে অবহিত করেন যে যুদ্ধশিশুর নিরূপিত সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। পুরোপুরি সঠিক সংখ্যা পাওয়া যখন ছিল দুরূহ, তখন সম্ভবত সংখ্যাটির ভয়াবহভাবে বেশি ছিল এরকম ধারণা করাই নিরাপদ। ১৯৭২ সালে জন্মানো যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রণিধানকৃত সংখ্যা হিসেবে সর্বনিম্ন ১০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২৫ হাজার।

২০০৫ সালের জুনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শাখা কর্তৃক, ১৯৬১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির ওপরে দুই দিন ব্যাপী এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আত্মীয় এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত শর্মিলা বসু তার উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখিত যুদ্ধাহত এবং ধর্ষিতার সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শর্মিলা বসুর গবেষণা পদ্ধতিকে নীচুমান-সম্পন্ন এবং পক্ষপাতদুষ্ট বলে সমালোচনা করা হয়। শর্মিলা বসুর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য নীচের প্রণিধানই যথেষ্ট।

উনিশশ একাত্তরে অধিকৃত বাংলাদেশে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ ও ধর্ষণলীলার শেষে ডিসেম্বরে মিত্র বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিল ৯০,৩৬৮ জন পাকিস্তানি সেনাসদস্য। এরমধ্যে ছিল ৫৪,০০০ নিয়মিত এবং ২২,০০০ আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য। অতএব, ৯০ হাজার সেনা ৯ মাসে ২ থেকে ৪ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল। সঠিক গণনার অবর্তমানে, শর্মিলা বসুর মতো আরো কারো মনে এই সংখ্যা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে বলতে হয় যে - ২ লক্ষ বাঙালি নারীকে ধর্ষণ করার জন্য ৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈনিকদের প্রত্যেককে নয়মাসে মাত্র ২/৩ জন নারীকে ধর্ষণ করতে হয়েছে। পরিকল্পিত জাতিসত্তা-ধ্বংসে (জেনোসাইড) এই ভয়াবহ মাত্রার অত্যাচার শুধু সম্ভবই নয়, বরং আধুনিক সময়ের আগ্রাসী সংঘর্ষে এর তুলনাও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, রুয়ান্ডায় হুটু মিলিশিয়া বাহিনী, ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল মাত্র ১০০ দিনে!

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, বাংলাদেশে জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশন বাস্তবায়ন [১৯৯৬-২০০০] সম্পর্কিত বিকল্প প্রতিবেদনে ওই

কনভেনশনের আর্টিকেল একুশের বিপরীতে উল্লেখ করেছে: বাংলাদেশ সরকার এই আর্টিকেল [২১] সম্পর্কে কোনো সাড়া দেয়নি এবং এ বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের এনজিও সমূহ এখনো আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে– "১৯৭২ সালেই যুদ্ধশিশুদের আশ্রয়নের জন্য একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়"। ক্রমশ বর্ধনশীল অগণিত পরিত্যক্ত যুদ্ধশিশুদের সঠিকভাবে দত্তকায়ন ও অভিভাবকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় [আইন বিভাগ] কর্তৃক রাষ্ট্রপতির ১২৪ নম্বর আদেশ [বাংলাদেশ অ্যাবানডান চিল্ড্রেন {স্পেশাল প্রভিশন} ১৯৭২] জারি করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক বছর পরেই এই আইনটিকে রহিত করা হয় এবং আজও সেটা একই অবস্থায় রয়ে গেছে। কারণটা ছিল, কিছু কিছু শিশুদের ক্ষেত্রে অপব্যবহার বা অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। কিন্তু কোনো রকমের বিস্তারিত তদন্ত ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল ওই পদক্ষেপ। আবার অন্যদিকে, অভিযোগটির প্রেক্ষিতে আদেশটি রহিত করা হলেও, পরিত্যক্ত শিশুরা থেকেই গেল এক বিশাল সমস্যা হয়ে। তাদেরকে গ্রহণ করে বিভিন্ন এনজিও এবং চার্চ সংস্থা। তারাই এসব শিশুর অভিভাবকত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করে।

প্রিয়পাঠক, সহজেই অনুমেয় যে, বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারী যুদ্ধকালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং শত্রুর ঔরসজাত সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু কি হয়েছে এসব শিশু এবং তাদের মায়েদের? তারা কি পেয়েছে আদর-স্নেহ-ভালবাসা? তারা কি পরিত্যক্ত? ঘৃণিত? কীভাবে তারা তাদের অস্তিত্বের অভ্যুত্থানের বেদনাহত অমোঘ সত্যকে সহ্য করবে অথবা লাঘব করবে? পৃথিবীর দেশে দেশে বিভিন্ন আগ্রাসনে বা যুদ্ধকালে ধর্ষণে জন্ম নিয়েছে যুদ্ধশিশু। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুরাও। আমাদের যুদ্ধশিশুর সংখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও সেটা ১০ থেকে ২৫ হাজারের মধ্যে। সারাবিশ্বে এ মুহূর্তে বেঁচে থাকা ৫ লক্ষ যুদ্ধশিশুর একজন বাংলাদেশের 'বাদল'-কে মাদার তেরেসার আশ্রম থেকে নিয়ে যায় অন্টারিওর ওয়াটারলুর একটি স্নেহময়ী গুড পরিবার। সে এখন রায়ান বাদল গুড। বর্তমানে একজন তরুণ এবং বিবাহিত। জন্মদাত্রী মায়ের সন্ধানে বারবার ফিরে আসে নিজবাসভূম প্রিয় বাংলাদেশে, পাবেনা জেনেও!

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া বেশ কঠিন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য-ধারণের সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে অনুপস্থিত। যাও পাওয়া যায় তাও বিতর্কিত বা আমাদের বিভিন্নজনের বিক্ষিপ্ত মনোভাবের কারণে গ্রহণযোগ্যও হয়না। বিশেষত যুদ্ধশিশু প্রশ্নে বিশ্বজুড়ে যে কজন গবেষক রয়েছেন তাদের মধ্যে সুসান ব্রাউনমিলার অ্যান্থনি অন্যতম শীর্ষব্যক্তি। বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে প্রকাশ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসে এই মহীয়সী নারীর শক্তিশালী কলম- নিঃসৃত উদ্ধৃতি। সারা বিশ্বে এই মানুষটির অন্যতম পরিচিতি– একজন অতি-সাহসী নারীবাদী সুলেখক। আমাদের দেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে সুসান ব্রাউনমিলারের সাবলীল প্রকাশে ফুটে উঠেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, যুদ্ধে নারীর অবস্থান, ব্যাপক ধর্ষণের ভয়াবহ মাত্রা, বীরাঙ্গনাদের গর্ভে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুদের কথামালা।

১৯৭১ সাল থেকেই 'এগেইনস্ট আওয়ার উইল: মেন, উইমেন অ্যান্ড রেপ' শীর্ষক বইটির কাজ আরম্ভ করেন তিনি। সাইমন অ্যান্ড শুস্টার নামের প্রকাশনা সংস্থা বইটি প্রকাশ করে ১৯৭৫ সালে। তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পড়ে যায় সারা বিশ্বে। ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে 'উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা' হিসেবে সাদরে গৃহীত হয় সকল মহলে। আজ পর্যন্ত ১৬টি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এটি। বড় আকারে বইটির পেপারব্যাক সংস্করণও এখন সুলভে পাওয়া যায় বাজারে; সেটা প্রকাশ করেছে ব্যালান্টাইন প্রকাশনা সংস্থা।

'ধর্ষণ' সম্পর্কে গ্রন্থটির একটি প্রণিধান অবিস্মরণীয়: "ধর্ষণ– ভীতি প্রদর্শনের একটি সচেতন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সকল পুরুষ সকল নারীকে রেখে দেয় একটা ভীতিকর অবস্থায়।"

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর পাশে 'মিত্রবাহিনী' রূপে অবস্থান নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে হঠিয়ে দেয় এবং বাংলাদেশের যুদ্ধে পূর্ণ যবনিকা টানে, তখন বাঙালি মেয়েদের গণহারে ধর্ষণের ছোট ছোট কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে মার্কিন পত্রপত্রিকায়। ১৯৭১ সালের ক্রিস্টমাসের কয়েকদিন পূর্বে নিউ ইয়র্ক পোস্টে প্রকাশিত হওয়া, লস এঞ্জেলেস টাইমসের সমন্বিত সংবাদ সেবা থেকে, প্রথম পর্বটি পড়ি। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয় যে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার, পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বাঙালি মেয়েদেরকে নির্যাতনের বিপরীতে স্বীকৃতি স্বরূপ, সকল

ক্রিস্টমাসের দুই দিন পরে নিউইয়র্ক ডেইলী নিউজে, যুদ্ধ সংবাদদাতা জোসেফ ফ্রায়েড কর্তৃক আরো বিস্তারিত একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ফ্রায়েড বর্ণনা করেন যে নয় মাস পরে বাঙালি মেয়েদেরকে আবার রাস্তায় দেখা যেতে থাকে। তাদের কেউ কেউ [এতদিন] জিনিসপত্র নিয়ে গ্রামের দিকে আত্মীয়দের বাড়িতে বাসবাস করেছে এবং অন্যেরা পালিয়েছিল বিভিন্ন গোপন স্থানে। তিনি লিখেছেন, প্রমাণিত হয়েছে যে সাবধানতাই বুদ্ধির পরিচয়, যদিও সবসময়ে কার্যকরী নয়।

একদল শিকার এবং প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে কিভাবে ট্রাক ভরে পাকিস্তানি সেনারা ধর্ষিতাকে 'মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কাহিনীর পথ ধরে এসে যায় ভীতিকর বাক্য: "সনাতনী গ্রামীণ বাঙালি সমাজে, যেখানে মেয়েরা আবৃত জীবন যাপন করে, ধর্ষণ শিকাররা প্রায়শ হয়ে যায় সমাজচ্যুত।"

এবং তাদের অর্থপুষ্ট সহযোগী রাজাকাররা রাতের বেলায় গ্রামে গ্রামে শিকারীর মতো হানা দিয়েছে; জোর করে মেয়েদেরকে জড়ো করতো। কিছু মেয়েকে ওই স্থানেই ধর্ষণ করা হয়েছে। অন্যান্যদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সামরিক কম্পাউন্ডে। ভারতীয় সেনারা যখন যুদ্ধ [পাক-ভারত যুদ্ধ: ডিসেম্বর ১৯৭১] করতে করতে পাকিস্তানি ছাউনিতে ঢুকে পড়ে, তখনো কিছু মেয়েরা সেখানেই ছিল। কান্নারত বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরাও প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ, তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর সহযোগী মনে করা হতো। তারা বলেছে কীভাবে নিজ নিজ স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং পরে ওইসব অসহায় স্বামীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এরকম কাজ কতজন পাকিস্তানি নিয়মিত সেনারা করেছে সেটা স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতেন যে তাদের সেনারা খুবই সুশৃঙ্খল [সেসব জঘন্য কাজের জন্য!]।

অন্যান্য পত্রিকার কাহিনীগুলো মিস করছি ভেবে, নিউইয়র্ক টাইমসের ফরেন ডেস্কের এক বন্ধুকে ফোন করলাম। "বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণ?" হেসে উঠল সে। "আমার মনে হয়না। এটাকেতো টাইমসের কাহিনী হিসেবে মানায়না।" নিউজউইকের এক বন্ধুও একইরকম সন্দিহান। দুজনেই বলল যে তাদের হাত দিয়ে এমন কোনোকিছু পার হলে সেদিকে চোখ রাখবে। আমি একটা স্পষ্ট ধারণা পেলাম যে, দুজন মানুষই, ভাল সাংবাদিক, তবে ভাবল যে আমি পুরনো গাছের পানে চিৎকার করছি। [এনবিসি-র লিজ ট্রোটা ছিলেন গুটিকয়েক মার্কিনী রিপোর্টারদের একজন যারা সেসময়ে বাংলাদেশে ধর্ষণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। উইকএন্ড নিউজে সে একটা টিভি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল।]

জানুয়ারির [১৯৭২] মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করেই এই কাহিনীটি বিশ্বাস অর্জন করল। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস-র একজন এশিয়ান রিলিফ সেক্রেটারি

বাংলাদেশে তার দু'সপ্তাহের মিশন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জেনেভায় একটি কনফারেন্স আহ্বান করেন। সেখানে রেভারেন্ড কেনটারো বুমা অবহিত করেন যে নয়মাসের যুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক ২ লাখ বাঙালি নারী ধর্ষিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি তার কাছে ঢাকার সরকারি দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি বলেন, হাজার হাজার ধর্ষিতা মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। আর প্রথা অনুযায়ী, কোনো মুসলিম স্বামী, পরপুরুষ কর্তৃক স্পর্শ করা, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়না; এমনকি যদি সেটা জোরপূর্বকও হয়ে থাকে। "বাংলাদেশের নতুন কর্তৃত্ব ওই প্রথাকে ভাঙার যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে," সংবাদকর্মীদেরকে জানান বুমা। "তারা ওইসব স্বামীদেরকে বলেন যে তাদের স্ত্রীরা পরিস্থিতির শিকার এবং অবশ্যই জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসেবে মেনে নিতে হবে।"

একটা কাহিনী যা বেশিরভাগ রিপোর্টাররাই বাংলাদেশে খুঁজে পায়নি, একটা জেনেভা ডেটলাইনের আওতায় তাই নিয়ে এসেছে এপি এবং ইউপিআই। চারটি অনুচ্ছেদে টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে; এমনকি স্থান পেয়ে যায় নিউইয়র্ক টাইমসে।

লন্ডন, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, স্টকহোম এবং অন্যান্য শহরে মানবাধিকার এবং নারীবাদী দলগুলো থেকে উঠল সুসংগঠিত সাড়া। "চিন্তাও করা যায়না যে, যুদ্ধে যাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে সেসব নিষ্পাপ স্ত্রীরা এখন, নিজেদের স্বামী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি," ওই জানুয়ারিতেই এগার জনের একদল নারী লিখেন নিউ ইয়র্ক টাইমসে। "সুস্পষ্টভাবে এতে উপলব্ধি করা যায় যে, এমনকি স্বাধীনতার যুদ্ধকালেও নিজেদের নারীদের প্রতি পুরুষেরা অন্ধ বিচার অনুসরণ করে চলে।" উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে ধর্ষণকে কেন্দ্র করে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের লন্ডন অফিসের কর্মকর্তারা বাঙালি নির্যাতিতাদেরকে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রদানে সমন্বয় করেন। প্রথমেই, বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি সহযোগিতার পরিচয় দেয়। [আশা করা হয়েছিল] পরের কয়েক মাসে, স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের নারীদের ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টের ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে লাঘব হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সরকার যখন ভারতের সমর্থনসহ তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন 'বাংলা', সরকারিভাবে পূর্ব পাকিস্তান, ছিল ৭৫ মিলিয়ন নাগরিক অধ্যুষিত একটি রাষ্ট্র। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করা হয়। নয় মাসের ভয়াবহ যুদ্ধ দুই সপ্তাহের ভারতীয় সামরিক [মিত্র বাহিনীর] আক্রমণের মাঝ দিয়ে সমাপ্ত হয়। সম্ভবত তিন মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়, এক মিলিয়ন মানুষ সীমানা পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ বা সম্ভবত ৪ লক্ষ [তিনটি সংখ্যাই বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত] নারী ধর্ষিত হয়। ধর্ষিত নারীদের আশি শতাংশই ছিল মুসলিম। যা বাংলাদেশের

জনসংখ্যার আনুপাতিক হারকে প্রতিফলিত করে। তবে হিন্দু এবং খ্রিষ্টান নারীও বাদ যায়নি। মুসলিম হিসেবে বেশিরভাগ বাঙালি নারীই, কড়া পর্দার আড়ালসহ পুরুষদের থেকে আলাদা, এমনকি ঘরোয়া অবস্থাতেও, জীবন যাপন করে থাকে। পাকিস্তানিরাও মুসলিম কিন্তু সেখানে সাদৃশ্যটি অনুপস্থিত। অনুরূপ ধর্মীয় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, পাঞ্জাবি পাকিস্তানিরা লম্বা, ফরসা ত্বক ও একহারা এবং অন্যদিকে বাঙালিরা কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশকায়। বর্ণগত এই পার্থক্যের বিষয়টি বাঙালি ধর্ষিতা ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের মানসিক যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের চেয়ে সামান্য বেশি এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর ছোট্ট দেশটি [বাংলাদেশ সারাবিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির একটি দেশ] আক্রমণ ও দখল করে নেয়ার পরে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বিপুল সংখ্যক বাঙালি নারীকে যত্রতত্র তাৎক্ষণিকভাবে ধর্ষণ করাটা ছিল সোজাসাপ্টা নিষ্ঠুর। আক্রান্ত মেয়েদের মতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী মুসলিম বিহারী এবং অর্থপুষ্ট রাজাকাররা ছিল সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ধর্ষক। বিষয়টা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়ের কথা যখন গ্রীক ও ইতালীয় কিষাণী মেয়েরা তাদের গ্রাম অতিক্রমকারী যে কোনো সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হতো।

বাংলাদেশে রিপোর্টিংয়ের দায়িত্বে প্রেরিত অব্রে মেনেন একটি 'হঠাৎ ধর্ষণের' প্রতিবেদন তৈরি করেন। [সঙ্গত কারণে এখানে কিছুটা অংশ বাদ দেয়া হল।] মেনেন তার তথ্যাদি পেয়েছে শিকারের পিতার কাছ থেকে। অক্টোবরের একটি দিনে পাকিস্তানি সেনারা ট্রাকে করে ছোট্ট গ্রামটিতে আসে। শান্তভাবে এবং বিস্তৃতভাবে তারা বিভিন্ন বাড়িতে 'প্যাম্ফলেট' বা ছোট ছোট বইয়ের সন্ধান করে। কথাবার্তা সামান্যই হয়। কারণ, সেনাদের কথা গ্রামের কেউই তেমন একটা বোঝেনি। বাড়ির এক মাসের নতুন বৌ একজন সেনাকে 'শান্তি-স্বরূপ' ডাবের পানি দেয়।

ওই রাতেই দশটার দিকে ট্রাকভরা সেনারা ফিরে আসে। ঢেউ টিনের বাড়িটির দরোজায় লাথি দিয়ে, পরিবারের সবাইকে মাড়িয়ে প্রবেশ করে। সবশুদ্ধ ছয়জন সেনা ছিল এবং পিতাটি বলেন যে তাদের কেউই মাতাল ছিলনা। মেনেনের ভাষায়ই শোনা যাক:

নতুন দম্পতির জন্য সাজানো ঘরটিতে প্রবেশ করে দুই সেনা। অন্যেরা পরিবারের সঙ্গে বাইরে থাকে। তাদের একজন অস্ত্র দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে তাদেরকে। তারা একটা বীভৎস চিৎকার শুনতে পেল। সেইসঙ্গে বৌটির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তারপরে নীরবতা যতক্ষণ না মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। তারপরে আবার নীরবতা। শুধু মাঝেমধ্যে চাপা কান্না যা দ্রুতই মিইয়ে যায়। কয়েক মিনিট পরে সেনা দুজনের একজন বেরিয়ে আসে। তার পরনের ইউনিফর্ম

অবিন্যস্ত। সঙ্গীদের প্রতি দাঁত বের করে হাসল। আরেকজন সেনা ওই ঘরে তার স্থান নিল। আর এভাবেই ছয়জনই গ্রামের 'অনিন্দ্য সুন্দরীকে' ধর্ষণ করে। তারপরে দ্রুতই তারা স্থান ত্যাগ করে। বাবা তার কন্যাকে পেল খাটের ওপরে অচেতন ও রক্তঝরা অবস্থায় পড়ে থাকতে। স্বামীটি হাঁটু ভেঙে মেঝেতে ঝুঁকে আছে নিজেরই বমির ওপরে।

পিতাকে প্রশ্ন করে, মেনেন জানতে পারেন যে ওই তরুণী বৌটি ঢাকার একটি রেপ ভিকটিম ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। তার বর্ণনায় সে ছিল 'সত্যিই সুন্দরী' কিন্তু মেনেন তার মুখকে পেল 'বিস্মিত' রূপে। কঠিন এবং ভীত। মেয়েটির মনে সন্দেহ যে সে আর কোনোদিনও ওই ছোট্ট গ্রামটিতে ফিরতে পারবে কিনা। তার একমাসের স্বামী তার মুখ দেখতে অস্বীকার করেছে। তার পিতা বলেছে যে সে 'লজ্জিত'। গ্রামের মানুষেরাও বলেছে যে তারা তাকে চায় না। মেনেন লিখেছে যে তাদের আলাপচারিতা এগিয়ে চলেছে বিরতি নিয়ে কিন্তু ওই বিরতির মুহূর্তগুলো ছিল তীব্র বেদনাক্লিষ্ট।

...আমিই যতি টানলাম। দরোজায় পৌঁছানোর পরে সে আমাকে ডাকল।

"হুজুর," সম্মানিত সম্বোধন করে।

"হ্যাঁ ?"

"আপনি দেখবেন যেন ওই মানুষগুলো শাস্তি পায়," মেয়েটি বলল।

"শাস্তি পায়। শাস্তি পায়। শাস্তি পায়।"

গ্রামের অনিন্দ্য সুন্দরী সম্পর্কে মেনেনের প্রতিবেদনটি শৈল্পিক ঢংয়ে আঁকা, কিন্তু এটাই নাটকীয়ভাবে হাজার হাজার ধর্ষিতা এবং পরিত্যক্ত বাঙালি নারীর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছে। কম রোমান্টিক চোখের অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা আরো বাস্তব-ভিত্তিক কেস-স্টাডি প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের ধর্ষণটি কোনোভাবেই সৌন্দর্যের মধ্যে সীমিত ছিলনা। আট বছরের শিশু থেকে পঁচাত্তর বছরের দাদী-নানীদেরকে নয় মাসের দমন-পীড়নে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা শুধু ঘটনাস্থলেই বাঙালি মেয়েদেরকে অত্যাচার করেনি, তারা শত শত হাজার হাজার মেয়েকে সামরিক ছাউনিতে জোর করে আটকে রেখেছে রাতে ব্যবহারের জন্য। পালানো ঠেকানোর জন্য তাদেরকে উলঙ্গ করে রাখা হতো। কিছু কিছু ক্যাম্পে সেনাদেরকে পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্র দেখানো হতো। একজন ভারতীয় রিপোর্টার লিখেছেন, "পুরুষগুলোকে নিশ্চিতভাবে সক্রিয় করে রাখার জন্য...।"

তের বছর বয়সী খাদিজাকে ঢাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করে একজন ফটো সাংবাদিক। সে এবং আরো চারজন মেয়ে মিলে একসঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল।

পথিমধ্যে একদল পাকিস্তানি সেনা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। পাঁচজনের সবাইকেই মোহাম্মদপুরের একটা 'সামরিক ব্রথেলে' রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই তারা আটক থাকে। প্রতিদিন খাদিজাকে দুইজন সেনা নিয়মিতভাবে অত্যাচার করতো। সে বলে, অন্যদেরকে প্রতিদিন সাত থেকে দশজনের সেবা করতে হতো। [কোনো কোনো ক্ষেত্রে জানা গেছে যে এক রাতে একজনের ওপরে প্রায় আশিবার অত্যাচার করা হয়েছে। এধরনের শারীরিক অত্যাচারকে অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি যখন আমি এসব লিখছিও।] খাদিজা বলে প্রথমে সেনারা তার মুখে কিছু একটা গুঁজে দিত যেন সে চিৎকার না করতে পারে।

ঢাকার অদূরে বসবাসকারী একজন ধনাঢ্য বিধবা কমলা বেগম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সে তার দুই কন্যাকে লুকিয়ে থাকার জন্য গ্রামদেশে পাঠিয়ে দেয়। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি এখানে নিরাপদেই থাকতে পারবেন। বিশ্বাস ছিল যে আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার নিরীখে তিনি 'খুবই বয়স্ক'। তিনি তার বাড়িতেই দুজন পাকিস্তানি সেনা এবং একজন রাজাকার কর্তৃক নির্যাতিত হন। খাদিজা এবং কমলা বেগমকে ঢাকার একটা অ্যাবরশন ক্লিনিকে একজন ফিমেল ফটোগ্রাফার বেরেংগিরে আরাগন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

নয় মাসের যুদ্ধে ধর্ষণ, অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি ছিল বাঙালি নারীদের অপমানের শুধুমাত্র প্রথম পর্ব। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ধর্ষণের শিকার নারীদেরকে জাতীয় বীরাঙ্গনা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সমাজে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পথ সূচিত হয়। চেষ্টা চলে দুর্ভাগা মেয়েদেরকে নিজ নিজ স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার বা অবিবাহিতদের জন্য মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের মাঝ থেকে সম্ভাব্য বর খোঁজার। শুধুমাত্র কল্পনাই করা যায় যে, নারীর পবিত্রতা এবং পর্দার আড়াল যে দেশে মৌলিক নীতি সেখানে 'তাদেরকে বিয়ে' দেয়ার প্রচারণা কখনো হালে পানি পাবে। সামান্য সংখ্যক সম্ভাব্য বর এগিয়ে এলেও তারা আশা করেছিল যে সরকার 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার' মতো বীরাঙ্গনাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিবে আকর্ষণীয় পরিমাণে যৌতুকসহ।

একজন সরকারি কর্মকর্তা বিরক্তিভরে অভিযোগ করলেন, "তাদের যৌতুকের দাবির মাত্রা ছিল সর্বশেষ লালরঙা জাপানি গাড়ি থেকে শুরু করে অপ্রকাশিত কবিতার বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেয়া পর্যন্ত।" সম্ভবত বাংলাদেশীদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আরো একটা বাধা যা ছিল তা হল ধর্ষিতা মেয়েদের 'মানসিকতা'। একই কর্মকর্তা বলেন, "অনেকেই কিছু সময়ের জন্য পুরুষের উপস্থিতি সহ্য করতে সক্ষম হবেনা।"

কিন্তু বিয়ের চেয়ে অনেক বড় বিপদের মোকাবেলা করার ছিল।

ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড আবিষ্কার করে যে স্ত্রীরোগ সংক্রমণের মাত্রা ব্যাপক। একজন অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, "পরীক্ষা করা প্রায় প্রতিটি ধর্ষিতারই যৌনরোগ পাওয়া গেছে।"

সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদটি ছিল গর্ভধারণ। সন্তান-সম্ভবা ধর্ষিতার সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও ২৫ হাজার একটি গ্রহণযোগ্য সংখ্যা। ধর্ষিতা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মনোভাবটি ছিল কল্পনাতীত। সামান্য অংশই বাচ্চা ধারণ করতে আগ্রহী ছিল। প্রায় জন্মদানের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মেয়েরা অনাগত বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করতো। জোরপূর্বক ধর্ষণের ফসল হিসেবে বাচ্চাদের ভীতিকর আবির্ভাব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনায়াসে অনুমেয় যে বাংলাদেশে ফরসা রঙের পাঞ্জাবী বৈশিষ্টের জারজ সন্তানরা কখনোই বাঙালি সংস্কৃতিতে গৃহীত হবেনা; এমনকি তাদের মায়েরাও নয়।

আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ কন্যাকে কলকাতায় গর্ভপাতে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু লজ্জা, তীব্র ঘৃণা এবং বিকল্প পন্থার ঘাটতির ফলে গ্রামীণ জনপদের সমাধানটি ছিল ভীতিকর এবং অযৌক্তিক। লন্ডন-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাবরশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারের ড. জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের প্রত্যাঞ্চলে কয়েক মাস কাজ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে তিনি তার ভ্রমণের সময়ে অসংখ্য আত্মহত্যা এবং সদ্যোজাত শিশুহত্যার কথা শুনেছেন। ইঁদুরের ওষুধ খেয়ে এবং পানিতে ডোবা ছিল আত্মহত্যার সহজলভ্য পথ। ডেভিস নিরূপণ করে দেখতে পান যে, পাঁচ হাজার মেয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ পদ্ধতিতে, নানারকমের চিকিৎসাগত জটিলতাসহ, গর্ভপাত করিয়েছে।

কলকাতার একটা ক্যাথলিক কনভেন্ট 'মাদার তেরেসা' তার দরোজা খুলে দিয়েছিল, ভিনদেশে বাচ্চা দত্তক দিতে আগ্রহী ঢাকার মেয়েদের জন্য। কিন্তু মাদার তেরেসার প্রচারণা সত্ত্বেও সামান্য সংখ্যক ধর্ষিতাই এগিয়ে আসে তার আশ্রয়ে। বাছাই করার পথগুলো [দত্তকায়ন বা গর্ভপাত] জানার পরে গর্ভপাতই কাম্য হয়ে ওঠে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থার সহযোগিতায় প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ঢাকা এবং এর আশপাশের এলাকায়, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ মোকাবেলায়, সতেরটি ক্লিনিক স্থাপন করে। তথ্য পাওয়া যায় যে প্রথম মাসে শুধু ঢাকা ক্লিনিক একাই প্রায় একশরও বেশি গর্ভপাত করে।

বাঙালি নারীদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থা একটি বীরোচিত শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সামান্য সংখ্যক নারী পেশাদার অধ্যুষিত একটি দেশে, যাদেরই দক্ষতা ছিল, এগিয়ে এসেছে শিকার হওয়া বোনদের সাহায্যে। একজন চিকিৎসক হেলেনা পাশা স্বীকার করে বলেন যে

যুদ্ধের আগে তিনি সম্পূর্ণভাবে গর্ভপাতের বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি সামান্য আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ওই কাজে অকাতরে তার সময় এবং সেবা দিয়ে চলেছেন। তাহেরা শফিকের মতো নারী সমাজসেবীরা সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং সেবা ও আরাম দিয়েছিল ধর্ষণের শিকারদেরকে যা তারা পুরুষদের কাছ থেকে নিতে পারতোনা। একটি বিষয়ে তাহেরা শফিক অবিচল ছিলেন। বাঙালি নারীরা যা অতিক্রম করেছে তা বর্ণনা করার জন্য ধর্ষণ বা জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি কোনো যথাযথ শব্দ নয়। তিনি আলাপ-আলোচনায় ব্যবহার করতে চান 'অত্যাচার' শব্দটি।

পুনর্বাসন বলতে বোঝায় আরাম, স্বস্তি ও গর্ভপাতের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। নারী সংস্থাগুলো গৃহহীন পরিত্যক্ত নারীদেরকে কর্মদক্ষ করে তোলায় এগিয়ে আসে। হস্তশিল্প, শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং ছিল প্রথম পছন্দ– ছোট্ট পদক্ষেপ, তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে ওইসব মেয়েদের বেশিরভাগই জীবনে কখনো নিজ গ্রামের বাইরে যায়নি। [তাদের কাছে] 'পুনর্বাসন' বলতে আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যটি তারপরও ছিল 'বিয়ে'। "একজন উপার্জনকারী মেয়ের বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে বেশি," শুকনো কণ্ঠে বললেন একজন সমাজকর্মী। তবে অত্যাচারিত মেয়েদের অনেকের কাছেই সাহায্য এবং সহযোগিতা পৌঁছেছে অনেক দেরিতে, অথবা একেবারেই পৌঁছায়নি। "হায়, আমাদের কাছে তথ্য আছে যে অনেককেই 'আশ্রয়' নিতে হয়েছে পতিতালয়ে," একজন পুরুষ সরকারি কর্মকর্তা স্বীকার করেন। "এটা এক নির্মম ট্র্যাজেডি।"

ভয়াবহতার পূর্ণচিত্রটি জ্ঞাত হওয়া পরে, গণধর্ষণ কেন সংঘটিত হয়েছিল, যারা এর যুক্তিযুক্ত সামরিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করে তারা বারবার গোলকধাঁধাঁয় হারিয়ে যায়। "আর সন্ত্রাসের সামরিক অভিযানে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্ষণ?" অব্রে মেনেন একজন রাজনীতিককে প্রশ্ন করেছিল। তিনি একটি ধীমান উত্তর দিয়েছিলেন। "ব্যারাকে সৈন্যরা কি নিয়ে আলোচনা করে? নারী এবং যৌনতা। তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে বলুন যে জনসাধারণকে ভীত এবং হতবুদ্ধি করার কথা। সবচেয়ে প্রথমে তাদের মাথায় কি আসবে?" নিজের উত্তরের সুগভীর মাত্রা সম্পর্কে ভীত হয়ে রাজনীতিক শেষ করেন, "মনে রাখবেন, আমাদের কিছু কিছু বাঙালি মেয়েরা খুবই সুন্দরী।" একজন ভারতীয় ঔপন্যাসিক মুলক রাজ আনন্দ 'ষড়যন্ত্রে' সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ধর্ষণ কার্যক্রমটি এতটাই সুব্যবস্থিত এবং এতটাই সুবিস্তৃত ছিল যে সেটাকে অবশ্যই সচেতন সামরিক নীতিসম্পাদিত হতে হয়েছিল, "একটা নতুন প্রজন্মধারা সৃষ্টি করার জন্য এটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইচ্ছাকৃত পরিকল্পিত প্রচেষ্টা" অথবা বাঙালি জাতীয়তাকে পাতলা

বা সংকরে পরিণত করার প্রয়াস, রিপোর্টারদের উদ্দেশ্যে সুগভীর আবেগে বলেন আনন্দ।

তবে বাংলাদেশের গণধর্ষণটি অনন্য নয়। জনপ্রতি অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের সংখ্যাটি ১৯৩৭ সালের নানকিং শহরে হানা দেয়ার সময়ের জনপ্রতি ধর্ষণের চেয়ে বেশি নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম তিন মাসে জার্মান সেনা কর্তৃক ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে সংঘটিত জনপ্রতি ধর্ষণের চেয়ে বেশি নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিটি গ্রামে জনপ্রতি নারী ধর্ষণের চেয়ে বেশি নয়। একটি 'সন্ত্রাসী সামরিক অভিযান' এবং একটি 'সচেতন সামরিক নীতি'-র নির্দেশের কথা ব্যাখ্যারূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল যুক্তি-সন্ধানীদের উত্তর হিসেবে এবং পরে ভুলে যাওয়া হয়েছে।

একটি দিক দিয়ে বাংলাদেশের কাহিনীটি অনন্য। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, যুদ্ধে নারীর ধর্ষণ এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে গণ-অত্যাচারের জটিলতা গুরুতর আন্তর্জাতিক আকর্ষণ লাভ করে। এর একটি কারণ হল শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আকুল চাহিদা ছিল আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়া। রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ধর্ষণকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন সচেতন নারীবাদী চেতনা। অবাঞ্ছিত গর্ভের বাস্তব-ভিত্তিক অতি-গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হিসেবে গর্ভপাতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। আর এভাবেই, পশ্চিমাদের চোখে, বিশ্বের একটি অস্পষ্ট কোণে একটি অস্পষ্ট যুদ্ধ অব্যক্ত অপরাধের পরীক্ষার পরিবেশ প্রদান করল। একবারের জন্য, সশস্ত্র সেনাদের মুখোমুখি অবস্থায় নিরস্ত্র নারীদের সুনির্দিষ্ট ভীতি পরিপূর্ণভাবে শ্রুত হল।

সুসানের সাদাসিধে কথা...

প্রিয় পাঠক, এই মহীয়সী নারী এবং বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে গভীর আন্তরিক একজন গবেষকের জীবনগাথা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার আগ্রহ জমেছে। চলুন দৃষ্টি দেয়া যাক সেদিকে। দেখা যাক নিজের সম্পর্কে কি ভাবেন সুসান। কি তার সাদাসিধে কথা...।

একটু নিজেকে দেখি! ১৯৩৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে জন্ম ব্রুকলিনে। এটাই আমার জন্মদিন। ছোটবেলায় আমি এটা জেনেছিলাম কারণ ডাইম সেভিংস ব্যাংকের ক্যালেন্ডারের ফেব্রুয়ারি মাসের পাতায় ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের কাছাকাছি আমার ছবি সাঁটা হয়েছিল। নারী-যন্ত্রণার এক শীর্ষ-ব্যক্তি হিসেবে আমার কি কোনো রূপক প্রতিচিত্র ছিল সেটা? না। সেটা আমাকে যন্ত্রণা দিতো

কারণ ওই ছবির মেয়েটা চেহারায় মিষ্টি ছিলনা! [এভাবেই নিজের কথা বিবৃত হয়েছে সুসানের 'ফেমিনিটি' শীর্ষক গ্রন্থে।]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা আমার খুব ভালভাবে মনে পড়ে। ফ্র্যাংকলিন ডি. রুজভেল্ট ছিলেন আমাদের বাড়িতে একজন 'রাজা'। তিনি যখন মারা যান তখন আমার বয়স ছিল ১০। আর তার মৃত্যুটি যেন আমাদের পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যু ছিল। আমার বাবা-মা রুজভেল্ট, যুদ্ধ, সংবাদপত্র এবং রেডিও নিয়ে এত বেশি বিচলিত থাকতেন যে আমিও সেসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবা কাজ করতো ম্যাকি-তে একজন ক্লার্ক হিসেবে আর মা কাজ করতো এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে একজন সচিব হিসেবে। বৃত্তি পেয়ে কয়েক বছরের জন্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। স্কুল ছাড়ার পরে ব্রডওয়ের একজন অভিনেত্রী হওয়ার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমার ক্ষেত্রে সেটা ছিল একটা বিরাট ভুল উচ্চাশা। ম্যানহাটনে আমি একটা বহুতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ছোট্ট একটা বাসা খুঁজে নিলাম। ফাইল ক্লার্ক হিসেবে কাজ নিলাম। ওয়েট্রেস হিসেবেও অল্প কাজ করলাম। কয়েকবার চাকরিচ্যুতিও ঘটল। অভিনয় নিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হলাম। এরমধ্যে হঠাৎ করেই আমি সত্যভাষণ জাতীয় কিছু পত্রিকায় সম্পাদনা-ধরনের কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং কিছু দক্ষতাও অর্জন করলাম!

দুপুরের খাবার গ্রহণের কাউন্টারে শ্রেণী-বিভাজনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য দক্ষিণের অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয় ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারীতে। জাতির ওপরে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। আমার ওপরেও এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। নিউ ইয়র্ক উলওয়ার্থের সামনে পিকেটলাইনের আয়োজনকারী কোরে (CORE) যোগ দিলাম আমি। আর কি আশ্চর্য! আমি হয়ে গেলাম একজন রাজনৈতিক কর্মী! ১৯৬৪ সালে নিউজউইকে একজন গবেষক হিসেবে কাজ করার সময়কালে, এসএনসিসি (স্টুডেন্ট নন-ভায়োলেন্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি) এবং কোর একযোগে মিসিসিপিতে আয়োজিত করে 'ফ্রীডম সামার'।

বিশ্বজুড়ে ১৯৬৮ সালটা ছিল এক মজার বছর। এবিসি-তে আমি একজন টেলিভিশন নিউজরাইটার হিসেবে কাজ করছি তখন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলাম আমি। ঠিক সেসময়ে নারীমুক্তি আন্দোলন বিস্ফোরিত হয়। ওই আন্দোলন নিয়ে রচিত আমার বইয়ে প্রকাশ করি নারীবাদী নানা-কাহিনী। আর আন্দোলনের সঙ্গে আমার নিবিড় নৈকট্যের শুরুটা হয়েছে এভাবেই। এরপরে বাংলাদেশের বীরাঙ্গনাদের জন্য, বিশ্বের নারীদের মনের বেদনাকে পর্দার সামনে নিয়ে আসার জন্য চলছে আমার কলম...।

মুক্তিযুদ্ধকালের যৌন-সন্ত্রাস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে গবেষণা করছেন কলকাতার বাঙালি নয়নিকা মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের ল্যাংকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক এবং গবেষক। শিক্ষাজীবনে তিনি ১৯৯৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতক, ১৯৯৬ সালে দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে এমএ, ২০০২ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে নৃতত্ত্বে পিএইচডি এবং ২002 সালেই ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্সের বৃটিশ একাডেমিতে পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ করেছেন।

বিগত কয়েক বছরে প্রকাশ করেছেন অসংখ্য নিবন্ধ, গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ। তার গবেষণার এলাকাটি নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি-তত্ত্বের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এর দৃষ্টিপাত লিঙ্গ, স্মৃতি, সন্ত্রাস এবং মানবাধিকারের ওপরে। তার দুই স্তর-ভিত্তিক গবেষণার প্রথমটিতে তিনি বাংলাদেশে এসে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত যৌন-সন্ত্রাসের গণ-স্মৃতি এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই ব্যাপক গবেষণার ওপরে 'স্পেকটার্স অ্যান্ড ইউটোপিয়াঃ সেক্সুয়্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ১৯৭১' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে ডিউক ইউনিভার্সিটি।

দ্বিতীয় স্তরে তার গবেষণা দৃষ্টিপাত করেছে যুদ্ধশিশুর (যুদ্ধকালে যৌনসন্ত্রাসে জন্ম নেয়া শিশু) প্রিজমের মাধ্যমে দেখা পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার জাতিধারা এবং জাতিরাষ্ট্রের প্রতিযোগী-সম্পর্কের ওপরে। এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং ভিনজাতিতে একীভূত হওয়ার বিষয়টি মিলেছে আন্ত-জাতি দত্তকায়নের সঙ্গে। বাংলাদেশের বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে গবেষক নয়নিকা মুখোপাধ্যায়ের বিশাল রচনাগাথার একটি ছোট্ট অংশবিশেষের সৌজন্য-উদ্ধৃতি এখানে বর্ণনা করছি...।

মুক্তিযুদ্ধকালে ২০০,০০০ ধর্ষিতা নারীকে বীরাঙ্গনা নামে প্রশংসিত করে তাদের প্রতি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটা নীতি গ্রহণ করে। বিয়ের মাধ্যমে পুনঃগ্রহণ এবং সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করার প্রয়াসে এবং গণমানুষের কাছে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণের জন্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটা নতুন শ্রেণি। সাহায্য ও পুনর্বাসন, গর্ভপাত ক্লিনিক, মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া, যুদ্ধাক্রান্ত [প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে ধর্ষিত]

মেয়েদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার সুবিধাসহ সারা দেশে পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় সাহায্য ও পুনর্বাসন বোর্ড।

যুদ্ধে ধর্ষণের বিষয়টি ১৯৭১ সালের পরে, ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরে বীরাঙ্গনারা রাষ্ট্রীয় বক্তব্যে আনুষ্ঠানিকভাবে লাভ করে 'দুই লক্ষ মা ও বোন' প্রতীক। ১৯৭৫ সালের পরে বীরাঙ্গনারা হারিয়ে যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে। যদিও সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্রে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ছিল ৭০ থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত। জনসাধারণের আলোচনায় যৌন-সন্ত্রাসের ইতিহাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে ২৭শে মার্চ ১৯৯২ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের প্রথম পাতায় এবং ২৮শে মার্চ ১৯৯২ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পাতায় গণআদালতে তিনজন বীরাঙ্গনার প্রকাশিত ছবির মাধ্যমে। ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চে ওই আদালতে পাকিস্তানের দালাল শীর্ষ রাজাকার গোলাম আযম, যে রাজনৈতিক কৌশলের আড়ালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তার বিচার পরিচালনার আন্দোলন সংঘটিত হয়। গণআদালতে ক্ষতিগ্রস্ত [যারা তাদের বাবা, ভাই বা পুত্রকে হারিয়েছে] ব্যক্তিবর্গ তাদের বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বর্ণনা করেন। এসব বিবরণ যুদ্ধে ধর্ষিত ওই তিনজন নারীর প্রামাণিক উপস্থিতির সঙ্গে 'সম্পূরক' হয়ে যায়। [এদের নিয়েই আমি প্রাথমিকভাবে আমার মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করি।]

১৯৯২ সাল থেকে যৌন-সন্ত্রাসের বিষয়টি আবার মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হতে শুরু করে। জাতীয় পর্যায়ে, দালালদের পুনঃস্থাপন এবং ওইসব রাজাকাররা যারা প্রেক্ষিতে যারা যুদ্ধকালে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা, ফতোয়ার উত্থান, মুক্তিযুদ্ধকে [স্নায়ুযুদ্ধকালের সমসাময়িক সময়ে সংঘটিত] আন্তর্জাতিক সূত্রে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক আইনি ভাষায় 'গৃহযুদ্ধ' বা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে, তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গণহত্যার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়াকে উপলব্ধি বা স্বীকার করার ব্যর্থতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্লেষিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় ইতিহাস। দালালদের বিচারের আহ্বানের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে একটি ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যেখানে রাজাকারদের বিচার করা হবে। একইসঙ্গে পাকিস্তানকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করারও দাবি উঠেছে।

'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' শীর্ষক ১৯৯৩ সালে লন্ডনে তৈরি করা তথ্যচিত্রে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে বসবাসকারি তিন জন দালালের যুদ্ধাপরাধ তুলে ধরার

মাধ্যমে আগুনে আরো জ্বালানি যুক্ত হয়। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেয়া, এবং এর পরে জাপান সরকার কর্তৃক কমফোর্ট উইমেনদের [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়াতে এক থেকে দুই লক্ষ কোরীয় নারী] কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, বসনিয়া ও রুয়ান্ডায় সংশ্লিষ্ট কিছু অগ্রগতি এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। সবার ওপরে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে নীলিমা ইব্রাহিমের দুই খণ্ড 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইয়ে আট জন নারীর ব্যক্তিগত যৌন-নির্যাতনের কথা প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে কাজ করার সময়ে এই লেখকের সঙ্গে এই আট জনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়।

'গণআদালতে' তিন জন নারীর সরব প্রতিচিত্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই যৌনহয়রানির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়েজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। দুই লক্ষ যুদ্ধনারীর 'সংখ্যাগত অস্পষ্টতা'র মাঝে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে 'প্রকৃত, প্রামাণিক ও যথার্থ' বীরাঙ্গনার প্রতিরূপ। এই বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের পথ ধরেই আসতে পারে পরবর্তী স্তরের মৌখিক ইতিহাস যার মাধ্যমে দলিলভুক্ত হয়ে আছে উনিশ একাত্তরের ধর্ষণের বর্ণনা। এই বাস্তব সাক্ষ্যের ধরনে কেউ হয়তো মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন সময়ের সংবাদপত্রে, বিশেষত মার্চ ও ডিসেম্বরের স্মরণকালে একাত্তরের যৌনহয়রানির বর্ণনাসহ 'নতুন আবিস্কৃত' যুদ্ধনারীদের প্রতিচিত্রের উপস্থিতি খুঁজে পাবেন।

বীরাঙ্গনার কোলে পুতঃপবিত্র যুদ্ধশিশু

বীরাঙ্গনা

রওশন

সাঈদা

অজ্ঞাত

নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে কয়েকজন বীরাঙ্গনা

ছবিঃ লিজ ট্রোটা, সাংবাদিক, এনবিসি

এনবিসি টেলিভিশনে ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারিতে সম্প্রচারিত তথ্যচিত্র থেকে সংগৃহীত

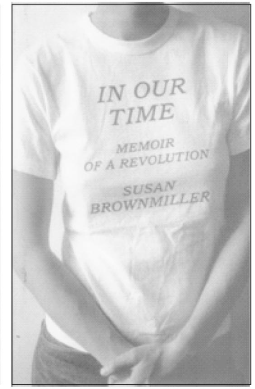

সুসান ব্রাউনমিলার

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু বিষয়ক সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র

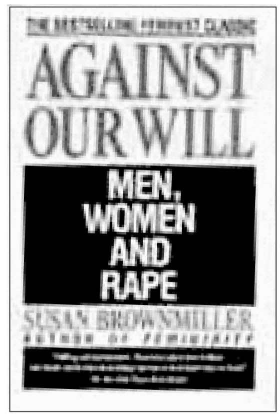

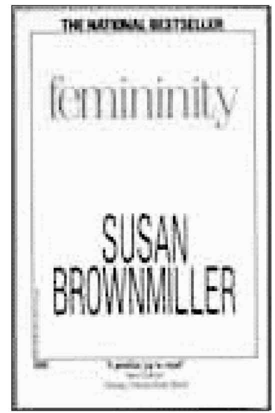

অধ্যায়- ৩
বাংলাদেশে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু বিষয়ক পদক্ষেপ

পাবনার বীরাঙ্গনা হাসপাতালের দৃশ্যপট

স্থান	:	নির্ঝর, লাহিড়ীপাড়া, পাবনা - ৬৬০০
তারিখ	:	১৩ এপ্রিল ২০০৮
সময়	:	৪.৩০টা থেকে ৬.০০টা
সাক্ষাৎকার দাত্রী	:	সেবিকা দেলোয়ারা বেগম
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী	:	লেখক

মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পরপরই সারা দেশে গঠিত হয় নারী পুনবার্সন কেন্দ্র। পাবনা শহরের উত্তর উপকণ্ঠে নূরপুরের ডাকবাংলা ভবনে স্থাপিত হয়েছিল পাবনা নারী পুনবার্সন কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বীরাঙ্গনাদের জন্য সেবা সদন এবং যুদ্ধশিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা এতিমখানা। বিশেষত বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা করার কারণে লোকমুখে সেই সেবা সদনই পরিচিত হয়ে উঠেছিল 'বীরাঙ্গনা হাসপাতাল'-রূপে।

ওই বীরাঙ্গনা হাসপাতালের নার্স হিসেবে কাজ করেছিল দেলোয়ারা বেগম। বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে তখনই শুরু হয় তার চাকরি জীবন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন পাবনায় নিজ বাড়িতে। বলাই বাহুল্য যে, বীরাঙ্গনা সেবিকা দেলোয়ারার নিজের বার্ধক্যের মতো তার বাড়িটিরও যেন বার্ধক্যাবস্থা! বিধবা দেলোয়ারার স্বামীর নাম [মরহুম] আমজাদ হোসেন। তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি পঙ্গু। সে কাজ করে একটি এতিমখানায়। এই পঙ্গু ছেলেটিকে নিয়েই এখন অবসর সময় কাটে মুক্তিযুদ্ধকালের উদ্যমী তরুণী দেলোয়ারার।

পাবনার নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উদ্যোগীদের একজন হিসেবে আমার মা (অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস) এবং ওই কেন্দ্রের কর্মকর্তা কানিজ রসুল প্যান্সি আপার কাছ থেকে সম্প্রতি জানতে পারি দেলোয়ারা বেগমের কথা। শোনার পর থেকেই, তাকে দেখা এবং তার কথা নিজমুখে শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। ২০০৮ সালের ১৩ এপ্রিলে নিজ জেলা শহর পাবনায় গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। আমার আগ্রহের কথা শুনে তিনিও খুব খুশি। চট্টগ্রাম থেকে সারাদিনের ভ্রমন শেষে বিকেলে আমাদের বাড়ি নির্ঝরে পৌছে দেখি যে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি! সঙ্গে পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহকর্মী নির্মল বসাক [পিতা মৃত নন্দ গোপাল বসাক]। ড্রইং রুমে বসেই কথা হল তার সঙ্গে। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিল আমার মা এবং মামাত ভাই তারেক [নওগাঁ জেলার আত্রাই অঞ্চলের একাত্তরের শহীদ শেখ মোহাম্মদ গোলাম রব্বানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র]।

এটাই আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎকার-গ্রহণ; তাও আবার একজন বীরাঙ্গনা-সেবিকার! নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হল। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত চলল সেই আলাপচারিতা। জীবনের সব মুহূর্তের অনুভূতি এক নয়। ব্যক্তি-সমাজ-দেশের প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনার সমন্বয়ে রচিত হয় ইতিহাস। এটা যেন আমার নিজের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য আমার মুক্তিযোদ্ধা পিতা জনাব আমজাদ হোসেনের হাত ধরে ১৯৭১ সালের ৬ই আগস্টে, ১১/১২ বছর বয়সে, দেশ ছেড়ে মধুপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে শুরু করেছিলাম এক অনন্য অভিযাত্রা - 'ক্যাম্পে গিয়ে কিশোর আমি মুক্তিযোদ্ধা হব!' আজ ২০০৮ সালের ১৩ই এপ্রিলের এই বিকেলে যেন মনে হল ফিরে গেছি সেই সন্ধিক্ষণে!

দেলোয়ারা বেগমের কাছ থেকে বীরাঙ্গনা এবং যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত তথ্য শুনে শিহরিত হতে হয়। একেবারেই অনানুষ্ঠানিক বা সাদামাটা ঢঙে তার সঙ্গে আলাপের সারসংক্ষেপ করলে যা দাঁড়ায় তা এরকম।

পাবনার বীরাঙ্গনা হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে। পাবনার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একজন চিকিৎসক (নাম মনে করতে পারেন না দেলোয়ারা) এবং দেলোয়ারার ওপরে দায়িত্ব বর্তায় হাসপাতালের সেবা সম্পর্কিত তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে পৌছানোর। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবর্তমানে, কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ। দুজনে মিলে শহর, শহরের উপকণ্ঠ এবং শহর থেকে দূর-দূরান্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্ভাব্য বীরাঙ্গনাদের কাছে সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানোর কাজ শুরু করে তারা। তাদের ওই আহ্বান এবং লোকমুখে সংবাদ পেয়ে জানুয়ারি '৭২ থেকেই প্রয়োজনীয় সেবা নেয়ার জন্য বীরাঙ্গনার

হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের এদেশীয় জামাত-সংঘ দালালচক্র কর্তৃক ধর্ষিতা ও অন্তঃসত্ত্বা বীরাঙ্গনা নারীরা।

এসময়ে ওই বীরাঙ্গনা হাসপাতালে আসে একজন বিদেশী চিকিৎসক। দেলোয়ারা বেগম তার নাম মনে করতে পারেননা। ধারণা করি যে সম্ভবত তিনি ছিলেন ড. জিওফ্রে ডেভিস। অস্ট্রেলিয়ার নর্থ সাউথ ওয়েলসের সিডনি নিবাসী একজন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ড. জিওফ্রে ডেভিস ১৯৭২ সালে বীরাঙ্গনাদের সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশে এসে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড, ইউনাইটেড ন্যাশনস ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাকটিভিটিজ (ইউএনএফপিএ - বর্তমানে ইউএনপিএফ বা ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড) এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের অধীনে প্রায় ছয় মাস কাজ করেছিলেন। তিনি ড. জিওফ্রে ডেভিস হন বা না হন, সেই চিকিৎসকই সন্তান-জন্ম এবং গর্ভপাত সম্পর্কিত কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দেন দেলোয়ারাকে। সযত্নে নিপুণ হাতে নিরাপদভাবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন দেলোয়ারা। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই দেলোয়ারার হাতে যুদ্ধশিশুদের জন্ম হতে শুরু করে। বীরাঙ্গনারা হয়ে ওঠে মা-বীরাঙ্গনা।

নূরপুরের ডাকবাংলোটি একটা বিশাল দোতলা দালান। এর একটি অংশে স্থাপিত হয়েছিল বীরাঙ্গনা হাসপাতাল। তার একটি কক্ষে থাকতো বীরাঙ্গনারা। পাশের কক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল যুদ্ধশিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা এতিমখানা। জন্মের পরে প্রাথমিকভাবে আশ্রয়কেন্দ্রের দোলনায় রাখা হতো যুদ্ধশিশুদেরকে। আশ্রয়কেন্দ্রে ৪/৫ জন মা-বীরাঙ্গনা থাকতো পরিচয় গোপন করে; সম্ভবত বাচ্চার কাছাকাছি থাকার আগ্রহে!

কতজন বীরাঙ্গনা ভর্তি হয়েছিল ওই হাসপাতালে? তাদের বয়স কত ছিল? কয়টা বাচ্চার জন্ম হয়েছিল? কেউ গর্ভপাত করেছিল কি? কি করা হয়েছিল সেসব বাচ্চাদেরকে? তাদের কথা বলুন। আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে দেলোয়ারার উত্তর শুনতে থাকলাম গভীর আগ্রহে।

১৯৭২ সালের প্রথম কয়েক মাসে মোট ১৬০ জন গর্ভবতী বীরাঙ্গনা মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৯০ জন যুদ্ধশিশুর জন্ম দেয়। বাকি ৬০/৭০ জন গর্ভপাত করায়। ওইসব বীরাঙ্গনা মেয়েদের বেশিরভাগের বয়স ছিল ১২ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। ওইসব অসহায় মেয়েদের ওপরে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের মাত্রা এতই বেশি ছিল যে এদের মধ্যে অনেকের শারীরিক অবস্থা ছিল ভাষায় অবর্ণনীয়। অত্যাচারের মাত্রা এতটাই পাশবিক ছিল যে, কারো কারো যৌনাঙ্গ এবং পায়ুপথ একীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়! এসব কথা বলার সময়ে লক্ষ্য করছিলাম যে দেলোয়ারার মুখ কঠিন হয়ে উঠছিল। এক পর্যায়ে

জানালেন যে এদের মধ্যে শামীমা নামে পাবনার উল্লাপাড়া থেকে আগত একটি বিএ পাস শিক্ষিত মেয়েও ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের খনন করা বাংকারে লুকিয়ে থেকেও রক্ষা করতে পারেনি নিজেকে।

জন্মের পরে আশ্রয়কেন্দ্রের দোলনায় কয়েকদিন সযত্নে রাখার পরে নির্দেশমতো ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সে দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করে দেলোয়ারা বেগম। শুরু হয় পাবনা থেকে ঢাকা হয়ে বিদেশে যুদ্ধশিশুদেরকে প্রেরণের কার্যক্রম। প্রথম দলে ছিল ৭টি বাচ্চা। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থায় হেলিকপ্টারে করে ওই যুদ্ধশিশুদের নিয়ে ঢাকায় যান দেলোয়ারা। সব বাচ্চাকেই হস্তান্তর করেন পুরনো ঢাকার ইসলামপুর মিশন হাসপাতালে [মাদার তেরেসা কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২১শে জানুয়ারিতে স্থাপিত দি মিশনারিজ অব চ্যারিটির একটা শাখা]। সেখানে বাচ্চাদের রাখার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। এরপরে সড়কপথে ফিরে আসেন দেলোয়ারা। প্রায় তিন মাস পরে আবার ৫০টি যুদ্ধশিশুকে নিয়ে আবার ঢাকায় যান দেলোয়ারা বেগম। এবারে হেলিকপ্টার না হলেও একটি বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেসময়ের জেলা প্রশাসক জনাব সাইদুর রহমান। আরো কয়েক মাস পরে পাবনা থেকে প্রেরণ করা যুদ্ধশিশুদের শেষ দলটিকে নিয়ে একইভাবে ঢাকায় যায় দেলোয়ারা। এ পর্যায়ে দেলোয়ারা জানালেন একটা অসংগতির কথা। প্রথমবারে ঢাকায় যুদ্ধশিশুদের বরণের বিষয়ে যে আগ্রহ-উৎসাহ লক্ষ্য করেছিলেন দেলোয়ারা, পরের বারে সেসবের মাত্রায় যেন খানিকটা ভাটা পড়েছিল বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। শেষে জানালেন যে, বিদেশে বা কোন্ দেশে বাচ্চাদেরকে পাঠানো হয়েছে সেসম্পর্কে কোনোকিছু জানেন না দেলোয়ারা।

প্রশ্ন করলাম, বীরাঙ্গনা মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেয়া অর্থাৎ ঢাকায় বা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার সময়ে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া বা মন খারাপ করেনি? উত্তর দিল, না, সেরকম কেউই করেনি। এমনকি পাশের ঘরে থেকেও কেউই কখনো দোলনায় থাকা নিজ নিজ বাচ্চাকে দেখতেও আসতো না। কারণ তাদের কাছে বাচ্চারা ছিল দুর্ঘটনার ফসল এবং বিশেষত পাকিস্তানি ঔরসজাত। দেলোয়ারা বলেন যে মূলত এজন্যই বাচ্চাদের জন্য তাদের কোনো মায়া জন্মেনি।

আলাপের মাঝে কিছু ব্যতিক্রমী তথ্যও জানালেন তিনি। কোনো কোনো মা-বীরাঙ্গনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অগোচরে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, অতিরিক্ত ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল নিজ নিজ বাচ্চাকে। আবার অন্যদিকে কয়েকজন মা-বীরাঙ্গনা নিজ নিজ বাচ্চা নিয়ে পালিয়েও গেছে। এছাড়াও অভিযোগ আছে যে,

ওইসব মেয়েদের মাঝে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 'বীরাঙ্গনা সেজে' টাকা পাওয়ার লোভে পড়েও ভর্তি হয়েছিল বীরাঙ্গনা হাসপাতালে। উল্লেখ্য, বীরাঙ্গনা মেয়েদেরকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্য করতো।

শুধু জন্মদানের ব্যবস্থাই নয়, সেইসঙ্গে সমাজে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনেও এগিয়ে আসে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র। তবে প্রথমেই তাদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয় তারা। বীরাঙ্গনা নারীদেরকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিলে, সম্ভাব্য বরদেরকে অর্থ-সাহায্যের মাধ্যমে উৎসাহ দিতে শুরু করে পুনর্বাসন কেন্দ্র। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশে ওই অর্থ সাহায্যের বিষয়টা ছিল খুবই উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। 'অর্থের বিনিময়ে' বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করার জন্য অনেক ছেলেই আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল। দেলোয়ারা বেগম যতটুকু মনে করতে পারেন - ওই বীরাঙ্গনা হাসপাতালেই কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ৫০/৬০ জন বীরাঙ্গনা নারীকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন করলাম, কেউ কি কোনো বাচ্চাকে দত্তক হিসেবে নেয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিল? দেলোয়ার জানালেন,

মীরা রাণী নামের পাবনা মানসিক হাসপাতালের একজন সিস্টার একটি মেয়ে যুদ্ধশিশুকে দত্তক নিয়েছিল। আবার প্রশ্ন করি, ওই মেয়েটি এখন কোথায়? তার সঙ্গে দেখা করা যাবে কি? কিন্তু তিনি জানালেন, ১৯৮২ সালে মীরা রাণী মারা গেছে। ওই শিশুটি সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। এখন আর কিছু জানা সম্ভবও নয়।

বিয়ে দেয়া কোনো বীরাঙ্গনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোনোকিছু জানেন কি? দেলোয়ারা উত্তর দিলেন, ১৯৭৩ সালে এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক জনাব আবদুস সাত্তার, জেবুন্নেসা নামের এক বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করেছিল। পরে ওই সুপার সাহেব পদোন্নতি পেয়ে সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তাও হয়েছিলেন। তবে বর্তমান অবস্থানটি অজ্ঞাত।

কতদিন ধরে চলেছিল ওই বীরাঙ্গনা হাসপাতাল? উত্তরে বলেন, ১৯৭২ সালের শেষের দিকেই বীরাঙ্গনা হাসপাতালের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। তবে সেখানে সেবা সদনে পাবনা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে সেখানে আশ্রয় নেয়া বীরাঙ্গনা নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এভাবে কয়েক বছর প্রশিক্ষণ লাভ এবং এখানে বসবাস করার পরে বীরাঙ্গনাদেরকে নিজ ব্যবস্থায় কাজ করে উপার্জন করার পরামর্শ দিয়ে সেখান থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী জাতি বাঙালির একজন মানুষ প্রায় পঁচাত্তর বছরের বয়োবৃদ্ধা দেলোয়ারার মুখে সবসময়ে লেগে আছে এক তৃপ্তিময় হাসি। কেন এত

সুখী সে? প্রশ্ন করতেই আরো হাসিতে মুখ ভরিয়ে সপ্রতিভ উত্তর, 'আমিতো বীরাঙ্গনা সেবিকা! আমার আবার দুঃখ কি! এই নামে কেউ ডাকলে খুব ভাল লাগে।' প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বঞ্চিত দেলোয়ারার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি একেবারেই সহজ-সরল। মুক্তিযুদ্ধের একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কম নয় দেলোয়ারা বেগমের অবদান। সশ্রদ্ধচিত্তে সালাম জানাই পাবনার বীরাঙ্গনা হাসপাতালের একজন নার্স থেকে বীরাঙ্গনা সেবিকায় দেলোয়ারা বেগমের উত্তরণের অভিযাত্রাকে।

মাদার তেরেসার আঁচলে যুদ্ধশিশু

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বিশেষত বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের মানবিক সাহায্যে ছুটে এসেছিলের বিশ্বনন্দিত মাদার তেরেসা [২৭শে আগস্ট ১৯১০ - ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭)। আলবেনীয় এই মহীয়সী নারী ছিলেন একজন ক্যাথলিক নান। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন ভারতের কলকাতায়। নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মানব সেবায়। নিজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মাধ্যমে আশ্রয় প্রদান করেছেন অসহায় মানুষকে। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই ঢাকায় এসে পাঁচটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চালু করেন বীরাঙ্গনাদের আশ্রয়কেন্দ্র। সারাজীবন গর্ভপাতের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে বাংলাদেশের গর্ভবতী হয়ে পড়া বীরাঙ্গনাদেরকে নিজ নিজ সন্তান [যুদ্ধশিশু] জন্ম দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন মাদার তেরেসা; বিস্মিত হয়েছিল বিশ্ব! সকল যুদ্ধশিশুর জন্য 'মায়ের আঁচলে' আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি! অসম প্রয়াসে রক্ষাও করেছিলেন সে প্রতিশ্রুতি।

১৯৭৯ সালে ভারত তাকে দিয়েছে সে দেশের শীর্ষ-উপাধি 'ভারতরত্ন' এবং ১৯৮০ সালে বিশ্ব দিয়েছে নোবেল পুরস্কার। ১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে প্রদান করেছে সম্মানী নাগরিকের মর্যাদা। এ পর্যন্ত মাত্র ৬ জনকে দেয়া হয়েছে এই মর্যাদা।

১২ জুলাই ২০০৮ তারিখে 'ফিরে দেখা ৭১' শীর্ষক এক অভূতপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ইন্টারনেটে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অসংখ্য দিক নিয়ে এমন পরিপূর্ণ প্রকাশনা আর চোখে পড়েনি। অনন্য এই গ্রন্থে অমি রহমান পিয়াল রচিত/অনূদিত 'যুদ্ধশিশু '৭১: মাদার তেরেসা' নিবন্ধে উঠে এসেছে মার্কিন ঔপন্যাসিক এবং দি নিউ ইয়র্ক টাইমসের শৌখিন প্রদায়ক অব্রে মেনেনের সূত্রে তেরেসা সম্পর্কিত একটা দৃশ্যপট। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ ও কলকাতায় এসেছিলেন মেনেন। নিজ

দেশে ফিরে গিয়ে দি নিউ ইয়র্ক টাইমসের ২৩শে জুলাই ১৯৭২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করেন তার অভিজ্ঞতা-লব্ধ 'দি রেপস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন। সেটায় উল্লেখিত একটি অংশে কলকাতায় মাদার তেরেসার আশ্রম-সংশ্লিষ্ট একটি অংশে মেনেন বিবৃত করেছেন...।

"...হালকা নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরে তার (মাদার তেরেসার) সহকারীরা যাওয়া-আসা করছেন। দু'এক জনের সঙ্গে কথা বললাম। কিছুক্ষণ পরে আমার একেবারে পেছনে একজনের নিঃশব্দ উপস্থিতি অনুভব করলাম। পোশাকে বোঝাই গেল যে তিনিও তেরেসার সহকারীদের একজন। ছোটখাট একজন ভদ্রমহিলা। তার দিকে তাকালাম। একেবারে সরাসরি তার চোখের দিকে। তার পরিচয় স্পষ্ট হল। মাঝবয়সী। একটা রুক্ষ প্রলেপ রয়েছে চেহারায়। আবার একটু মায়াময় এবং কিছুটা কৌতুকমাখানোও বটে। পোপ জন এবং মহাত্মা গান্ধীরও এধরনের চোখ আমি দেখেছি। কলকাতায় এসে তেরেসা সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত বয়স্কদের নিয়ে মিশন শুরু করেছিলেন। সমাজ, সংসার বা আপনজনদের সবাই যাদেরকে বিবেচনা করেছে বোঝা হিসেবে। জীবনের শেষ পর্বে এসে তারা পরম আশ্রয় পেয়েছিল তেরেসার আঁচলে। অন্যের উপকার আর মানবসেবার মহান ব্রতই তাকে ভারতে এবং বিশ্বে কিংবদন্তির মর্যাদা দিয়েছে।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতাদের উদ্ধারকাজে তার অবদানই প্রথম পদক্ষেপ'– আমার এই স্তুতিবাক্য এড়িয়ে গেলেন মাদার তেরেসা। শান্তস্বরে বললেন, হাজার হাজার মানুষ সেখানে কাজ করছে। তারপরে আবারো বললেন, একদিক দিয়ে বিষয়টা ভালই হয়েছে। বাঙালিরা জাতি হিসেবে বেশ দয়ালু। ওটা তাদের স্বভাবগত সংস্কৃতি। এই ঘটনাটা তাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো প্রয়োজন ছিল এরকমটার। তারা নিজের পা শক্ত করে দাঁড়িয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে নারী-পুরুষ এগিয়ে এসেছে। আমার ধারণা নিজ-জাতির এই বিয়োগান্তক ঘটনা বদলে দিয়েছে তাদের জাতিগত মনোজগত। তুমি অবাক হবে জেনে যে শত শত তরুণ এসব মেয়েদেরকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী হয়েছে!'

'মাদার তেরেসা। সত্যিই কি কেউ বিয়ে করেছে? প্রশ্ন করলাম আমি। 'এখনো করেনি। তবে দেখ, এসব মেয়েদের বেশিরভাগই গর্ভবতী। বাচ্চা হবে বা হয়েছে। তাই অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।'

গর্ভবতী হয়ে পড়া বীরাঙ্গনাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার গর্ভপাত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিষয়টা মূলত সমাজ-স্বীকৃত নয়। আবার সমাজও ঠিকমতো তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেনি। বেশিরভাগ শিশুই ভূমিষ্ঠ হবে। তেরেসা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন একদৃষ্টে...।

বীরাঙ্গনার মনোবেদনা

১৯৭২ সালের ২২শে এপ্রিলে 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' পত্রিকায় [ভল্যুম ৭৬, নম্বর ১৭] হার্জি মালিক নামের এক সাংবাদিক প্রকাশ করেন 'বাংলাদেশ: আফটারম্যাথ অফ রেপ' শীর্ষক প্রতিবেদন। তীক্ষ্ণ বাণের মতো সরাসরি ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন যুদ্ধের পরে বাংলাদেশের ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতি। বেশ কয়েকজন বীরাঙ্গনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথায় প্রকাশিত হয়েছে ধর্ষণের ব্যাপকমাত্রা। নিষ্ঠুরতার গভীরতা এতই বেশি ছিল যে বলতে হয় – কয়েক লক্ষ বাঙালি নারীকে নয়, পাকিস্তানি সেনারা ধর্ষণ করেছিল বাংলাদেশকে! মালিকের প্রত্যক্ষদর্শী কলমে প্রতিভাত হয়েছে বাংলাদেশের নিরস্ত্র নারীদের ওপরে পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের জঘণ্য বর্বর অত্যাচারের অবিশ্বাস্য বর্ণনা। বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে বীরাঙ্গনাদের মনের বেদনা এবং সাহস।

ঢাকার উপকণ্ঠের একটা বাড়ি। মেঝেতে বিছানো তোষকের ওপরে শুয়ে আছে মেয়েটি। নীরব, তাকিয়ে আছে অপলক। সাতটি টিনএজ মেয়ের একজন সে। তাদের তিনজন পরিশ্রান্ত; ক্লান্তির ঘুমে অচেতন। তাদের অবসন্ন মুখগুলো ফ্যাকাশে। একজন বসে আছে জানালার পাশে। পাতলা চেহারায় গভীর কৃষ্ণবর্ণ চোখ। চুল ছোট করে কাটা। কতইবা বয়স হবে। সম্ভবত ১৩। একজনের বয়স ১৬। এদের প্রত্যেকের গর্ভপাত করা হয়েছে পাঁচ-ছয়দিন আগে। এখন তারা সেরে উঠছে।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থা এবং ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুডের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় স্থাপিত ক্লিনিকে চিকিৎসা লাভকারীদের প্রথম দলে ছিল এসব মেয়ে। একেবারে প্রথম জন ছিল ১২ বছর বয়সী নিরক্ষর এক কিশোরী যার বাবামাকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছে। 'কোনোমতে সে হেঁটে হেঁটে পথপ্রান্তর অতিক্রম করে আমাদের ক্লিনিকে এসে পৌঁছেছে। নিশ্চয়ই এটা ঈশ্বর বা কোনো প্রাণী তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে,' বলেন একজন ক্লিনিক কর্মী। যেসব নারীদের এরকম সাহায্য-সহায়তা প্রয়োজন তাদের নিরূপিত সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রামে এবং শহরে অনুসন্ধানী দল পাঠিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এই সংখ্যা। ক্লিনিকে কর্মরত বৃটিশ এবং মার্কিন চিকিৎসকরা এই সংখ্যাকে বাড়ানো বা অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন না। আর ওই সংস্থার কাছে সম্পূর্ণ কাজটি বেশ সুকঠিন।

স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা আত্মগোপনের পেছনে রয়েছে এক ভয়াবহ কাহিনী। পাকিস্তানি সেনা অধিকৃত এলাকায়, যা এখন বাংলাদেশ, নয় মাস ধরে সেইসব

কাহিনিতে ছিল লালসা এবং নিষ্ঠুরতার খেলা। ঢাকার মাদার তেরেসার হোমে সিস্টার মার্গারেট মেরিকে একজন মেয়ে বলেছিল তার কষ্টের কাহিনি। তাকে তার বাবার সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে। অস্ত্রের মুখে তার বাবাকে সেই করুণ দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছে। গর্ভবতী না হলেও সে অনুভব করে চরম অপমান। মেয়েটি বলে, 'আমি তাদেরকে (মুক্তিযোদ্ধা হয়ে) হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ছিলাম পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমি ভেবেছিলাম যে আমি চলে গেলে বাকিদের কি হবে। তবে আমার প্রশ্ন– যারা এরকম ভয়াবহ কাজ করেছে তাদের কেন কিছু করা হয়নি।'

আরেকজন মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল তার স্বামীর সামনে। তারপরে তারা সেই স্বামীটিকে তুলে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। 'নিজের শ্বাসরোধ করার জন্য আমি আমার পরনের শাড়িটা গলায় পেঁচিয়ে ফেলি। কিন্তু আমার ছোট ছোট তিন বাচ্চাকে দেখে সেটা আর করতে পারিনি। সেসব সময়ে আমি বহুবার নিজেকে হত্যা করতে চেয়েছি। কিন্তু প্রতিবারেই আমার সন্তানদের কথা ভেবে থেমে গেছি।'

সিস্টার মার্গারেট মেরি বলেন যে সবচেয়ে মর্মান্তিক কাহিনী বলে কিছু নেই। 'প্রত্যেকটি একেকটা বিশাল মানবিক বিয়োগান্তক অধ্যায়।' আগ্রাসনের ভয়াবহ দিনগুলোতে কোনো মেয়েই নিরাপদ ছিলনা। স্বামীর সঙ্গে রিকশায় ভ্রমণরত স্ত্রীকে বর্বর সেনাদল পথিমধ্যে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেছে বা রাস্তাতেই ধর্ষণ করেছে বা হত্যা করেছে বা জীবিত রেখেছে অন্যান্য পশুরূপী সেনাদের বিনোদনের জন্য। স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসের জন্য অপেক্ষমান কিশোরীদেরকে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনারা; তারা আর ফেরেনি। ঢাকার কাছে একটা কারখানায় কর্মরত একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন – এক জিপ ভর্তি সেনাদল রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখতে পায়। তার থামে সেখানে। সেখানেই প্রতিটি সৈন্য মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। তারপরে তারা তাকে হত্যা করে এবং গাড়ি চালিয়ে প্রস্থান করে।

২৫শে মার্চের কালরাতের আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার পরে প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ধর্ষণ এবং অত্যাচারের শিকার অসহায় মেয়েরা, যাদের মধ্যে কারো কারো বয়স মাত্র ৭ বা ৮, এখনো রয়েছে হাসপাতালে। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে বিশাল পুনর্বাসনের কাজ। যারা এমন বেদানবিধুর কষ্টের শিকার হয়েছে তাদেরকে 'বীরাঙ্গনা' বলে অভিহিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার স্ত্রী এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত তার স্ত্রী এই পুনর্বাসন কাজে গভীরভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

নৈতিকতার মেকী মূল্যবোধ এবং বকধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সময় নেই। এখন একটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে; তা হল হাজার হাজার কিশোরী-তরুণী মেয়েদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ। সাধারণভাবে সবাই এটা গ্রহণও করেছে। জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি অবস্থায় সকল সদিচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তায় ধর্ষণের ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে বৈধ করেছে। এরকম মুহূর্তেও গর্ভপাতকে বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশঙ্কায় কোনো আনুষ্ঠানিক বা সরকারি আদেশ জারি করা হয়নি; যদিও এ উদ্যোগে সরকারের বেসরকারি আশীর্বাদ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাগুলো যা করতে পারে তা হল চারদিকে এই কথা ছড়িয়ে দেয়া যে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। তবে বিষয়টা সহজ নয়। কারণ মর্মান্তিক কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে প্রত্যন্ত গ্রামে বা দেশের দূরদূরান্তে। বাংলাদেশে কখনোই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। আর এখনতো একেবারেই পর্যুদস্ত। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র এসব কাজে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করছে। আর এই ধারাবাহিকতায় ঢাকা ক্লিনিকই প্রথম। এই ক্লিনিকটি খোলামাত্রই প্রতিদিন ২৫ থেকে ৪০ জন নারী আসতে শুরু করে এর অভ্যর্থনা কেন্দ্রে। আর এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। কোনো নাম নয় শুধু একটি নম্বরই সূত্র। প্রতিটি জেলার জন্যই ক্লিনিকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন মার্কিন কৌশল অনুসরণ করা হয় যা সফল এবং তুলনামূলকভাবে সহজতর গর্ভপাত প্রক্রিয়া। তবে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতাই এখানে বিরাট বাধা। প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন। আর হাজার হাজার মেয়ের জন্য সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সদ্যোজাত যুদ্ধশিশুদেরকে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত; কিন্তু এখানো সমস্যা হল তাদেরকে খুঁজে বের করা।

চিকিৎসা নিরাময়ই একমাত্র চাহিদা নয়। তাদের জীবনকে আবার আগের মতো স্বাভাবিক করে তোলার জন্য হাজার হাজার বীরাঙ্গনা নারীর প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের জন্য আদর-যত্ন এবং মানসিক সহযোগিতা। ১৫ বছর বয়সী একজন তার কথা বলে এক সাংবাদিককে। "আমার ৯ বছরের বোনকে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যায়। আমার সামনেই তাকে সব সৈন্যরা মিলে তার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত ধর্ষণ করে যায়। এরপরে তারা বেয়নেট দিয়ে পেট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে ফেলে এবং কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে সারা শরীর! তারা আমার বাবা ও মাকে হত্যা করে।" এই মেয়েটিকে সৈন্যরা তাদের ব্যারাকে নিয়ে যায় এবং প্রতিরাতে ধর্ষণ করে।

আর ১১ বছরের যে মেয়েটি এখানে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে তার বিষয়ে কি বলা যায়? শরীরভরা শুধু ক্ষত। বারবার ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে তাকে। তার শরীরের নিরাময় যদিওবা হয়েও যায়, তার মানসিক চিকিৎসার কীভাবে হবে? একটা কম্বল দেয়ার পরে হাসপাতালে শুয়ে থাকা একটি মেয়ে বলে, "মাত্র কয়েকদিন আগে বাঙ্কারের ভেজা মেঝেতে উলঙ্গ শরীরে শুয়ে থাকার সময়ে আমার শীত লাগেনি একটুও।" বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আরেক জন ছাত্রী বলতেই থাকে, "কি হয়েছে আমার? কেন হয়েছে এরকম? কীভাবে হয়েছে? কোথায় ছিলাম আমি?

বাংলাদেশে বীভৎস যৌন-সন্ত্রাস

শামীমা বিনতে রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ - কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' শীর্ষক বইয়ের একটি প্রতিবেদনে [বাংলাদেশে বীভৎস যৌন-সন্ত্রাস, কিন্তু এড়িয়ে গেছেন সবাই] ফুটে ওঠে মুক্তিযুদ্ধকালে নারীর প্রতি অসম্মানের ভয়াবহ চিত্র। পরে ১৮ই মে ২০০২ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই হৃদয়বিদারক প্রতিবেদন।

একাত্তরে আমাদের নারীদের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন নির্যাতনের ধরণ কতটা ভয়াবহ, কতটা বীভৎস ছিল যুদ্ধ চলাকালে এদেশের কোনো সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়নি বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত বাংলাদেশের যুদ্ধ সংবাদেও। ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় অর্জনের পর থেকে জাতীয় দৈনিকগুলোতে পাকিস্তানিদের নারী নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলেও ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ধরন, প্রকৃতি, শারীরিক, মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে। "স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও দলিল প্রামাণ্যকরণ" প্রকল্পের তৎকালীন গবেষক, বর্তমানে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আফসান চৌধুরী এজন্য ইতিহাস রচনার সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করে বলেছেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনে বরাবরই সশস্ত্র লড়াই, ক্ষমতাসীন পুরুষদের কৃতিত্ব গ্রন্থিত করার উদ্যোগ চলছে, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে লাখ লাখ নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও যেভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছে, সনাতনী মানসিকতার কারণে কখনোই তা নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন সন্ত্রাসের ধরন সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত আমেরিকান সাংবাদিক সুসান ব্রাউনমিলার

রচিত "এগেইনস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইমেন অ্যান্ড দ্য রেপ" গ্রন্থে। দেশে এ বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয় খুব কম এবং যা হয়েছে ৮০ সালের পর থেকে। যুদ্ধের পর ৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত গ্রহণ করা এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার একমাত্র প্রকাশিত হয় প্রামাণ্যকরণ প্রকল্পের অষ্টম খণ্ডে। কিন্তু এই খণ্ড যাচাই করে দেখা গেছে, এতে গৃহীত ২৬২টি সাক্ষাৎকারের মধ্যে নির্যাতনের সাক্ষাৎকার মাত্র ২২টি।

প্রকল্পের তৎকালীন গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা গেছে, প্রামাণ্যকরণ কমিটি তাদের কার্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৩ লাখেরও বেশি পৃষ্ঠার তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরমধ্যে মাত্র ১৫ হাজার পৃষ্ঠা গ্রন্থিত আছে। বাকি লাখ লাখ পৃষ্ঠার তথ্যের মধ্যে নারী নির্যাতন বিষয়ক বেশকিছু ঘটনা আছে। প্রকল্পের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক কে এম মহসীন বলেন, 'ডকুমেন্টগুলো এখন জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পারস্পরিক টানাহেঁচড়ায় অরক্ষিত অবস্থায় আছে। যতদূর জানি, 'বেশ কিছু ডকুমেন্ট চুরিও হয়ে গেছে।'

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত লিখিত সূত্র, সমাজকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানিদের ধারাবাহিক ধর্ষণ উন্মত্ততার মধ্যে এপ্রিল থেকে যুক্ত হতে শুরু করে এদেশীয় দোসর রাজাকার, শান্তি কমিটি, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সদস্যরা। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে নারীদের ধরে আনার পাশাপাশি ধর্ষণে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেকটি ক্যান্টনমেন্ট, পুলিশ ব্যারাক, স্থায়ী সেনা বাঙ্কার ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সরকারি ভবন ধর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জানা যায়, একাত্তরে পুরো ৯ মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থলে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাঙালি নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গণধর্ষণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষ সদস্য, স্বামীদের হত্যা করার পর নারীদের ওপর ধর্ষণ নির্যাতন চালাতো পাকিস্তানি সৈন্যরা। ৯ থেকে শুরু করে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা কেউই পাকিস্তানি সৈন্য বা তাদের দোসরদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সুসান ব্রাউনমিলার তার গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো মেয়েকে পাকসেনারা এক রাতে ৮০ বারও ধর্ষণ করেছে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির 'যুদ্ধ ও নারী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এক একটি গণধর্ষণে ৮/১০ থেকে শুরু করে ১০০ জন পাকসেনা অংশ নিয়েছে। একাত্তরের ভয়াবহ ধর্ষণ সম্পর্কে একমাত্র জবানবন্দি-দানকারি সাহসিক ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী তার সাক্ষাৎকারে (একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, সম্পাদনা - শাহরিয়ার কবির) জানান, "রাতে ফিদাই-র (উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা) চিঠি

নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান, লে. কোরবান এবং বেঙ্গল ট্রেডার্সের অবাঙালি মালিক ইউসুফ আমাকে যশোরে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে গাড়ির ভেতরে তারা আমাকে ধর্ষণ করেছে। নির্মম, নৃশংস নির্যাতনের পর এক পর্যায়ে আমার বোধশক্তি লোপ পায়। ২৮ ঘণ্টা সঙ্গাহীন ছিলাম আমি।"

পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের বীভৎসতার ধরন সম্পর্কে পুনর্বাসন সংস্থায় ধর্ষিতাদের নিবন্ধীকরণ ও দেখাশোনার সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মালেকা খান জানান, সংস্থায় আসা ধর্ষিত নারীদের প্রায় সবারই ছিল ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে ফেলা রক্তাক্ত যোনিপথ, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা স্তন, বেয়নেট দিয়ে কেটে ফেলা স্তন-উরু এবং পশ্চাৎদেশে ছুরির আঘাত নিয়ে নারীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসতো।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের নারীদের একাত্তরে কতো বীভৎসভাবে ধর্ষণসহ যৌন নির্যাতন করেছে তার ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে ১৯৭৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একাত্তরে সুইপার হিসেবে কাজ করা রাবেয়া খাতুনের বর্ণনা থেকে। প্রামাণ্যকরণ প্রকল্পের অষ্টম খণ্ডে গ্রন্থিত ওই বর্ণনায় কয়েকটি অংশ: রাবেয়া খাতুন জানান, 'উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই, অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের ওপরে পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দু'পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে! পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেইসব মেয়েদের ওপরে সম্মিলিত ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ ছুরি দিয়ে স্তন কেটে, নিতম্বের মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করতো।' রাবেয়া খাতুনের আরেকটি বর্ণনায় জানা যায়, 'প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসে ওপরতলা থেকে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যেত। একইসঙ্গে রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন মেয়েদেরকে যার যার মাথার লম্বা চুল দিয়েই বেঁধে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়।'

বিচারপতি কে এম সোবহান প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, '১৮ ডিসেম্বরে মিরপুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একজনকে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটির নীচে বাঙ্কার থেকে ২৩জন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথা কামানো নারীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পুরোপুরি পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পাক আর্মিদের ধর্ষণ-উত্তর অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের ফলে বেশ

কিছু মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, কাউকে কাউকে পাকসেনারা নিজেরাই হত্যা করেছে; আবার অনেকেই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ড. রতনলাল চক্রবর্তী ১৯৭২ সালে প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, 'যুদ্ধের পরপর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে বেশ কিছু নারীকে। তাদের পোশাক এবং চলাফেরা দেখে আমরা অনেকেই নিশ্চিতভাবে ধারণা করতাম যে ওরা যুদ্ধের শিকার এবং ওদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

জাতীয় সমস্যার পরিদৃষ্টিতে যুদ্ধনারী ও যুদ্ধশিশু

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে বীণা ডি'কস্টা রচনা করেন তার ডক্টরেট অভিসন্দর্ভ 'দি জেন্ডার্ড কন্স্ট্রাকশন অব ন্যাশনালিজম: ফ্রম পার্টিশন টু ক্রিয়েশন'। একাত্তরের বাংলাদেশে বর্বর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের নির্মম ফসল হিসেবে যুদ্ধশিশু সম্পর্কে তার গবেষণালব্ধ অনেক না জানা তথ্য উল্লেখিত হয়েছে তার অভিসন্দর্ভে। বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ওই আগ্রাসনে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে যৌনসন্ত্রাসরূপে গণধর্ষণ। পাকিস্তানি সেনা-পুরুষের দল দখল করেছিল সাংস্কৃতিকভাবে আটপৌরে লাজুক-স্বভাবের বাঙালি নারীর শরীর। অপমান করেছিল সমগ্র বাঙালি জাতিকে। সাক্ষাৎকার এবং মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বীরাঙ্গনা যুদ্ধনারী এবং যুদ্ধশিশু বিষয়ক নানাকথা। তার সেই গবেষণাপত্র থেকে এখানে বিবৃত করছি সৌজন্য উদ্ধৃতি।

ঊনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক উইলহেম নাজি [১৮৪৪ - ১৯০০] মানব-ইতিহাসের গভীরে গিয়ে লিখেছেন, 'যেহেতু আমরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের ফসল, সেহেতু আমরা তাদের মানসিক দৈন্যতা, তীব্র আবেগ ও ভুলভ্রান্তি এবং অবশ্যই তাদের অপরাধেরও ফসল; এই ধারাবাহিকতার শিকল থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করা সম্ভব নয়।' তার পর্যবেক্ষণে ইতিহাসের মূল্যায়নের অর্থ হল 'সেটা ছিল' শব্দগুচ্ছের অর্থ অনুধাবন করা। যাহোক, ঐতিহাসিক সচেতনতা সততই জটিল। সাবধান করে বলেন, অনৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক দুই'ই একটি মানুষ, মানবগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতির জন্য সমানভাবে প্রয়োজনীয়। অতএব, নাজিই খুঁজে পেয়েছেন ভুলে যাওয়ার গুরুত্ব। যখনই মানুষ ভুলে যায়, তখন সে অতীতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং আবার

শুরু করতে, কল্পনা করতে এবং সৃষ্টি করতে সাহসী হয়। আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে স্মৃতি ছাড়াও বেঁচে থাকা যায়; আমাদের অনেকেই তাই করি। কিন্তু একেবারেই ভুলে না গিয়ে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব।

এই আপাত মতবিরোধীতার নিগড়েই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ। একটি জাতি-রাষ্ট্র এবং সম্প্রদায় দুইভাবেই এই দুঃসহ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে পারে। তবুও বাংলাদেশকে ভুলে যাওয়া শিখতে হবে। চূড়ান্ত সত্যটি অনুধাবন করতে হবে যে স্মৃতিচারণের প্রয়াস থেকেই সূচিত হয় ভুলে যাওয়ার স্বাধীনতা।

ভয়াবহ বিস্ময়কর সন্ত্রাস এবং পরে এর ওপরে নীরবতার পর্দার আচ্ছাদন সবসময়ে আমাদেরকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের প্রান্তে; স্বাধীনতা অর্জনের পথে একাত্তরের গাথায় রয়েছে, ব্যাপক মাত্রায় বিস্তৃত সন্ত্রাসের পটভূমিতে স্থানচ্যুতি এবং অধিকারচ্যুতির লৈঙ্গিক বর্ণনা। একাত্তরের গাথায় আরো রয়েছে, বর্তমানে উন্মোচিত আমূল পরিবর্তনের বাস্তবতাকে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতায়, পরিবার এবং জাতীয় পরিচয় পুনঃস্থাপনের কথা।

প্রশ্নটি হল, যা বাদ দেয়া হয়েছে তাকে কিভাবে ইতিহাস বা সরকারি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? আরো এক গাথা রচনায় জুড়ে দেয়ার জন্য আমরা যদি নারী ও অন্যান্যদের স্মৃতি আহরণ করি তাহলেই কি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে একাত্তরের কাহিনি? বাংলাদেশের পক্ষে কি শেষ পর্যন্ত অতীতের দুঃখ-ব্যথা ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে? একটা নতুন জাতীয় কাহিনি রচিত হলে সেটা কি শেষ পর্যন্ত সমন্বিত বিস্মরণের পথে নিয়ে যাবে?

ঐতিহাসিকভাবে, একটি সম্প্রদায়ের জাতিগত স্বকীয়তা ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে গণহত্যা পরিচালনার [সহ] কৌশল হিসেবে 'ধর্ষণ' ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ আরো আঞ্চলিক উদাহরণ রয়েছে। নারী এবং তার শরীর দখল করে নেয়ার মাধ্যমে 'একদল পুরুষ' সন্ত্রাসের পথ সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু যেহেতু ওইসব নারীরা লুট করে নেয়ার কোনো 'জিনিস' ছিলনা, ছিল জীবন্ত মানুষ; সেই ধর্ষণের স্মৃতি থেকে গেছে তাদের মনে। এই অর্থে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি উঠে আসে ওইসব জীবন্ত অস্তিত্বের সরণ এবং সন্ত্রাসের সাক্ষীরূপে। ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিচয়, ইতিহাসের বিকৃতি এবং স্মৃতির জটিল সমন্বয় ওইসব অসহায়, গুরুত্বহীন নারীদের শোষণের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমনকি জাতীয় পরিচয় গঠনের পথে নারীদের নিশ্চিত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সরকারি ইতিহাসে নারীদের বর্জনের বিষয়টি সহজেই দৃশ্যমান। জাতি-গঠনের পর্যালোচনায় লৈঙ্গিক বিশ্লেষণের মাঝে একটি নতুন জটিল উদ্যোগের গুরুত্বকেও তারা করে তোলে প্রতীকীরূপে।

এসব কিছু বিবেচনায় রেখে, আমার গবেষণা কাজের জন্য আমি শুরু করি আমার সাক্ষাৎকার, সংগ্রহ করি মুক্তিযোদ্ধা, সমাজ-কর্মী, বীরাঙ্গনা প্রমুখদের কাহিনী। এই গবেষণাপত্রে আমি দুটি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং আরো কয়েকটার প্রসঙ্গ টেনেছি। সেসব সাক্ষাৎকারে যাবার আগে বাঙালিদের সনাতনী জীবনযাত্রা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করছি।

বাঙালি নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে পর্দাপ্রথায় এবং আলাদা একটা একান্ত স্থানে অবস্থান করতে অভ্যস্ত যা তাদেরকে পুরুষ থেকে পৃথক করে রাখে। তবে, এই পর্দা-প্রথাটি পশ্চিম পাকিস্তানেরটার মতো অতটা কঠিন নয়। বাঙালি নারীরা রোমাঞ্চকর ও সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়ে ওঠে; যে জীবনটি সঙ্গীত, সাহিত্য এবং ইত্যাকার উপাদানের ভরপুর। অতএব, পাকিস্তানিদের সাথে মিলটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের মুখে এসে থেমে যায়। সাধারণভাবে, পাঞ্জাবিরা লম্বা ও ফর্সা; অন্যদিকে বাঙালিরা শ্যামবর্ণ ও খর্বকায়। এই 'জাতিগত' পার্থক্যটি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে অন্তঃসত্ত্বা বাঙালি নারীদের মনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয় অনেকাংশে; কারণ, ধর্ষণের ফসল হিসেবে জন্মানো শিশুদের শারীরিক গঠনে ছিল 'বিজাতীয়' বৈশিষ্ট্য (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫:৮১)।

আর এটা ছিল বিষম চিন্তার বিষয় কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে অযাচিত গর্ভ দেখা দেয় ভয়াবহ রকমের বেসামাল বিপদ হিসেবে। চুলচেরা সঠিক পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে যুদ্ধের পরে প্রায় ২৫,০০০ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫:৮৪)। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে পবিত্র নারীর বৈশিষ্টই 'কৌমার্য', [পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দালাল জামাত কর্তৃক] ধর্ষণের বিষয়টি সম্মান, লজ্জা এবং দূষণের বিতর্কে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার জনসভাগুলোতে বীরাঙ্গনাদেরকে আপন সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেন এবং নিজেদের ঘরে, পরিবারে ও সম্প্রদায়ে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন জাতিকে। কিন্তু, একইসঙ্গে তিনি এও বলেন যে, পাকিস্তানি রক্ত বহনকারী জারজ সন্তানদের একজনকেও বাংলাদেশে থাকার অনুমতি দেয়া হবেনা (আসক ইন্টারভিউ, ১৯৯৭, অপ্রকাশিত; ডি'কস্টা, ইন্টারভিউ, ১৯৯৯)। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় নারীদের চাহিদাটি শুধুমাত্র মাতৃত্বের মাধ্যমেই নির্দেশিত হয়েছে (জাহান, ১৯৯৫:৯৫)। রাষ্ট্র বাংলাদেশ নারীদের মাতৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক কঠিন পিতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং নারীদেরকে গর্ভপাতে উৎসাহ প্রদান করে। নারীদের শরীরের ওপর দিয়ে কিভাবে জাতীয় ঘটনা রূপ নেয় তার সচিত্র-অবশেষই ছিল ওইসব যুদ্ধশিশু। ১৯৭২ সালে নিউইয়র্ক টাইমস লেখে:

বাংলাদেশ সরকার, মার্কিন সমাজকর্মীদের প্রেরণায়, পাকিস্তানি সেনাদের ধর্ষণের ফসল হিসেবে অবাঞ্ছিত শিশু এবং দখলদারিত্ব ও যুদ্ধের শিকার শিশুদের আন্তর্জাতিক দত্তকায়নের উদ্দেশ্যে একটি আইনগত কৌশল প্রস্তুত করছে। বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে ভিনদেশী আগন্তুক কর্তৃক দত্তকায়নের মতো বিষয় একেবারেই অজ্ঞাত। ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের মার্কিন শাখার জেনারেল ডিরেক্টর ডব্লিই সি ক্লেইন বলেন যে বিদ্যমান গর্ভপাত, শিশুহত্যা, ভিক্ষুকদের কাছে [সহানুভূতি পাওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে] অবাঞ্ছিত শিশু-বিক্রীর বিকল্প হিসেবেই সার্ভিস এই দত্তকায়নের পরামর্শ দিয়েছে (দি নিউ ইয়র্ক টাইমস, মে ২৯, ১৯৭২)।

ইন্টারন্যাশনাল প্লানড প্যারেন্টহুড, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাবরশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, এবং অন্যান্য স্থানীয় ক্লিনিকগুলো রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সহায়তায় নারীদেরকে গর্ভপাত করতে সাহায্য করেছে। অযাচিত গর্ভ সামাল দেয়ার জন্য ঢাকায় এবং আরো সতেরটি স্থানে নবগঠিত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থার সাহায্যে ইন্টারন্যাশনাল প্লানড প্যারেন্টহুড স্থাপন করে ক্লিনিক। যদিও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি সংখ্যা স্মরণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন, ড. ডেভিসের বরাতে জানা যায় যে প্রায় পাঁচ হাজার নারী বিভিন্ন ধরণের বিপজ্জনক পন্থায় গর্ভপাত করিয়েছিল (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫:৮৪)।

কলকাতায় অবস্থিত মাদার তেরেসার ক্যাথলিক কনভেন্ট, যেসব মা তাদের অবাঞ্ছিত শিশুকে দিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল তাদের কাছ থেকে সেসব শিশুকে নিয়ে আশ্রয় প্রদান করে (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)। সেসব নারীদের পরিবারের পক্ষ থেকেও তাদের বাচ্চাদেরকে রেখে দিতে নিরুৎসাহ প্রদান করা হয়। কিছু কিছু সচ্ছল পরিবার তাদের কন্যাদেরকে গোপনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে গর্ভপাত করান (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯, ২০০২)।

নীলিমা ইব্রাহীম উল্লেখ করেন যে পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রাথমিক নীতি ছিল গর্ভপাত। জারজ সন্তানদের ভাগ্য নির্ধারণে সরকারের দ্বিতীয় নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন (আসক ইন্টারভিউ, অপ্রকাশিত, ১৯৯৭),

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে যদি কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে, দত্তক হিসেবে আমরা তাদেরকে দিয়ে দিব... অনেক মেয়েই কেঁদে ফেলে এবং আপন বাচ্চাকে দিয়ে দিতে চায়নি। এমনকি আমাদেরকে বেদনা-নাশক ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তারপরে শিশুদেরকে নিতে হয়েছে... একটি মেয়ে ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সী। অতএব তার মত ছিল... কিছুটা বয়সী মায়েরা অনুধাবন করেছিল যে এসব বাচ্চাদেরকে নেয়ার

কোনো স্থান নেই। কিন্তু কমবয়সীরা (টিনএজার) ছিল একেবারেই আবেগপ্রবণ... (আসক ইন্টারভিউ, অপ্রকাশিত, ১৯৯৭)।

নিলীমা ইব্রাহিম মনে করে বলেন যে আপন শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মায়েদেরকে কোনো কিছু ভাবার অবকাশ দেয়া হয়নি। নিয়োজিত সমাজকর্মীরা অবশ্যই নারীদেরকে সাহায্য করায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত নারীদের ভোগ করা গভীর মানসিক যন্ত্রণা ও দুর্দশাকে মূলত এড়িয়ে যাওয়া হয়; কারণ রাষ্ট্রের 'পবিত্রতাই' ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মালেকা খান নামের একজন, যে নারীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, নিশ্চিত করেছেন যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবস্থায় সরকার দুইভাবে সাড়া দেয়। প্রথমত, গর্ভপাত এবং দ্বিতীয়ত, দত্তকায়নের আইন প্রণয়ন। তবে তিনি কতজন মেয়ে গর্ভপাত করিয়েছিল বা কতজন তাদের বাচ্চাদেরকে দত্তক হিসেবে দিয়ে দিয়েছিল তা সঠিক করে বলতে পারেননি (আসক ইন্টারভিউ, অপ্রকাশিত, ১৯৯৭)।

নিলীমা ইব্রাহিম উল্লেখ করেন যে প্রথম পর্যায়ে মোল্লারা দত্তকায়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। কারণ শিশুদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিমের খ্রীষ্টান দেশসমূহ (আসক ইন্টারভিউ, অপ্রকাশিত, ১৯৯৭; ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)।

পরিবার কর্তৃক নির্যাতিত নারীদের বিতাড়িত করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মালেকা খান মন্তব্য করেন,

উদাহরণস্বরূপ, সেখানে এই মেয়েটি জন্ম দিয়েছিল। প্রসবে পূর্বে সে বলেছিল যে সে তার বাচ্চাকে দত্তক হিসেবে দিয়ে দিবে। কিন্তু সময় হলে সে খুবই কান্নাকাটি করতে থাকে! কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি... কেউ বলেনি, চলুন আমরা এই মেয়েটি এবং তার বাচ্চার যত্নের দায়িত্ব নেই। আমি কখনোই এ ধরনের কোনোকিছু দেখিনি! (আসক ইন্টারভিউ, অপ্রকাশিত, ১৯৯৭)।

তারার [টিভি চ্যানেল] সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে নিলীমা ইব্রাহিম একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে তার কাছে যুদ্ধশিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন,

না আপা। অনুগ্রহ করে পিতার পরিচয়হীন বাচ্চাদেরকে পাঠিয়েই দিন। তাদেরকে মানসম্মানের সঙ্গেই বড় হতে হবে। তবে, আমি ওইসব দূষিত রক্ত 'এদেশে' রাখতে চাইনা (ইব্রাহিম, ১৯৯৮:১৮)।

আগেই বলা হয়েছে, বেঁচে যাওয়া বাঙালি নারীদের সাহায্যের জন্য ড. জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশে এসেছিলেন ১৯৭২ সালে। ওই বছরে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় [১৬ই ফেব্রুয়ারি] তার কাজের ওপরে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত

হয়। প্রতিবেদনে লেখা হয় যে বেঁচে যাওয়া নারীদের একটি বিশাল অংশ কখনোই সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হবেনা। তিনি আরো বলেন যে বেঁচে যাওয়া মেয়েদের বেশিরভাগই সরকারিভাবে গর্ভপাত কার্যক্রম শুরু করার আগেই স্থানীয়/গ্রাম্য দাই বা অশিক্ষিত স্থানীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে গর্ভপাত করিয়ে ফেলেছিল। তার মতে এভাবে নিজ উদ্যোগে গর্ভপাত করানোর সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ থেকে ১,৭০,০০০। নয় মাসের সামরিক অত্যাচারে যৌন-সন্ত্রাসের শিকার হওয়া নারীদের সংখ্যা নিয়ে ভুল তথ্য দেয়ার জন্য সরকারে দোষারোপও করেন। ৪৮০টি থানা ছিল। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে ড. ডেভিস বারবার সঠিক তথ্যভুক্তির ঘাটতির উল্লেখ করেন। তবে তিনি এও বলেন যে সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজকর্মীরা অসহায় নারীদের বিষয়ে খুবই যত্নশীল ছিলেন।

উত্তরদাতা-১ খুব গভীরভাবেই বাংলাদেশ সরকারের দত্তকায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। কলকাতায় বসবাসকারী ওই ভদ্রমহিলা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মাদার তেরেসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শেষে মাদার তেরেসা বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্ষণ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। আমার উত্তরদাতা বলেন, তিনি [মাদার তেরেসা] সেখানে কোনো মেয়েদেরকে দেখতে পাননি। শুধু তাদের চুল, পেটিকোট এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখেছিলেন। তাদের চুল কাটা হয়েছিল কারণ পাকিস্তানি সেনারা ভীত ছিল যে তারা হয়তো [সেসবের সাহায্যে] আত্মহত্যা করবে... (ডি'কস্টা সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯]। এসব ছিল উত্তরদাতাদের কথা। একথা সম্পর্কে পাঠকদের জন্য কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বাঙালি মেয়েদের সাধারণত বেশ লম্বা চুল থাকে এবং আলোচিত মেয়েদের কেউ কেউ ধর্ষণ ক্যাম্পে থাকাকালে নিজের লম্বা চুলকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমার উত্তরদাতা ইঙ্গিত করেন যে ক্যাম্পে জোর করে মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়াকে নিয়ন্ত্রণও করা হতো; তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে ইচ্ছুক ছিলেননা।

মাদার তেরেসার অনুরোধে উত্তরদাতা-১ বাংলাদেশে গিয়েছিল ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারিতে। যুদ্ধ-শিশুদের দত্তকায়নের ব্যবস্থা করেন তিনি। এসব শিশুর বেশিরভাগই কানাডার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক দেয়া হয়েছিল। কিছু শিশুকে পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্স ও সুইডেনে। একটি মেয়ের কথা সে মনে করতে পারে, '...ওই মেয়েটি, যার পিতা ছিলেন একজন প্রকৌশলী, সে দেখতে ছিল খুবই সুশ্রী। তার বাচ্চাটি দত্তকায়নে চলে গেছে' (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)। সে বলে,

আমার মনে হয় যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঔরসজাত সব বাচ্চাকেই বিভিন্ন ক্লিনিকে গর্ভপাত করা হয়। না হলে সেসব মেয়েকে অভিভাবকদের পক্ষে ঘরে নেয়া সম্ভব ছিলনা। আর তারা কারো কাছে বলবেনা যে [ঘরের] কোন মেয়েটি নির্যাতিত আর কোন মেয়েটি নয়। যখনই বুঝতে পেরেছে যে [ঘরের] কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করেছে। তারমানে এটা খুব বেশি উন্মুক্ত বিষয় ছিলনা (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)।

তার জবানবন্দী থেকে প্রতিভাত হয় যে, পরিবার এবং রাষ্ট্রের সম্মানের মাত্রাটি স্বাভাবিকভাবেই একে অন্যের পরিপূরক। যাহোক, আমি যুক্তি দেই যে একটা নতুন পদ 'যুদ্ধ-শিশু' সৃষ্টি করে রাষ্ট্র নারীকে নিয়ে এসেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে এড়িয়ে কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতার অধীনে। রাষ্ট্রের সেবাধর্মী ভূমিকায় সমাজকর্মী এবং চিকিৎসা পেশাদারদের মাঝে স্থাপিত হয়েছিল এক মৈত্রী।

আগের আলোচনার সময়ে সে আমাকে কথাচ্ছলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পরিচালিত একটি ধর্ষণ ক্যাম্প সম্পর্কে বলে। পরে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের সময়ে ক্যাম্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে সে বলে যে সে নিজে ওই ক্যাম্পটি দেখেনি তবে মাদার তেরেসার বর্ণনা থেকে শুনেছে। তিনি [তেরেসা] বলেন,

দারুণ উৎসাহ নিয়ে আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত মেয়েদের নিয়ে কাজ করার জন্য গেলাম। কিন্তু পৌঁছানোর পরে আমরা একজনকেও পাইনি [স্বাভাবিক]। তবে পেয়েছি অসংখ্য শিশুকে। বহুসংখ্যক শিশুকে দত্তক দেয়া হয়েছে। ঢাকায় আমাদের নথিপত্র রয়েছে। নার্সিং হোমগুলোকে অনুরোধ জানিয়েছি যখন বাচ্চাদেরকে গর্ভপাত করানো হয়, বা জন্মানো হয়, ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিবেননা। বেঁচে থাকলে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। তারা শোনেনি। তাদের দৃষ্টি ছিল শুধু মায়েদের দিকে। বাচ্চাদেরকে ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)।

এটা ড. ডেভিসের বর্ণনার সঙ্গে মেলেনা। উত্তরদাতা-১ এর দাবি অস্বীকার করে তিনি বলেন যে কোনো অবস্থাতেই কোনো বাচ্চাকে ফেলে দেয়া হয়নি (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ২০০২)। ড. ডেভিস এবং উত্তরদাতা-১ দুজনেই অবশ্য বলেছেন যে নারীরা শুরু থেকেই তাদের যন্ত্রণা ও দুর্দশা সম্পর্কে নীরব থেকেছে। দুজনেই লাজুক ও ভীরু প্রকৃতির বাঙালি নারীদের, অপমান ও লজ্জার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এধরনের নীরব সাড়াকে স্বাভাবিক মনে করেছেন। কোনো মেয়ে ধর্ষণ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেছে কিনা, আমার প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতা-১ বলেন,

না। আর আমরা জিজ্ঞেসও করিনি। একটা ক্ষত ছিল। আমরা সেটাকে মিইয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি তাদের অবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করার। আর আমরা কখনোই নাম, ঠিকানা লিখতাম না। মানুষেরা জানলে অমর্যাদাটি রয়েই যাবে (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৯)।

ড. ডেভিসের মনে পড়ে :

না, কেউই এসব নিয়ে কথা বলতে চায়নি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তর পেতে পারেন। প্রায়শ এটা হতো যে তারা মনে করতে পারতোনা। আর পুরুষেরা এসব নিয়ে মোটেও কথা বলতে চাইতোনা! কারণ তাদের মতে মেয়েদেরকে 'অপবিত্র' করা হয়েছে। আর বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থান অনেক নীচে। অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর কোনো অবস্থানই থাকেনা। প্রায় মৃতবৎ হয়ে পড়ে এমন নারী। আর পুরুষেরা হত্যা করেছে তাদেরকে। আমার বিশ্বাস হয়না এটা। পশ্চিমা সমাজে এরকমটা একেবারেই প্রথাবিরোধী। একেবারেই অপরিচিত! (ডি'কস্টা, সাক্ষাৎকার, ২০০২)।

এখানে আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি রাষ্ট্র এবং সমাজকর্মীদের মৈত্রীবন্ধন। যত্ন প্রকাশের জন্য একটা হালকা আচ্ছাদন হিসেবে বেঁচে থাকা নারীদেরকে দিয়েছিল নীরবতা; কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল জাতি-রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করা। সাক্ষাৎকারগুলোতে আমি দেখতে পাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রচলিত বাধ্যবাধকতার প্রভাব যা যুদ্ধ শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে পরিবারে তারা ছিল অবাঞ্ছিত। রাষ্ট্র শিশুদেরকে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেনি যদিও তাদের সেই [নাগরিক] অধিকার ছিল; বরং রাষ্ট্র চেয়েছে যেন পরিবারেও তারা গৃহীত না হয়। এই প্রেক্ষিতে, না নারী না শিশু কেউই রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়নি।

নারীদের ধর্ষণ এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণের জাতীয়তার ব্যাখ্যা ওইসব দুঃসহ অভিজ্ঞতাসমূহকে, নারীদের সম্পর্কে কম, বরং বাঙালি জাতীয়তা এবং পুরুষ পরিচয়ের চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করে। আবার অন্যদিকে, পাকিস্তানি দৃষ্টিকোণে পবিত্রতার অর্থ হল একটা সঠিক মুসলিম পরিচয় যা মুসলিম পাকিস্তানি ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; পক্ষান্তরে, [ওই সময়ে] বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণে, পবিত্রতার অর্থ হল রাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানি রক্ত বিদায় করা। ওই শিশুরা ছিল বাঙালি সত্তার ওপরে আক্রমণের জ্বলজ্বলে স্মৃতি। অতএব, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যুদ্ধকালীন গর্ভের বিষয়ে, বৈধ পিতৃত্ব-মাতৃত্বের প্রেক্ষিতে, যা আইনগতভাবে সঠিক তাই করেছিল। গর্ভপাত এবং দত্তকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর শরীর এবং মাতৃত্বের ওপরে প্রয়োগ করেছিল রাষ্ট্রীয় আধিপত্য। জাতীয় পরিচয় গঠনে নারীর চাহিদাটি সেখানে ছিল গুরুত্বহীন। ক্লিনিক, আন্তর্জাতিক দত্তকায়ন সংস্থা

এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের বাইরের স্তরে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাও মাঝেমধ্যে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ফলে নারীরা দ্বিতীয়বারের মতো শিকারে পরিণত হয়েছে [মালেকা খান এবং নীলিমা ইব্রাহিমের সাক্ষাৎকার থেকে এটা সুস্পষ্ট]। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতের ব্যাপ্তিতে, নতুন জাতির সম্মানের স্বার্থেই, পাকিস্তানি অপবিত্র রক্ত ধুয়ে মুছে ফেলাটা ছিল জরুরি।

যুদ্ধশিশুদের দত্তকায়ন

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রথম উত্তরদাতার সঙ্গে, বীনা ডি'কস্টা কর্তৃক গৃহীত, সাক্ষাৎকারের ওপরে নির্ভর করে রচিত হয়েছে এই অনুচ্ছেদ। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ে এবং পরে প্রদত্ত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্তব্য প্রদান করার জন্য বাংলাদেশের শাহীন আখতারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বীণা ডি'কস্টা। উল্লেখ্য যে, এই সাক্ষাৎকারটি ভারতে ধারণকৃত এবং উত্তরদাতা তার নাম-পরিচয় প্রকাশে ছিল অনিচ্ছুক। কলকাতার মাদার তেরেসা কেন্দ্রের শিশু ভবনের তত্ত্বাবধায়ক 'উত্তরদাতা' ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারিতে বাংলাদেশে আসেন এবং একটি বাড়িতে অস্থায়ীভাবে চালু করেন যুদ্ধশিশুদের জন্য প্রথম আশ্রয়কেন্দ্র। বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করেন যুদ্ধশিশু। দুই বছর আট মাস ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করে বীরাঙ্গনাদেরকে প্রদান করেন প্রয়োজনীয় সকল সেবা। পাসপোর্ট, ফ্লাইট, টিকিট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বিদেশে যুদ্ধশিশুদের কানাডা, ফ্রান্স ও সুইডেনে দত্তকায়নে প্রেরণের কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বীণা ডি'কস্টা তার গবেষণা কাজে নৈতিকতার স্বার্থে তার গৃহীত সাক্ষাৎকারটি কোনোরকম সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশ করেছেন। সৌজন্য উদ্ধৃতিতে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে উত্তরদাতার লোমহর্ষক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বর্ণনা।

উত্তরদাতা-১: সেটা ছিল এক বিশাল নাটক। দুইশ জন নারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ডিসেম্বরের শেষ দিকে বা জানুয়ারিতে সেখানে গিয়েছিলেন মাদার তেরেসা। নতুন বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে সেখানে আমন্ত্রণ করেছিল। তিনি [তেরেসা] সেখানে কোনো মেয়েকে দেখতে পাননি। তিনি সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন শুধু সেসব মেয়েদের চুল, পেটিকোট, এবং অন্যান্য কিছু সামগ্রী। তাদের [বন্দী নারীদের] চুল কাটা হয়েছিল কারণ তারা [সেনারা] ভীত ছিল এই ভেবে যে হয়তো [চুলের সাহায্যে] আত্মহত্যা করতে পারে। তারা [সেনারা] ভীষণ নিষ্ঠুর আচার-আচরণ করতো। মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে রাখতো।

অনেককেই রাখতো অর্ধ-উলঙ্গ করে। আমরা তাদেরকে সেরকম অবস্থায় দেখিনি। সেজন্য আমরা কোনো মন্তব্য করতে পারি না। আমি যখন ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারিতে সেখানে যাই, আমি এই অস্থায়ী বাড়িটি [যুদ্ধশিশুদের জন্য প্রথম আশ্রয়কেন্দ্র] চালু করি।

বীণা: আপনাদেরকে কেন বেছে নেয়া হয়েছিল? আপনাদের বাঙালি জাতিগত সংশ্লিষ্টতার কারণেই কি?

উত্তরদাতা-১: আসলে আমাদেরকে ঠিক 'বাছাই' করে নেয়া হয়নি। আমাদের অভিজ্ঞতার কারণেই আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। কলকাতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত [জনাব] হোসেন আলী, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ হওয়ার মূহূর্তে তিনিই ঘোষণা করেন যে তিনি বাংলাদেশকে গ্রহণ করেছেন। এরপরে হোসেন আলী এসে সাক্ষাৎ করেন মাদার তেরেসার সঙ্গে। তারপরে যান শিশু ভবনে। আর তারপরেই আমি শিশু ভবনের তত্ত্বাবধায়ক হই। তিনি মাদারকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি আমার সঙ্গে এই সিস্টারকে সঙ্গে নিতে পারি?"... সত্যি বলতে কি, ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে আমি কখনোই বাংলাদেশে যাইনি। তারমানে প্রায় ২২ বছর! আর আমি তখন থেকে বাংলাও বলিনি। আমি আমার পড়াশোনাও বাংলাতে করিনি। বাংলার সঙ্গে যোগাযোগটা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বীণা: বাংলায় যোগাযোগ করাটা কি আপনার জন্য কঠিন ছিল?

উত্তরদাতা-১: শুরুতে, হ্যাঁ, সেরকমই ছিল। চট করে আমি ইংরেজিতে চলে যেতাম। তারপরে আমি মুজিবকে [বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা] দেখতে যাই। মুজিব ছিলেন আমার একজন পরম বন্ধু। তিনি বলেছিলেন, তোমার যা সাহায্যের প্রয়োজন, মন্ত্রীদেরকে বলবেন, তারা দিবে। কুমিল্লা এবং অন্যান্য স্থানে যাওয়ার জন্য আমি হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছি।

বীণা: শুধুমাত্র যুদ্ধশিশুদের সংগ্রহ করার জন্য?

উত্তরদাতা-১: সাহায্য কার্যক্রম চালানোর জন্যও। আর তিনিই আমাকে মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার বাংলা এতটাই খারাপ ছিল যে আমি আধো বাংলা এবং আধো ইংরেজিতে কথা বলেছি। মুজিব বলতেন, "বাংলাদেশের মেয়ে, বাংলা কথা বল।"... মুজিব কিন্তু অনেক বড় বন্ধু ছিলেন। কোনোরকম পাস ছাড়াই আমি যে কোনো মন্ত্রণালয়ে যেতে পারতাম এবং যা প্রয়োজন, সাহায্য চাইতাম। সেখান থেকেই বেশিরভাগ জিনিসপত্র দেয়া হতো। একটি জিনিস আমার প্রয়োজন ছিল, সিস্টারদের নিরাপত্তা। আমরা বিদেশী হলেও সেখানে আমাদেরকে বিদেশি দেখাতো না। [যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ ছিল]।

বীণা : তাহলে কি সিস্টারদের জন্য পরিবেশটা বিপজ্জনক ছিল?

উত্তরদাতা-১ : হ্যাঁ। এছাড়া আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, অন্য কোনো নানই, বস্তি ও গ্রামে, বাইরে কাজ করতো না। তারা তাদের নিজস্ব কনভেন্টে কাজ করতো। আমি সেখানে যাওয়ার পরে, সিস্টারদের নিয়ে আমি সবখানে কাজ করা শুরু করি। তিনজনের কম সংখ্যায় আমরা কখনোই রিলিফ কাজে যেতাম না। মিজানুর রহমান [ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী] বলতেন, "তোমরা তরুণীরা বাইরের দুনিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছ। তোমাদের কিছু হয়ে গেলে কে দায়িত্ব নিবে?" আমি তাকে বলতাম, "সেটাই একমাত্র বিষয় আমি আপনাকে বলি। আমাদের নিরাপত্তা দিন।" বিদেশী এবং পর্যটক হিসেবে গুণ্ডা পাণ্ডা এবং ঝামেলা পাকানো মানুষদের থেকে সুরক্ষা প্রয়োজন। সেটা ছিল আমাদের কাজ এবং আমার কোনো ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল বেশ কমবয়সী সিস্টাররা। একজন বাঙালি এবং অন্যান্যরা কেরালার। অতএব তাদেরকে বাংলা শিখতে হয়েছে এবং কাজ করতে হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি সাহায্য পেয়েছি! সেজন্য কোনো আপত্তিও ছিলনা। সেজন্যই, আমরা যখন বাচ্চার দলকে বিদেশে পাঠানো শুরু করেছি, তারা [সরকার] তাদেরকে পাসপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তারা জানতোই না যে কিভাবে ওই দত্তকায়ন প্রক্রিয়া চলছিল। ভারতে আমি সবসময়েই দত্তকায়ন করছিলাম। সেজন্য দত্তকায়নের কাজ কিভাবে করতে হয় আমার ভালমতই জানা ছিল। যখন আমি সেখানকার [বাংলাদেশে] অফিসে গিয়ে বাচ্চাদের কাজ করতাম; আমি তাদেরকে [কর্মীদেরকে] বাচ্চাদের সনদ তৈরিতে সাহায্য করতাম যেন বাচ্চারা দেশত্যাগ করতে পারে। বাচ্চাদের যাওয়ার জন্য অবশ্য পাসপোর্ট ছিল যা দত্তকায়নের জন্য প্রযোজ্য বা প্রয়োজনীয় ছিল না। মুসলিম এবং খ্রিষ্টানরা দত্তকায়ন নয় বরং লালন-পালনের ব্যবস্থা করে। ভারতে অবশ্য হিন্দুরা হিন্দু বাচ্চা দত্তক নিতে পারে। সেসময়ে বাংলাদেশে মুসলিমদের দত্তকায়নের জন্য কোনো আইন ছিলনা। অন্তত আমি তাই মনে করি... দত্তকায়নের ক্ষেত্রে আমরাই ছিলাম প্রথম। বলাই বাহুল্য যে ওইসব শিশুদের কোনো ধর্ম ছিল না। আর বাংলাদেশে কেউই তাদেরকে দত্তক নিতে এগিয়ে আসেনি। অতএব, সরকার আমাদেরকে অনুমতি দেয় এবং পাসপোর্টও দেয়। এমনকি দশ দিনের বাচ্চাও গিয়েছিল কানাডায়। আমাকে তাদের ছবি, পাসপোর্ট যোগাড় করতে হয়েছে এবং ফ্লাইট বুক করতে হয়েছে। বাচ্চাদের প্রয়োজন ছিল তাদের গন্তব্য দেশটিতে পৌঁছানো এবং তারপরে সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে যাওয়া। অনেককেই ঢোকানো হয়েছিল ইনকিউবেটরে। আমি বাংলাদেশে ছিলাম দুই বছর আট মাস এবং কাজ করেছি দত্তকায়ন প্রকল্পে...

বীণা : যেসব মেয়েরা তাদের গর্ভজাত বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিয়েছিল তাদের কি হল? আপনি কি তাদের মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা-১: বেশিরভাগ শিশুই এসেছিল নার্সিং হোমগুলো থেকে। দাই, আয়ারা নিয়ে এসেছিল সেসব বাচ্চাকে।

বীণা : আপনি কি কোনো নার্সিং হোমের কথা মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা-১: না, না! [আমার কাছে স্পষ্টত মনে হয়েছে যে তিনি কোনো নাম প্রকাশ করতে চান না] তারা আমাদেরকে সেসব জানতে দিতে চাইতো না। কোন মেয়েরা গর্ভপাত বা অন্যকিছু করিয়েছে সেসব বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করিনি। অর্থাৎ, আমরা শুধু বাচ্চাদেরকে গ্রহণ করেছি এবং সম্মত হয়েছি। তবে পরবর্তী সময়ে, আমরা যখন মেয়েদের সংস্পর্শে গিয়েছিলাম [তাদেরকে দেখে] আমি ভাবতেও পারিনি যে তারা পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল... একটা ঘটনা আমি জেনেছি, তার পিতা ছিল একজন প্রকৌশলী। পুরো পরিবারকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাদেরকে অর্ধেক বালিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনারা চলে গেলে, সে চেতনা ফিরে পায়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে তার কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল; তবে ভিন্ন নামে। সে কোনো গর্ভপাত করতে চায়নি। তবে পরে তার বাচ্চাকে দিয়ে দিতে হয়েছে। এছাড়া, আমার মনে হয় সবাইকেই গর্ভপাত করতে হয়েছে। কেউই পাকিস্তানি বাচ্চা চায়নি। কেউনা! না বাবা-মা, না সরকার, না আক্রান্ত মেয়েরা... সময় পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে, আমরা গর্ভবতী মেয়েদেরকে পেয়েছি। কিন্তু আমরা জানতাম না যে তারা কাদের মাধ্যমে ধর্ষিত হয়েছিল; পাকিস্তানি সেনা নাকি অন্য কেউ। আমরা সবসময়েই শুধু গর্ভবর্তী মেয়েদেরকে পেতাম।

পাকিস্তানি সেনাদের ঔরসে জন্মানো বাচ্চাদের সকলকেই বিভিন্ন ক্লিনিকে অপসারণ করা হয়েছিল। না হলে বাবা-মায়েরা তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারতেন না। আর তারা তো তাদের কন্যার ধর্ষণের বিষয়টা কাউকে বলতেও পারতেন না। যখনই তারা বুঝতে পারতেন যে তাদের মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, ক্লিনিকে নিয়ে এসে গর্ভপাত করাতো। সবই হতো গোপনে।

বীণা : আপনি বলেছেন যে বাচ্চাদের অনেককেই কানাডায় পাঠানো হয়েছে...

উত্তরদাতা-১ : বেশিরভাগকেই পাঠানো হয়েছে কানাডায়। কিছু বাচ্চাকে পাঠানো হয়েছে ফ্রান্সে এবং সুইডেনেও।

বীণা : আপনার সঙ্গে কি কোনো কানাডীয় সিস্টারের দেখা হয়েছিল, যারা এখানে কাজ করছিল?

উত্তরদাতা-১ : না। বাংলাদেশে অনেকেই কাজ শুরু করেছিল। তবে আমরা ছিলাম সেখানে কাজ শুরু করা প্রথম দল।

বীণা : আমাদের আলাপকালে আপনি গতকাল অস্পষ্টভাবে একটা বন্দীশালার উল্লেখ করেছিলেন। সেটা সম্পর্কে আরো কিছু কি বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা-১ : না, না!

বীণা: সেটা কি ঢাকায় ছিল?

উত্তরদাতা-১ : হ্যাঁ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে বেঁধে রাখা হয়েছিল। মাদার তেরেসা সে স্থানটি দেখতে গিয়েছিল। তারাই [সরকার] তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তবে সেসময়ে একটি মেয়েও সেখানে ছিল না। আমরা একটা বিরাট প্রচারের মাধ্যমে, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নির্যাতিত মেয়েদের নিয়ে কাজ করার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমরা কাউকেই খুঁজে পাইনি। সেখানকার সবাই চলে গিয়েছিল। তবে আমরা অনেক বাচ্চাকে পেয়েছি। অনেক বাচ্চাকেই দত্তকায়নের জন্য দেয়া হয়েছিল। আমরা অনেক রিলিফ কাজও করেছি।

বীণা: সেসব কাজ কি মেয়েদের সম্পর্কিত ছিল?

উত্তরদাতা-১: না, সাধারণভাবে সবার জন্য। বুড়িগঙ্গার [ঢাকার পাশে বড় নদী] ওপাড়ে আমরা মেয়েদের জন্য কিছু পুনর্বাসন কাজও করেছিলাম। তারা সবাই ছিল হিন্দু মেয়ে। কোনো পুরুষ বা বড় হওয়া ছেলে নয়। [কারণ] সেনাবাহিনীরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছিল। তারা একটা বড় গর্ত খুঁড়েছিল যেখানে সব পুরুষদেরকে চাপা দেয়। বড় হওয়া ছেলেদেরকেও। শুধু মেয়েদেরকে রেখে দেয়া হয়েছিল। সেসব মেয়েদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা একটা কার্যক্রম হাতে নিই। প্রত্যেক মেয়েকে ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য পাঁচ টাকা [ভারতীয় রুপি] করে দিই। তারাও সামান্য কিছু যোগাড় করে। পরে তারা ওই ছোট্ট সঞ্চয় থেকে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তারপরে আমরা তাদেরকে রাজহাঁস, হাঁস, মুরগী এবং ছাগল দিই। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য পরের তিন বছর ধরে আমার তাদেরকে সাহায্য করে যাই। এভাবেই জাগরণী [মিশনারি চ্যারিটির সিস্টারদের পরিচালিত হস্তশিল্প ও সমবায়ী দোকান] প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা ছিল বিধবাদের কার্যক্রম।

মুসলিমদের জন্য আমাদেরকে বোঝা কঠিন ছিল। তারা জিজ্ঞেস করতো, "কেন তোমরা বিয়ে করতে পার না? তোমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করছো।" আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা আমাদেরকে বুঝতে পারে। প্রথমটায় তারা কিছুটা ভীত ছিল। কর [বর্তমানে কারিতাস], ফাদার টিম [বাংলাদেশে বিতর্কিত মানবাধিকার কর্মী ও ধর্মযাজক] এবং ফাদার লাবে

[ইতালীয় ধর্মযাজক] আমাদেরকে সাহার্য্য করে।

বীণা : আপনি কি অন্য কোনো যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে কাজ করেছেন?

উত্তরদাতা-১ : আমি নিজে করিনি। তবে [আমার দলের] অন্যরা করেছিল।

বীণা : সেই অভিজ্ঞতা কি বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্নতর ছিল?

উত্তরদাতা-১ : না। আমাদের জন্য সেটা নতুন কিছু ছিল না।

বীণা: বাংলাদেশে আপনারা কতজন ছিলেন?

উত্তরদাতা-১ : বাংলাদেশে আমরা ছয়জন কাজ করেছিলাম। পুনর্বাসন কাজের সমন্বয়ক রব চৌধুরী আমাদেরকে সহায়তা করেন।

বীণা : যুদ্ধশিশুদের সংখ্যা কি ঢাকায় বেশি ছিল? আর গর্ভপাতের সংখ্যাও?

উত্তরদাতা-১ : হ্যাঁ। সেটা এখনো আমার হৃদয়ে দাগ কেটে আছে। সরকার গণহারে গর্ভপাতের অনুমতি দিয়েছিল। তারা কোনো পাকি শিশু চায়নি। যত দ্রুত সম্ভব, হয় সেসব বাচ্চাকে গর্ভপাত করতে হয়েছে অথবা দেশের বাইরে পাঠাতে হয়েছে। আমাদের কাছে ইনকিউবেটর ছিল এবং অপক্ক বাচ্চাকেও নেয়ার প্রস্তুতি ছিল।

বীণা : আপনারা কি মেয়েদেরকে গর্ভপাত না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

উত্তরদাতা-১ : হ্যাঁ। আমরা নার্সিং হোমগুলোকেও অনুরোধ করেছিলাম, 'বাচ্চা জন্মানোর পরে, অনুগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে দিবেন না। বেঁচে থাকলে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন।' কিন্তু তারা শোনেনি। তারা শুধু মায়েদের দিকেই আগ্রহী ছিল। বাচ্চাগুলোকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে ডাস্টবিনে... দেখুন, কোনো যুদ্ধে দেশ/মাটি হারানো পরাজিত বাহিনীরা সবসময়েই কোনো না কোনো চিহ্ন রেখে যেতে চায়। এজন্যই বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঔরসজাত বাচ্চাদের থেকেও মুক্তি চেয়েছিল।

বীণা: মেয়েরা কি প্রত্যক্ষ ধর্ষণের কথা বর্ণনা করেছিল?

উত্তরদাতা-১: না। আর আমরাও তাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি। একটা ক্ষত ছিল। চেষ্টা করেছি সেটার উপশম করতে। চেষ্টা করেছি তাদের অবস্থাকে মানিয়ে নিতে। আর আমরা তাদেরকে নাম বা ঠিকানাও লিখতে বলতাম না। মানুষেরা জানলে কলঙ্কটি থেকেই যাবে।

ঠিক আছে। আমি ক্লান্ত। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বীণা: আপনার সময় দেয়ার জন্য আপনাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

বীরাঙ্গনাদের জন্য সেবা-কার্যক্রম

অস্ট্রেলিয়ার নর্থ সাউথ ওয়েলসের সিডনি নিবাসী একজন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ড. জিওফ্রে ডেভিস ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এসে প্রায় ছয় মাস ধরে বীরাঙ্গনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এসেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড, ইউনাইটেড ন্যাশনস ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাকটিভিটিজ (ইউএনএফপিএ - বর্তমানে ইউএনপিএফ বা ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড) এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সম্মিলিত কার্যক্রমের অধীনে। ২০০২ সালের ১লা জুনে ড. জিওফ্রে ডেভিসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বীণা ডি'কস্টা। বীণা ডি'কস্টা তার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের মুখবন্ধে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন মি. রজার কিলহ্যামকে যিনি মুক্তিযুদ্ধের বহুবছর পরে ড. ডেভিসকে খুঁজে বের করেছেন। এছাড়াও সাক্ষাৎকার-বর্ণনার খসড়ার ওপরে মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ড. হামিদা হোসেনকে। প্রিয়পাঠক, এবারে বীণা ডি'কস্টা বিবৃত সেই সাক্ষাৎকারের সৌজন্য উদ্ধৃতিতে দৃষ্টি দিই।

এই ডকুমেন্ট একজন চিকিৎসক ড. জিওফ্রে ডেভিস, যিনি ১৯৭২ সালে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে কাজ করেছেন, তাকে উদ্দেশ্য করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা সিডনিতে আমি তার বাসায় এবং পরে কাছাকাছি একটি পর্তুগিজ রেস্তোরাঁয় ধারণ করা তার সঙ্গে আমার পরিচালিত সাক্ষাৎকার। ছোট ছোট বর্ণনা, জাতি গঠনে নিয়োজিত নারী-পুরুষের গল্পগাথা ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। যখন আমাদের অনেকেই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছি, তখন আমাদের জাতীয় গাথা ঐতিহাসিক স্মৃতিভ্রংশে প্রভাবিত হয়ে চলেছে।

পাঠকদের মনে রাখা দরকার যে ড. ডেভিস আমার অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের বিপরীতে ৩১ বছর পূর্বে [২০০২ সালের] ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করেছেন। অতএব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার উত্তরকে ঝাপসা মনে হতে পারে। তিনি তার স্মৃতিচারণের শুরুতে বলেন যে, কোনো নির্দিষ্ট সংস্থাই তাকে, তার অতি-সংবেদনশীল কাজের ধারার কারণে তাদের নিজস্ব একজন করে নিতে চায়নি।

ড. ডেভিড স্মরণ করেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের বন্দীদশায় থেকে অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়া মেয়েদের গর্ভজাত শিশুদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। তখনো পর্যন্ত যাদের গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি তাদের সকলের জন্য আমার পরামর্শ ছিল ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা; যেন তাদেরকে আর ওই অপমানকর গর্ভ ধারণ করতে

না হয়। বিষয়টা এরকম ভয়াবহই ছিল। আর আমরা আমাদের কাজে সফল হয়েছিলাম। অবশ্যই বাংলাদেশের সবকিছুই খুব বেশিমাত্রায় ছিল তবে সেখানে যখন আমরা পৌঁছাই, তাদের অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছিল অথবা নিজ নিজ পরিবারে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। এসব ঘটনায় সবাই খুব ভীত হয়েছিল। আমাদের কিছু করার ছিল। এবং সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে সেখানে আরো একজন ছিল। আমরা তার ঠিকানা/উদ্দেশ হারিয়ে ফেলেছি। সে ছিল অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তি।'

বীণা: আপনি কি স্বেচ্ছাপ্রদ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে?

জিওফ্রে: হ্যাঁ, আমি তাই করেছিলাম।

বীণা: এই সেবায় নিয়োজিত হতে কি আপনাকে আগ্রহী করেছিল?

জিওফ্রে: পরিণত গর্ভের অপসারণের জন্য আমার একটি কৌশল জানা ছিল। প্রধানত যুক্তরাজ্যে আমি ওই প্রশিক্ষণ পাই। তবে, আমি সাধারণত ৩০ সপ্তাহের গর্ভ অপসারণ করে থাকি।

বীণা: ঢাকার কোথায় আপনি কাজ করেছিলেন।

জিওফ্রে: ধানমণ্ডির ক্লিনিকে আমি কাজ করেছি। অন্যান্য শহরের বেশিরভাগেই যেখানে হাসপাতালের মতো কিছু ছিল সেখানে কাজ করেছি। আমি মূলত যা করেছি... সংখ্যা এতই বিশাল ছিল... সেসব শহরে আমি যা করছিলাম তাই অনেককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আর তারা যখনই বিষয়টা রপ্ত করে নিয়েছে, আমি চলে গেছি অন্য শহরে।

বীণা: দলিলভুক্ত করার স্বার্থে আপনি কি দয়া করে বলবেন যে সেখানে আপনি ঠিক কি করছিলেন?

জিওফ্রে : আমি সেখানে যাওয়ার কিছু আগে নারীদের পুনর্বাসন সংস্থাগুলো গঠিত হয়েছিল। বিচারপতি সোবহান সেসবের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা সব অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদেরকে একখানে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করছিলেন। যাদেরকে সম্ভব, তাদের গর্ভ আমার অপসারণের কাজ করতে হয়েছে এবং যাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাদের বাচ্চাকে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসেসে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে...

বীণা : সেসময়ে আপনার সঙ্গে কাজ করা অন্যান্যদেরকে আপনি কি মনে করতে পারেন?

জিওফ্রে : যুদ্ধ পুনর্বাসন সংস্থার প্রধান ছিলেন বিচারপতি সোবহান এবং মূল সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন ভোন শাক... আমি তার প্রথম নামটি মনে করতে পারছি না। আমার মনে হয় তার স্ত্রীর নাম ছিল মেরি। তারা অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছে।

বাঙালি ব্যক্তিবর্গের নাম আমি মনে করতে পারি না... এছাড়া, কেউই এসব ইতিহাসের কথা জানতে চায়নি।

বীণা : কি আপনাতে এরকম বলতে বাধ্য করছে?

জিওফ্রে : ওহো, কারণ এ কাজে গর্ভপাত এবং দত্তকায়নের বিষয় জড়িয়ে ছিল। আরো একটা দিক হল যে, পশ্চিম পাকিস্তান ছিল একটা কমনওয়েলথ দেশ এবং এর সকল সেনা কর্মকর্তাই ছিল ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষিত। বৃটিশ সরকারের জন্য সেটা ছিল একটা বিব্রতকর বিষয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা বুঝতেই চাইতো না যে ওই বিষয় নিয়ে কেন এত মাতামাতি হয়েছে। তাদের অনেককেই আমি প্রশ্ন করেছি। কুমিল্লার একটি বন্দীশালায় তারা ছিল এবং খুবই শোচনীয় অবস্থায় দিন পার করছিল (হাসি...)। সেটাই তাদের জন্য সঠিক ছিল। তারা বলতো, 'এসব নিয়ে কি হচ্ছে? আমাদের কি করা উচিত ছিল? এটা ছিল একটা যুদ্ধ!'

বীণা : নারীদের ধর্ষণের বিষয়টাকে তারা কীভাবে যুক্তিযুক্ত করেছে?

জিওফ্রে : আহ! তাদের কাছে কোনো আদেশ বা টিক্কা খানের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল যে একজন ভাল মুসলিম পিতা ছাড়া যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। অতএব [হত্যাসহ অন্যান্য অত্যাচারের পাশাপাশি] যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব তত বেশি বাঙালি মেয়েদেরকে তারা জোর করে অন্তঃসত্ত্বা করেছে। সেটাই ছিল এরকম করার পেছনের তত্ত্ব।

বীণা : তাদেরকে জোর করে অন্তঃসত্ত্বা করতে হয়েছে কেন? তারা কি আপনাকে বলেছে?

জিওফ্রে : হ্যাঁ, এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি হতো এক বিরাট ও বিশেষ প্রজন্ম যা জন্ম নিতো পশ্চিম পাকিস্তানি রক্ত নিয়ে। এটাই তারা বলেছে।

বীণা : পাকিস্তানের অসংখ্য ডকুমেন্ট এখনো বলে যে ধর্ষণের সংখ্যা অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে এটা ঠিক ?

জিওফ্রে : না, না... তারা করেছিল। সম্ভবত তারা যা করেছিল সংখ্যাগুলো সে তুলনায় খুবই সীমিত। শহরগুলো দখল করে নেয়ার কাহিনীগুলো বেশ মজার। ইনফ্যান্ট্রিকে পেছনে রেখে তারা আর্টিলারিকে রাখতো সামনে। এরপরে বোমা নিক্ষেপ করতো হাসপাতাল ও স্কুলে। আর এতে শহরে সৃষ্টি হতো ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। আর এরপরে ইনফ্যান্ট্রি প্রবেশ করে নারীদেরকে আলাদা করতে শুরু করতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাদে, যৌনতার অর্থে পরিপক্ব হওয়া সকল নারীকে আলাদা করা হতো এবং অন্যদিকে ইনফ্যান্ট্রির বাকি সদস্যরা শহরকে ঘিরে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানের [নতুন] সরকার বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

সবাইকে মেরে ফেলা হতো। আর এরপরে ওইসব মেয়েদেরকে প্রহরী রক্ষিত স্থানে জড়ো করে নিয়ে সেনাসদস্যদের কাছে দিয়ে দেয়া হতো। এটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয়। বিশ্বের আর কোথাও এমনটা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এভাবেই ঘটেছে এসব।

বীণা : ক্লিনিকে কর্মরত সমাজকর্মী বা নারী-পুরুষদের সঙ্গে কি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনার কথাবার্তা হয়েছে?

জিওফ্রে: হ্যাঁ, সবসময়েই আমরা এসব সম্পর্কে শুনতাম। তাদের বলা কিছু কিছু কাহিনি ছিল ভয়ঙ্কর। বারবার বারবার বারবার তারা ধর্ষিত হয়েছে। অতিকায় পাঠান সৈন্যদের দ্বারা। আপনি এটা বিশ্বাসও করবেন না যে কেউ এরকমটা করতে পারে।

ধনী এবং আকর্ষণীয় চেহারার মেয়েদেরকে সেনা অফিসারদের জন্য রেখে দেয়া হতো এবং অন্য সকলকে বিতরণ করা হতো অধস্তনদের মধ্যে। আর নারীদের জন্য সেটা ছিল চরম কঠিন সময়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার জুটতোনা। অসুস্থ হয়ে পড়লেও মিলতো না কোনো চিকিৎসা। সেসব ক্যাম্পে অনেকেই মারা গেছে। পুরো বিষয়টা নিয়ে এক ধরনের ফাঁপা অবিশ্বাসের বিষয়ও বিদ্যমান ছিল। সত্যিই যে ওই বীভৎস বিষয়টা ঘটেছে অনেকেই তা স্বীকৃতি দিতো না। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণাদি স্পষ্ট করে বলে যে এরকমটাই ঘটেছে।

বীণা : হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বোঝাতে চাইছেন। কারণ আপনি জানেন যে আমি নিজেও বিগত চার বছর ধরে নারীদেরকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারা ছিল সংখ্যায় ব্যাপক এবং তাদের অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাবে এরকমটাই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আমি খুব কম সংখ্যক মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি।

জিওফ্রে : হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করার বিষয় ঘটেছে। এবং তারা [নির্যাতিতরা] এসবকে গোপন করেছে। এটা স্বাভাবিক।

বীণা : যুদ্ধের ঠিক পরপরই সেটা কি ভিন্ন ছিল? কেউ কি তাদের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছে?

জিওফ্রে : না, কেউই এসব নিয়ে কথা বলতে চায়নি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তর পেতে পারেন। প্রায়শ এটা হতো যে তারা মনে করতে পারতো না। আর পুরুষেরা এসব নিয়ে মোটেও কথা বলতে চাইতোনা! কারণ তাদের মতে মেয়েদেরকে 'অপবিত্র' করা হয়েছে। আর বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থান অনেক নীচে। অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর কোনো অবস্থানই থাকে না। প্রায় মৃতবৎ হয়ে পড়ে এমন নারী। আর পুরুষেরা হত্যা

করেছে তাদেরকে। আমার বিশ্বাস হয়না এটা। পশ্চিমা সমাজে এরকমটা একেবারেই প্রথাবিরোধী। একেবারেই অপরিচিত!

বীণা : আপনি নিশ্চয়ই বাংলা বলতে পারেন না। যোগাযোগ করাটা কঠিন ছিল কি?

জিওফ্রে : না, আমার একজন দোভাষী ছিল। একজন পুরুষ। বেশ অল্পসময়ের মধ্যেই তারা যথেষ্ট মাত্রায় সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। তারা আমাকে একটা ল্যান্ডরোভার জিপ, একজন ড্রাইভার এবং একজন মাঠ-কর্মকর্তাকে দিয়েছিল যে আবার আমার দোভাষী ছিল। ড্রাইভারের নাম ছিল মোমতাজ। কিন্তু আমি ওই সরকারী মাঠ-কর্মকর্তার নামটা মনে করতে পারছি না। বিস্ময়করভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইংরেজি বলতো। তিউনিশিয়ায় আমি যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেরকমটা হইনি বাংলাদেশে [তিউনিশিয়ান পপুলেশন প্রোগ্রামে ব্যাপক মাত্রায় কাজ করেছেন ড. ডেভিস]।

বীণা : আপনার মতে, মেয়েরা কেন নীরব থেকেছে?

জিওফ্রে : দেখুন, সেটা ছিল ভীতি। তাদের সবারই সেসব ছিল দুঃস্বপ্ন। কখনোই সেসব থেকে মুক্তি মেলে না। তাদের অনেকেরই ছিল প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা। কারণ আমরা ছিলমা বিদেশি। আর বিদেশিদেরকে কেউই বিশ্বাস করেনা। তারা জানতো না যে তাদেরকে নিয়ে আমরা কী করতে চলেছি...

বীণা : যেখানে ধর্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল সেরকম কোনো স্থান কি আপনি পরিদর্শন করেছেন?

জিওফ্রে : ধর্ষণ ক্যাম্পগুলোকে ধ্বংস বা ভেঙে দেয়া হয়েছিল এবং পুনর্বাসন সংস্থাগুলো সেসব নারীদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এরকম ঘটছিল – স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলে সে তাকে হত্যা করে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। কারণ ওই স্ত্রী অপবিত্র হয়ে গেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তারা জানতে চাইতো না যে এরকম কোনো কিছু ঘটেছে। আর যমুনা নদীতে দূরদূরান্তে লাশ দেখা যেতো। এটাই ছিল সেই ঘটনা যেটা ইউরোপের মানুষদেরকে উত্তেজিত করে তোলে।

বীণা: নারীদেরকে কি আপনি মনে করতে পারেন? কতজনের ক্ষেত্রে আপনি গর্ভপাত করেছিলেন?

জিওফ্রে: সঠিক পরিসংখ্যান মনে করা কঠিন। তবে দিনে প্রায় একশ করে।

বীণা: ঢাকায় নাকি বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে?

জিওফ্রে: এভাবে সংখ্যা নিরূপণ করে বলা কঠিন। ঢাকায় প্রতিদিন ১০০ করে আর অন্যান্য অনেক শহরে বিভিন্ন সংখ্যায়। আবার কিছু কিছু কলকাতায় যেতো...

বীণা : আপনি কি শতকরা হিসাবটা মনে করতে পারেন? যেমন, শ্রেণিগতভাবে, ধর্মগতভাবে কতজন নারীকে আপনি দেখেছেন?

জিওফ্রে : সকল শ্রেণির মধ্যেই এটা ছিল। ধর্মীয়গতভাবে আমরা কোনোকিছু বিচার করিনি... সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়াই ছিল আমাদের কাজ। সাধারণভাবে, যুদ্ধের মধ্যে সামান্য বিরতি বা সুযোগ পাওয়ামাত্র, গর্ভপাতের জন্য, স্বচ্ছলরা চলে যেতো কলকাতায় এবং সেখানে গিয়ে তারা তাই করতো...

বীণা : মেয়েরা গর্ভপাত চায় কিনা তা কি প্রশ্ন করতো? তাদেরকে কি পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হতো?

জিওফ্রে : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের কাছে আসা সব মেয়েই গর্ভপাত করতে চাইতো। না করতে চাওয়া কেউ থেকে থাকলেও আমরা দেখিনি। অন্যদিকে, সন্তান জন্ম দেয়ার পরে ওইসব মায়েরা তাদের সদ্যোজাত সন্তানকে পুনর্বাসন সংস্থাগুলোকে দিয়ে দিতো। আর এভাবেই তারা ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস হয়ে ভিনদেশে চলে যেতো। কতজন, আমার কোনো ধারণা নেই।

বীণা : এটার আরো ভেতরে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কিন্তু পুনর্বাসন কার্যক্রমে পছন্দ বা সায় দেয়ার বিষয়ে সত্যিই আগ্রহী। আপনি মনে করতে পারেন যে গর্ভপাতের সময়ে মেয়েদেরকে কান্নাকাটি বা দৃশ্যত হতাশ মনে হয়েছে?

জিওফ্রে : না, ওদের একজনও কাঁদেনি। তারা ছিল খুবই সংবেদনশীল। একটুও কাঁদেনি তারা। বেশ শান্ত ছিল তারা। ওহ! থ্যাঙ্ক গড! তারা এটা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছিল!

বীণা: আপনি বলেছেন যে আপনি শুধু যেসব মেয়ে গর্ভপাত করতে চেয়েছে তাদের চিকিৎসা প্রদান করেছেন। আমি আবার সেই বিষয়ে ফিরে যেতে চাই। গর্ভ নষ্ট করার জন্য কাদের কাছে মেয়েরা তাদের মতামত দিয়েছে : সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স নাকি সমাজকর্মীদের কাছে?

জিওফ্রে : হ্যাঁ, তাই।

বীণা : তারা কি কোনো কাগজে স্বাক্ষর করতো?

জিওফ্রে : আমার জানামতে তাদেরকে একটা সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। আমি নিশ্চিত নই। সরকার পরোক্ষভাবে সেটা পরিচালনা করতো। এসব বিষয় প্রধানত পুনর্বাসন সংস্থাগুলোই পরিচালনা করতো। আর সেসব কাজ সহায়তা প্রদানকারী ভদ্রমহিলারা করতো। গর্ভপাতে অনাগ্রহী কেউই ক্লিনিকের কাছে আসেনি, এটা নিশ্চিত। অতএব, এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় ছিল না।

বীণা : আপনি শেষ দিন পর্যন্ত গর্ভপাত করেছেন? সেটা কি গর্ভধারণের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায় ছিলনা?

জিওফ্রে : হ্যাঁ, সেখানে আমার থাকা ছয় মাসের পুরোটাতেই আমি গর্ভপাত করেছি। তাদের [অন্তঃসত্ত্বা] শারীরিক অবস্থা এতটাই পুষ্টিহীন ছিল যে চল্লিশ সপ্তাহের পরিপূর্ণ ভ্রূণ ছিল অন্য যে কোনো স্থানের ১৮ সপ্তাহের ভ্রূণের সমতুল্য।

বীণা: নারী বা ছোটরা কোনো ধরনের পরামর্শ [কাউন্সেলিং] পেয়েছে বলে কি আপনি মনে করতে পারেন?

জিওফ্রে : পরামর্শ [কাউন্সেলিং], হ্যাঁ পুনর্বাসন সংস্থাসমূহের কাছ থেকে। নারী সমাজকর্মীরা তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতো। আমার মনে হয়নি যে এতে কোনো কাজ হয়েছে। কারণ তাদের সকলেরই ছিল অপুষ্টি, ভয়াবহ ধরনের অসুখ-বিসুখ... এবং তাদের সকলেরই ছিল কোনো না কোনোরকমের যৌনরোগ। সেটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। ওই সমস্যা সামাল দেয়ার জন্য দেশটিতে সীমিত সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও ওষুধপত্র ছিল। আর সীমিত সুযোগ-সুবিধাও সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল যুদ্ধ-আক্রান্ত বা অনুরূপ মানুষদের জন্য। নারীদের জন্য খুব বেশি কিছু ছিল না। আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব জিনিসপত্র যোগাড় করে নিতে হতো।

বীণা : কোথা থেকে আপনি আপনাদের সরবরাহ পেতেন? সেসব কি যথেষ্ট ছিল?

জিওফ্রে : ইংল্যান্ড থেকে। আমাকে আমার নিজস্ব সরবরাহ নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। এছাড়াও আমি দুই সেট যন্ত্রপাতি এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম।

বীণা : গর্ভপাতের জন্য ছয় মাস ধরে আপনি কি শুধু এই দুই সেট যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করেছেন?

জিওফ্রে : হ্যাঁ। স্থানীয় হাসপাতালের যন্ত্রপাতিগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল এবং সেখানে খুব বেশি ছিলও না। আর ওষুধপত্র ছিল শুধুমাত্র আহত ব্যক্তিদের জন্য।

বীণা : চিকিৎসার প্রেক্ষিতে সেসব কি নিরাপদ ছিল ?

জিওফ্রে : হ্যাঁ। সেসময়ে ওইসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশ কম ছিল, বিশেষত অপেক্ষাকৃত তরুণদের জন্য।

বীণা : তারমানে আপনি গর্ভপাত এবং দত্তকায়ন দুই প্রক্রিয়াতেই জড়িত ছিলেন?

জিওফ্রে: হ্যাঁ। তবে দত্তকায়ন কার্যক্রমে শুধুমাত্র বাচ্চাগুলোকে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের কাছে হস্তান্তর করা পর্যন্ত। ছোট্ট যে কেউ

এবং এমনটি একটুখানি বড় হওয়াও... সেসব ছিল সামান্য সংখ্যায়। তবে গর্ভপাত বা সদ্যোজাত শিশুদের সংখ্যা ছিল ব্যাপক। যুদ্ধের সময়ে যেসব স্থানে মেয়েদের রাখা হতো সেসব স্থান নিশ্চয়ই বেশ বড় ছিল। কিন্তু সেসবের [ধর্ষণ ক্যাম্প] সবই আমি যাওয়ার আগেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

বীণা: ঢাকা শহরের বাইরে, আপনি যেসব এলাকায় ছিলেন, সেসব স্থানের অবস্থা কেমন ছিল? কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল?

জিওফ্রে : হাসপাতাল এবং পুনর্বাসন সংস্থা... আমি সেসবের কি নাম ছিল তা মনে করতে পারি না! বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন্স রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন বা এরকম কিছু। ওই সংস্থাই বেশিরভাগ বড় বড় কেন্দ্রগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। আর আমার যাওয়ার আগে [গর্ভপাতের] ওই সংখ্যা ছিল নগণ্য কারণ কেউই [চিকিৎসক/নার্স] সেটা করতে চাইতো না। হাসপাতালের বেশিরভাগ চিকিৎসক/কর্মচারীই মনে করতো যে এটা অবৈধ। যাহোক, আমাকে আমার কাজ করার অনুমতির উল্লেখ করে, সরকারের সচিব রব চৌধুরীর পক্ষ থেকে দেয়া একটা চিঠি ছিল আমার কাছে। সেখানে লেখা ছিল যে আমি [প্রয়োজনীয়] যা করবো তা বৈধ এবং সব রকমের সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার। এখন আমি আর চিঠিটা খুঁজে পাই না। কোথাও আছে হয়তো... বাংলাদেশ থেকে অনেক কাগজপত্র রয়েছে... আমি মনে করি যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আমি আমার জীবদ্দশায় আর কখনোই দেখব না। সেজন্য আমি সেসব কাগজপত্র রেখে দিয়েছি। সেসময়ে সেটা ছিল খুবই কঠিন, খুবই ভয়ানক।

বীণা: সব মেয়েই কি সাধারণভাবে গর্ভপাত বা দত্তকায়নে বাচ্চাকে দিয়ে দিতে সায় দিতো? তাদের কেউ কি বাচ্চাকে রেখে দিতে আগ্রহী ছিল?

জিওফ্রে: হ্যাঁ... কয়েকজন এরকম আগ্রহী ছিল...

বীণা: আপনি কি জানেন যে তাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে?

জিওফ্রে: আমার কোনো ধারণা নেই। ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেছে। আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে যেহেতু দত্তকায়নের জন্য কম শিশু পাওয়া যায়, তারা চেষ্টা করছিল সম্ভাব্য বেশি সংখ্যক শিশুকে নিয়ে যাওয়ার।

বীণা : ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস?

জিওফ্রে : হ্যাঁ। এটা ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। দত্তকায়নে নিয়োজিত একটি বড় প্রতিষ্ঠান।

বীণা : মায়েদের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

জিওফ্রে : গর্ভপাত বা প্রসবের পরে কিছু সময় তারা সেখানে অবস্থান করেছে এবং তারপরে সাহায্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের [রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন

সেন্টার] ব্যবস্থা করা আশ্রয় কেন্দ্রে চলে গেছে। সেখানে তারা যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারতো। তারপরে ওইসব মেয়েরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি হতো। আমি তাদের কয়েকজনকে দেখেছি। উৎসাহের ভিত্তিতে পরিধেয় বস্ত্রাদি তৈরি করতো। ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালিতে।

ড. ডেভিসকে তার স্মৃতি প্রকাশের জন্য জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রস্থানের আগে, তার সঙ্গে আবারো বাংলাদেশ ভ্রমণের বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। স্বাভাবিকভাবেই একটা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের বিষয় উঠে আসে আমাদের আলোচনায়। জেফ আমার হাত ধরেন চেপে ধরে তার বুকে। তার চোখ ভরা অশ্রু। তিনি বলেন, সুবিচার পাওয়ার স্বার্থে বাংলাদেশের জন্য তার সামর্থ্যে কুলায় এরকম সবকিছু তিনি করতে চান। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে এই সাক্ষাৎকারটি আগ্রহী ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে তার কাহিনির পরিপূর্ণ [অফিসিয়াল] দলিলপত্র সংগঠিত করার কাজে উৎসাহিত করবে।

ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন

নেটে ঘাটাঘাটি করতে করতে কত কিছু পাওয়া যায়। কানাডার ডেল পরিবারে দত্তক নেয়া বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু 'আমিনার' সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলাম! ডিসেম্বর ২০০৪ সালের সুনামির পরে দক্ষিণ ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে কানাডার সাহায্য সংস্থা ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন [এফএফসি]। আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে এই সংস্থাই এসেছিল দত্তকায়নের মাধ্যমে সাহায্য করতে। এফএফসি ডিরেক্টর সান্দ্রা সিম্পসন এবং এফএফসি স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে বিনিময় করা একগুচ্ছ ইমেইল থেকে জানা গেল অনেক কিছু।

কানাডীয় একজন ভদ্রমহিলা সান্দ্রা সিম্পসন প্রতিষ্ঠা করেন ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন বা এফএফসি। এই সংস্থা কাজ করেছে ভিয়েতনাম, ক্যাম্বোডিয়া, সোমালিয়া, ভারত, এল সালভাদর এবং আমাদের বাংলাদেশে। বর্তমানে (২০০৭) এটা কাজ করছে ভারত ও বাংলাদেশে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আশ্রয়নটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধশিশু একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীদের প্রয়োজনে।

১৯৭২ সালে বিদেশে বাচ্চা দত্তক দেয়ার কার্যক্রম থেকে যাত্রা শুরু হয় এফএফসির। দেশের নতুন আইনে বিদেশে বাচ্চা দত্তকায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, ক্রমবর্ধমান উঁচু-ঝুঁকিসম্পন্ন বাচ্চাদের প্রয়োজন মেটাতে, ১৯৭৫ সালে

১২টি শিশু নিয়ে ঢাকায় নিজেদের বেবি হোম খোলে এফএফসি। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের পরিত্যক্ত, নিঃস্ব, পুষ্টিহীন শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা। শিশুদেরকে দেশের স্বাভাবিক নাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য দেয়া হয় পূর্ণ সহযোগিতা, আশ্রয়, খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা, লেখাপড়া এবং আন্তরিক পারিবারিক পরিবেশ।

১৯৮৫ সাল নাগাদ ঢাকার কেন্দ্রে ৪০০ জন শিশু হয়ে যায়। ব্যাপকভাবে সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সঙ্গে শ্রীপুর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সহযোগিতায় ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা প্যাট কের-কে। ১৯৮৯ সালে শ্রীপুরে শিশুদেরকে স্থানান্তর করার পরে, উঁচু-ঝুঁকিসম্পন্ন শিশুদের জন্য [আবার] ঢাকা বেবি হোম খোলার জন্য কানাডার টোভ কিলবার্নকে ঢাকায় পাঠান সান্দ্রা। ১৯৯০ সালে শ্রীপুর কেন্দ্রটি দিয়ে দেয়া হয় এফএফসি ইউকে-র কাছে [বর্তমানে শিশুপল্লী প্লাস] এবং ঢাকা বেবি হোমটি রয়ে যায় এফএফসি কানাডার হাতে।

বর্তমানে [২০০৭ সালে] এখানে ঢাকার উত্তরায় দুটি ভাড়া করা বাসায় রয়েছে ১৩০ জন শিশু। এছাড়াও রয়েছে নারায়নগঞ্জ জেলার নওগাঁর একটি গ্রামে একটা অবকাশ শিবির। আমাদের সবগুলো শিশুর মধ্যে ২২ জনের বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে। তাদের বয়স সদ্যোজাত থেকে ১৬ পর্যন্ত। সংস্থার পরিচালনা ব্যয় মেটানো হয় শিশুদের স্পন্সরশিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং দেশের বাইরে মূলত কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও ফিনল্যান্ডের ব্যক্তি পর্যায়ের দাতাদের দান থেকে। সংস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন মন্ট্রিয়ল ও টরোন্টোর সদর দপ্তর থেকে সান্দ্রা। এখান থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় পরিবারে দত্তকায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশে দত্তকায়নের অনুমতি নেই। দত্তক নিতে আগ্রহী যে কেউ সরাসরিভাবে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

সান্দ্রা সিম্পসন এফএফসি ঢাকা এবং এফএফসি ভারতের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট। পুরো সংস্থার মেরুদণ্ডই তিনি। এফএফসি শিশুদের কাছে তিনি দাদিমা চরিত্রের মতো এবং তার চেনা-পরিচিত সকলের কাছে একজন 'প্রেরণা'। সকলের কাছ থেকে তিনি মাত্র একটি ই-মেইল দূরত্বে অবস্থান করেন। কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি খুবই শক্তিশালী এক অস্তিত্ব।

কানাডার টরন্টো থেকে, এফএফসি স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে, একটি ই-মেইলে সান্দ্রা লিখেছেন...

হতে: সান্দ্রা সিম্পসন <sandraffc@sprint.ca>

প্রতি: ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন <volunteerffc@airtel.blackberry.com>

সময় : শনিবার, জানুয়ারি ০৮, ২০০৫ ১১:২০ সকাল

হ্যালো, এভরিওয়ান

সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছি। আমাদের আহ্বানের প্রতি যে চমৎকার সাড়া আমরা পেয়েছি সেজন্য প্রথমেই আমি এফএফসি এবং ভারতের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই ধন্যবাদ। এ পর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করেছি ৩৫,০০০ ডলার; যা আমি মনে করি দারুণ স্বস্তিকর। আরো পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে।

আপনাদের অনেকেই হয়তো জ্ঞাত আছেন যে ভারতের সরকার, সুনামি পরবর্তী পুনর্গঠন কার্যক্রম চালানোর জন্য সেদেশে কাজ করা এফএফসির মতো আরো এনজিও ও সাহায্য সংস্থার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চায়।

১২ই জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে তামিল নাড়ুর চেন্নাইয়ে সরকারের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এনজিও-দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এফএফসি কর্মী সারাহ, সানবীম এবং গান্ধী (আমাদের দত্তকায়িত সমাজকর্মী) এটায় যোগ দিবে।

গতকাল, ৬ই জানুয়ারিতে, গান্ধী কারা [CARA] থেকে একটি কল পায়। কারা ভারতীয় সরকারের একটি অঙ্গ যা দত্তকায়নের বিষয় দেখাশোনা করে। তারা বলেছে যে তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সির সন্ধান করছে যেখানে শিশুদের দত্তকায়নের সুযোগ রয়েছে। এটা সঠিক অর্থে দত্তকায়ন নয়, তবে শিশুদের সম্পর্কে যথাযথভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত সময়ের জন্য যত্ন নেয়ার দায়িত্ব পালন। সেসব শিশুদেরকে নেয়ার জন্য তারা শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সিই খুঁজছে। সারা বছর ধরে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, আমাদের সুনাম রয়েছে এবং আমাদের রয়েছে স্থায়ী অবস্থান। আমরা অবশ্যই রাজি হয়েছি এবং এসব বিষয়ে ১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হবে।

ডেল ওলসি, এফএফসির একজন মহান বন্ধু, ভিসা পাওয়ার পরপর শীঘ্রই ভারতে যাচ্ছেন। আমাদের সংগ্রহ করা অর্থ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করবেন এবং আমাদের সংগ্রহ চলতেই থাকবে। যে কোনোভাবেই হোক তার সেবাদানের আগ্রহ জানিয়ে প্রথমদিকেই ডেল আমাকে একটা ইমেইল পাঠিয়েছে।

ডেল ও ডোনা অন্টারিওর লন্ডনে বসবাস করে। ১৯৭২ সালে তারা বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের একজন যুদ্ধশিশু আমিনাকে দত্তক নিয়েছিল। আমিনা এখন সিঙ্গাপুরে শিক্ষকতা করছে। একইভাবে তারা কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কানাডা, এল সালভাদর এবং ভারতে দত্তকায়নে অগ্রণী হয়েছে। আমরা সবসময়ে তাদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে রেখেছি। বিগত কয়েক বছর তারা জার্মানি এবং পরে মালয়েশিয়াতে শিক্ষাদানের কাজ করেছে। বেশ কয়েকবার তারা প্রকল্পে যোগ দিয়েছে।

আমরা অনুভব করি যে মানুষের দেয়া প্রতিটি সেন্ট সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে তা দেখাটা খুবই জরুরি। ডেলের যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল একেবারে প্রথমেই [দক্ষিণ ভারতের] উপকূল অঞ্চলে চলে যাওয়া সারাহ পেনিংটন এবং লেভর গুয়েনথারের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা এবং ভ্যাঙ্কুভার ছাড়ার আগে আমার দেয়া একটি কাজের তালিকা যাচাই করা। যেহেতু আমি আর ভ্রমণ করতে পারিনা (কারণ আমার বাগ্‌যন্ত্র বা কণ্ঠনালী ধরে রাখা ফাঁপা অঙ্গ অপসারণ করা হয়েছে এবং দূষণ ও তার প্রভাব), সারাহ, লেভর, ললোর রচেস্টার এবং অড্রে টিমারম্যান আমার বদলে বছরে একবার করে এফএফসি অ্যাব্রডে যাচ্ছে। তারা সেখানে থাকা পর্যন্ত ভারতে আমাদের স্থানীয় এফএফসি প্রশাসক সানবীম প্রকল্পটি ছাড়তে পারবে না। কারণ তাদের সানবীমের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। ভ্যাঙ্কুভারের টোভে কিলবার্ন এয়ার কানাডার পাস নিয়ে পরবর্তী কোনো এক সময়ে ডেলকে অনুসরণ করবে।

আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি সেসব শুনলে খুবই খুশি হব। আমি পাওয়া [ইমেইল] গুলো নিয়ে ব্যস্ত আছি; অতএব শীঘ্রই আপনার [উত্তর] পেয়ে যাবেন।

সান্দ্রা
[কানাডা]

বীরাঙ্গনার কান্না!

ছবি: দৃক

দেলোয়ারা বেগম
বীরাঙ্গনাদের সেবায়...
পাবনা বীরাঙ্গনা
হাসপাতালের সেবিকা

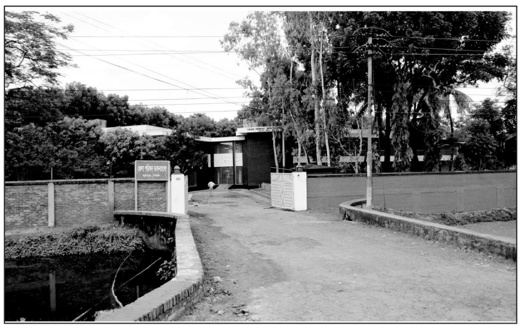

পাবনা বীরাঙ্গনা হাসপাতাল

মায়ের আঁচল...
মাদার তেরেসা

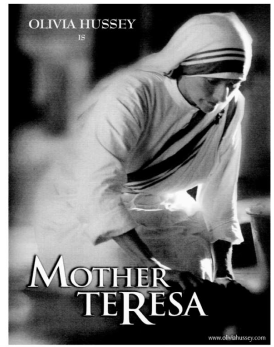

মাদার তেরেসা
তেরেসাকে নিয়ে চলচ্চিত্র
নাম ভূমিকায় লাভস্টোরি খ্যাত
অলিভিয়া হুসী

অধ্যায় - ৪

নারীর শরীরও যুদ্ধক্ষেত্র

সাহসী বাঙালি নারীর দুর্বিনীত প্রতিবাদ!

১৯৭১ সালের এক প্রখর দুপুরবেলা। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে একটি অপারেশন সমাপ্ত করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে ক্যাম্পে ফিরছে লেফটেন্যান্ট মেহবুব এবং লেফটেন্যান্ট ইশরাক। হঠাৎ করেই আসে এক দুঃসংবাদ। পাকিস্তানি সেনারা আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় করে আক্রমণ করেছে সম্পূর্ণ গ্রাম। সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে মেহবুব ও ইশরাক লুকিয়ে পড়ে কচুরীপানা ভর্তি এক পুকুরে। একজন সন্তান-সম্ভবা মেয়ে পুকুরের পাড়ে বসে কাপড় পরিষ্কার করছিল। মহিলাটি মেহবুব ও ইশরাকের পুকুরে লুকিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছিল।

একটু পরেই সেখানে পৌঁছল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তারা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, কোনো মুক্তিসেনা কি এখানে এসেছে? না, দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল মেয়েটি। একজন সেনা তার দিকে চিৎকার করে উঠল, তুমি কি কোনো মুক্তিসেনাকে এখানে দেখেছ? না, আরো একবার একইভাবে উত্তর দিল মেয়েটি। এবারে দুজন সেনা তার দু'হাত ধরে ফেলল আর তৃতীয় আরেক সেনা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনো মুক্তিসেনাকে এখানে দেখেছ? না, আরো একবার উত্তর দিল। আচমকা সেনাদের বেয়নেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির তলপেট! সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক অপরিপক্ব ছোট্ট বাচ্চা...!

সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই কেটে যায় অনন্ত সময়। পানি থেকে উঠে আসে মেহবুব আর ইশরাক। সন্ধ্যার আঁধারে তারা দেখল এক 'মা' পড়ে আছে তার বাচ্চাটার পাশে। রক্তে ভেসে গেছে স্থানটি...।

সবার মাঝে কে সবচেয়ে সাহসী মানুষ? আর কে সবচেয়ে মহান মুক্তিযোদ্ধা? গ্রামের এই সরল সাধারণ গৃহবধূর অসম সাহসী অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার মতো সময় কি আছে স্বাধীন বাংলাদেশের পাঁচ দশকের পরিপক্ব নবীন প্রজন্মের!

যুদ্ধের অস্ত্র রূপে ধর্ষণ

১.

'মাদার জোনস' শীর্ষক অনলাইন পত্রিকায় ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ওই পত্রিকারই শিক্ষানবীশ সম্পাদক লিসা কাতাইয়ামার এক রূঢ়-বাস্তব প্রতিবেদন। যুদ্ধকালে প্রচলিত অস্ত্রের পাশাপাশি 'ধর্ষণ' কীভাবে অন্যতম একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেকথাই বলেছেন নিজের অভিজ্ঞতায়-অনুভূতিতে...।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো দারফুরে জানজাভিদ মিলিশিয়া সেনা কর্তৃক সুদানি মহিলা ও মেয়েদেরকে ব্যাপকভাবে ধর্ষণ করার সংবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিছু কিছু মেয়েদের মতে, দেশটির পশ্চিম অংশে আরব শিশুদের জন্মের মাধ্যমে আরব জনসংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যই এর কারণ। ধর্ষণকে প্রায়শ যুদ্ধের পার্শ্ব-প্রভাব হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে; দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি বিশৃঙ্খলার ফলস্বরূপ, এবং একটি একক ব্যক্তিগত বিপর্যয়। কিন্তু এখানে উল্লেখিত ঘটনা প্রেক্ষিতে, গণহারে ধর্ষণ যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে - এই ক্ষেত্রে এটা হল একটা জাতিসত্তা একটা সংস্কৃতি-গোষ্ঠীকে 'পরিষ্কার' করার একটি যন্ত্র; একটি যুদ্ধাপরাধ।

দারফুর কোনো ব্যতিক্রম নয়। মনোবল ভেঙে দেয়া এবং শারীরিক ও সাংস্কৃতিক গণহত্যার কৌশল হিসেবে পূর্বেও ব্যবহার করা হয়েছে ধর্ষণকে। **১৯৭১** সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে, পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি গ্রামগুলোতে হানা দেয়, তাদের মেয়েদেরকে নিয়ে যায় ব্যারাকে, বারবার ধর্ষণ করতে থাকে ওইসব অসহায় নারীকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০,০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছিল এবং ফলাফল হিসেবে আসে ২৫,০০০ গর্ভধারণ। **১৯৭৪** সালে কাউন্সিল অব ইউরোপের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সাইপ্রাস দখলের সময়ে তুর্কী সৈন্য এবং অফিসাররা নারী ও মেয়েদেরকে ধর্ষণ করেছে। হিউম্যান

রাইটস ওয়াচ তথ্য প্রদান করেছে যে পেরুতে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৯০-এর দশকে নিরাপত্তা কর্মীরা বিপুল সংখ্যক মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। শক্ত প্রমাণ রয়েছে যে এই কৌশলটি অনুসরিত হয়েছে ওপরের আদেশে। ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন করার জন্য বার্মিজ সরকারের অভিযানের সময়ে, রোহিঙ্গা পুরুষদেরকে বন্দী করে জোরপূর্বক-শ্রমে নিয়োগ করা হতো এবং মেয়েদেরকে গণহারে ধর্ষণ করা হয়েছে। এভাবে অত্যাচারের মাধ্যমে দেশ থেকে বের করে পাঠিয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্পে। ঘটনাক্রমে, সেখানে তারা আবারও ধর্ষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। এবারে সেসব ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

আরো সাম্প্রতিককালে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বর্ণনা করে যে, উত্তর উগান্ডার লর্ডস রেজিস্ট্যান্স আর্মি সুব্যবস্থিতভাবে মেয়েদেরকে অপহরণ করে, আদেশ পালনের পুরস্কার হিসেবে সেবা করার জন্য, জোর করে তাদের 'স্ত্রী' বানায়। সিয়ারা লিওনে-তে অপহরণ, যৌন-দাসী এবং ধর্ষণকে ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের তথ্য ধারণ করে জাতিসংঘ। ১৯৯৪ সালে রুয়াভার গণহত্যায় দেখা যায় যে, হুটু মিলিশিয়া বাহিনী টুটসী সংখ্যালঘুদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য, তাদের নারীদের ওপরে চালায় গণধর্ষণ। অ্যামনেস্টির পরিসংখ্যান অনুযায়ী রুয়াভার গণহত্যার সময়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়। ধারণা করা হয় যে ধর্ষণে বেঁচে যাওয়া নারীদের প্রতি দশজনের সাতজনই বর্তমানে এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত।

সার্বীয় ধর্ষণ ক্যাম্পগুলো কুখ্যাতি অর্জন করে ১৯৯৩ সালে। সেসময়ে বিবৃত হয় যে, পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার ফোকা শহরের পার্টিজান স্পোর্টস কমপ্লেক্সটিকে বানানো হয়েছিল অতিক্রমণকারী বসনীয় মুসলিম ও ক্রোয়েশীয় নারীদের বন্দীশালা। ১৯৯২ সালে এটাই দুইমাসের জন্য ব্যবহৃত হয় ধর্ষণ ক্যাম্পরূপে। ডজন ডজন সার্বীয় ধর্ষণ ক্যাম্পের একটি মাত্র ছিল এই পার্টিজান ক্যাম্প। স্পষ্টত দেখা যায় যে এর মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম ও ক্রোয়েশীয়দের মনোবল ভেঙে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। যুদ্ধকালে যৌন-আক্রমণের প্রেক্ষিতে বিচারের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনালে। ফোকায় সংঘটিত ঘটনাবলীর দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় কারাজিক নেতৃত্বের ওপরে। তিনজন বসনীয় সার্বকে নারী ও মেয়েদেরকে ধর্ষণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

চীনা প্রশাসন কর্তৃক তিব্বতে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক গণহত্যা সম্পর্কে খুব সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, চীন অননুমোদিত তিব্বতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যার মধ্যে ছিল

তিব্বতীয় মেয়েদেরকে গণহারে বন্ধ্যা ও জোরপূর্বক গর্ভপাত এবং সুসংগঠিতভাবে ধর্ষণ করা। তিব্বতীয় নান এবং অন্যান্য নারী রাজনৈতিক বন্দীদেরকে বারবার ধর্ষণ এবং যৌন-হয়রানি করা হয়। এসব নারীর উচ্চমার্গের ধর্মীয় মর্যাদাকে জেনেশুনে ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে গোটা সম্প্রদায়ের মনোবল ভেঙে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

একটি সমাজকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে দেয়া এবং সামরিক বিজয় অর্জনের পথে একটি নীতিগত কৌশল হিসেবে, অপরাধী কর্তৃক প্রয়োগ করা, 'ধর্ষণ' একটি স্বীকৃত পন্থা। জেনেভা কনভেনশন এবং টর্চার কনভেনশন, ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসের মতো অন্যান্য জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ নিষ্ঠুর, অপমানকর এবং অমানবিক চুক্তিগুলোকে নিষিদ্ধ করে। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণধর্ষণকে বিবেচনা করা হয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে। যুদ্ধে ধর্ষণের মতো অপরাধ প্রায়শ আইনের আওতায় আসেনা, এবং কদাচিৎ প্রচার মাধ্যমের প্রাপ্য দৃষ্টি পায়।

২.

পিটার ট্যাচেল বিশ্বখ্যাত একজন মানবাধিকার কর্মী। ১৯৬৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকেই যুক্ত হয়েছেন মানবাধিকার আন্দোলনে। ১৯৫২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ এবং কলাম লেখক। গার্ডিয়ান পত্রিকায় ২০০৬ সালের ৮ই ডিসেম্বরে তার কলামে প্রকাশ করেছেন ধর্ষণের আরো এক রূপ; বিশ্ব-মানবতাকে অপমান করে ধর্ষণের মতো বর্বর কর্মকাণ্ডও হতে পারে যুদ্ধাস্ত্র!

দারফুরের হত্যাযজ্ঞের মাঠে ধর্ষণ একটি যুদ্ধাস্ত্র। অপমান এবং অত্যাচারের ইচ্ছাকৃত পন্থা হিসেবে হাজার হাজার নারী ও মেয়েকে যৌন সন্ত্রাসের বলি হতে হয়েছে। ধর্ষকরা জানে যে তাদের অপকর্ম কিভাবে অত্যাচারিত নারী, তাদের সন্তান, তাদের পরিবার এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে গভীর লজ্জা। এটা সন্ত্রাসের এমন এক রূপ যা শিকারদের কাছে যৌন-যন্ত্রণা এবং আবেগময় বেদনা– দারফুর অঞ্চলের রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় রীতিনীতির কারণে মূলত সবকিছুই।

১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস। দিনটিকে চিহ্নিত করার জন্য, দারফুরের জন্য একটি দ্বিতীয় বিশ্ব দিবসও পালিত হবে। এবারে দৃষ্টি দেয়া হবে নারীর বিরুদ্ধে যৌন-সন্ত্রাসের ওপরে। লন্ডন এবং বিশ্বজুড়ে অন্যান্য শহরে মানুষেরা ডারফুরে নারীদের গণধর্ষণের বিষয়টি এবং শারীরিক ও যৌন উভয়

সন্ত্রাস দমনে জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীর জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরবেন।

২০০৬ সালের মে মাসে গৃহীত ডারফুর শান্তি চুক্তি হওয়ার পর থেকে জ্ঞাত ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে গেছে। শুধু বিগত পাঁচ সপ্তাহেই, কালমায় অবস্থিত দারফুরের বৃহত্তম শিবিরে ২০০-রও বেশি নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। এসব ন্যক্কারজনক ঘটনায় জড়িত রয়েছে সুদানি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং তাদের সহযোগী জানজাভিদ মিলিশিয়া বাহিনী, এবং সেইসঙ্গে সরণার্থীদের রক্ষার্থে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী। মেয়েরা অভিযোগ করে যে খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য 'যৌন-সুবিধা' দিতে তাদেরকে জোর করা হয়।

দারফুরে আফ্রিকান এবং মুসলিম সংস্কৃতির গভীর ঐতিহ্যে দীর্ঘস্থায়ী দাগ কেটে চলেছে বেঁচে যাওয়া ধর্ষণের শিকার মেয়েরা। প্রায়ই এমনটা ঘটে যে, পরিবার এবং সম্প্রদায় কর্তৃক সমাজচ্যুত হলে তাদেরকে খাদ্য বা আশ্রয়হীন অবস্থায় নিদারুণ কষ্টে পতিত হতে হয়। আর প্রায়শ এমনটাই ঘটে যদি তাদেরকে জোর করে ধর্ষকদের সন্তান জন্ম দিতে হয় তাহলে সেসব বাচ্চাও একইভাবে সমাজে অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া কিছু ধর্ষিতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা সম্পাদন ও বেআইনিভাবে সন্তান-সম্ভবা হওয়ার কারণে জেল দেয়া হয়! মধ্য-২০০৫ সাল থেকে বহির্বিশ্বের চাপে সুদানি সরকারকে ধর্ষিতাদের গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাকতে প্রভাবিত করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পুলিশ ধর্ষণের বিষয়ে অনুসন্ধান এবং বেঁচে থাকা ধর্ষিতাদের সঙ্গে এখনো ন্যায়ানুগ ব্যবহার করছে না। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকারদের সঙ্গে বাজে আচরণ সম্পর্কে ব্যাপক অভিযোগ আছে। তার মানে যৌন-সন্ত্রাস ব্যাপকমাত্রায় অরক্ষিতই রয়ে গেছে।

ধর্ষণের ফলে শারীরিক ক্ষতিটি বেশিমাত্রায় শোচনীয় হওয়ার আরো একটি কারণ হল দারফুর অঞ্চলের মেয়েদেরকে নারী-অঙ্গে ব্যবচ্ছেদ (খতনার অনুরূপ) করাতে হয়। এসব মেয়েদের জন্য ধর্ষণে ঘটে আরো বেশিমাত্রার চিকিৎসা জটিলতা- অন্তস্থ রক্তক্ষরণ, কৃত্রিম সংযোগ-পথ, অসংযম এবং হেপাটাইটিজ বি, সি ও এইচআইভি-র মতো যৌন-বাহিত রোগ। ধর্ষিতাদের একটা বিরাট অংশ চিকিৎসা সেবা নিতে খুবই লজ্জাবোধ করে। আবার, সেসব সেবা পাওয়ার সুযোগও কম বা ব্যয়সাধ্য।

চিকিৎসা না করালে কোনো কোনো ধরনের যৌন-বাহিত রোগ মেয়েদেরকে বন্ধ্যাও করে ফেলতে পারে। সন্তান জন্মদানের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলাটা সমাজে আরো এক ধাপ পতন; যেখানে নারীর সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার অন্যতম অংশ হল

সন্তান থাকা বা মা হওয়া। অপরাধ ও লজ্জার কারণে, শিকার হওয়া নারীরা তাদের বেদনার কথা বলতে চায়না। বেশিরভাগ একাকি এবং নীরবে বয়ে বেড়ায় এই যন্ত্রণা। যৌন-সন্ত্রাসের প্রকৃত ঘটনা শুধুমাত্র ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে; প্রায়শ শিকারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে।

দারফুরে ইউএনসিএইচআর বা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন কর্তৃক গণধর্ষণের সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে। উত্তর দারফুরে তাবিলা এলাকায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখের এক আক্রমণে, ইউএনসিএইচআর বলে, "পঁচাত্তর জন মানুষ হত্যা করা হয়েছে, এবং একশরও বেশি নারী ও মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে - তাদের ছয়জনকে নিজ নিজ পিতার সামনে।"

ইউনিসেফ কর্তৃক একই ধরনের একটা ঘটনা ধারণ করা হয়েছে। এখানে শনাক্ত হয়েছে যে, উত্তর তাবিলায় সংঘটিত হয়েছে, "বিশাল সংখ্যায় ধর্ষণের ঘটনাবলী। স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদেরকে আক্রান্ত করা, ছোটদেরকে ১৪ জন পুরুষ মিলে গণধর্ষণ, নারী ও শিশুকে অপহরণ এবং অসংখ্য সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা।" কাইলেক শহরটি ৫০ দিন ধরে দখল করে রেখেছিল জানজাভিদ। নারী ও পুরুষদেরকে আলাদা করা হয় এবং ৮০টি ধর্ষণের ঘটনা জানা যায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, ধর্ষক তাদের অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। সামান্য সংখ্যককেই আসতে হয় বিচারের সামনে। এভাবেই সৃষ্টি হয় এক পরিবেশ যেখানে যৌন-সন্ত্রাস ক্রমেই স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে চলেছে এবং অপরাধীদেরকে দেখা হয় ধরা-ছোঁয়া বা আইনের আওতার বাইরের মানুষ হিসেবে।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে যৌনসন্ত্রাসের ব্যবহারকে বিবেচনা করা হয় অপরাধ হিসেবে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, সামরিক প্রধান এবং রাষ্ট্রের উঁচুস্তরের কর্মকর্তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। রোম সন্ধির ভিত্তিতে প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট নির্দিষ্ট করে বিবৃত করে যে, এধরনের সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং একটি যুদ্ধাপরাধ। যুদ্ধে যৌনাপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের জন্য দারফুরের নারীদেরকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?

পিটার ট্যাচেলের প্রোফাইল: পিটার ট্যাচেল একজন মানবাধিকার কর্মী। 'আউটরেজ!' নামের এক অদ্ভুত অধিকারবাদী দল এবং যুক্তরাজ্যের গ্রীন পার্টির বামধারার সদস্য। সংসদীয় নির্বাচনে তিনি গ্রীন পার্টির অক্সফোর্ড ইস্ট এলাকার প্রার্থী। তার মূল রাজনৈতিক চেতনাবাহী ব্যক্তিত্বরা হলেন মহাত্মা গান্ধী, সিলভিয়া প্যাংকহার্স্ট, মার্টিন লুথার কিং এবং ম্যালকম এক্স। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯৬৭

সালে তিনি মানবাধিকার আন্দোলনে যোগ দেন। তার প্রথম আন্দোলনটি ছিল মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। এরপরে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের [অ্যাবঅরিজিনাল] অধিকারের সমর্থনে আন্দোলন ও প্রণীত আইনের বিরুদ্ধাচরণ, এবং ভিয়েতনামে অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৯৭১ সালে চলে যান লন্ডনে। ১৯৮৭ সালে তিনি, শুধুমাত্র এইচআইভি আক্রান্ত মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বের প্রথম সংস্থা - ইউকে এইডস ভিজিল অর্গানাইজেশন [UKAVO]। ১৯৯৯ সালে সেন্ট্রাল লন্ডনে তিনি এবং আরো তিন আউটরেজ (!) সদস্য মিলে জিম্বাবের রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবের গাড়ি-বহরকে থামান এবং, অত্যাচার ও অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন করার অপরাধে মুগাবেকে 'নাগরিকদের হাতে [প্রতীকী] বন্দী' বা 'সিটিজেনস অ্যারেস্ট' করেন। ২০০১ সালে তিনি ব্রাসেলসে মুগাবেকে আবারও সিটিজেনস অ্যারেস্ট করেন। এবারে প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীরা তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে করতে সংজ্ঞাহীন করে ফেলে।

২০০২ সালে তিনি প্রাক্তন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরী কিসিঞ্জারকে, ভিয়েতনাম ও ক্যাম্বোডিয়ায় যুদ্ধাপরাধের কারণে, গ্রেফতার করানোর উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কোর্টে একটি 'অসফল' আইনি লড়াই করেন। পিটার ট্যাচেল পশ্চিম সাহারা, প্যালেস্টাইন এবং পশ্চিম পাপুয়ার স্বাধীনতার জন্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইরান ও ইরাকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন। তিনি পরিচয়পত্র, নিউক্লিয়ার অস্ত্র, শক্তি [এনার্জি] এবং ড্রাকোনিয়ান সন্ত্রাস-দমন আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার বিরোধিতা করেন। সম অধিকার আইনের অসাম্য দূর করার জন্য জন্য তিনি চান একটি একক, ব্যাপক ও সমন্বিত ইকুয়্যাল রাইটস অ্যাক্ট।

তিনি প্রস্তাব করেছেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক-ভাবে গৃহীত জাতিসংঘের মানবাধিকার কনভেনশন; যে কোনো স্থানে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বন্ধের অধিকারসহ স্থায়ী ও দ্রুত কর্মক্ষম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী; ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব এবং গৃহহীনতা দূর করার জন্য একটা তহবিল গড়ার লক্ষ্যে সামরিক ব্যয় ১০ শতাংশ কমানোর জন্য বিশ্ব-চুক্তি।

পিটার ট্যাচেল ছয়টি বইয়ের রচয়িতা। তার প্রকাশনার তালিকায় রয়েছে 'ডেমোক্র্যাটিক ডিফেন্স'-এ নন নিউক্লিয়ার অলটারনেটিভ [হেরেটিক বুকস/ জিএমপি], উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মার্চ স্ট্রেইট - ম্যাসকুলিনিটি, এবং কুইরস অ্যান্ড দি মিলিটারি [ক্যাসেল]।

৩.

আগ্রাসী যুদ্ধে ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় 'পরিকল্পিত যুদ্ধাস্ত্র' হিসেবে ধর্ষণ-কে। বিবিসি-র সাংবাদিক মিজ লরা স্মিথ-স্পার্ক, ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে উপস্থাপন করেন এক প্রতিবেদন। তার কলমে ফুটে উঠেছে যুদ্ধে বিপন্ন মানবতার বর্বর চিত্র।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সামরিক আগ্রাসনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রলম্বিত হয়েছে নারীর শরীরও পর্যন্ত! ধর্ষণ বা যৌন-হয়রানি এখন আর শুধু যুদ্ধের উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট বিষয় নয় বরং এসব ব্যবহৃত হয় পরিকল্পিত সামরিক রণ-কৌশল হিসেবে। বিগত শতাব্দির 'সুযোগ পেয়ে' ধর্ষণ বা লুটতরাজ বর্তমানের আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে প্রতিস্থাপিত হয়েছে সমন্বিতভাবে পরিকল্পিত ধর্ষণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অ্যামনেস্টি উদাহরণ দিয়েছে কলম্বিয়া, ইরাক, সুদান, চেচনিয়া, নেপাল এবং আফগানিস্তানের; তবে, যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহারের মাত্রা আরো অনেক ব্যাপক।

বসনিয়ার নারীদের ওপরে পরিচালিত পরিকল্পিত ধর্ষণ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ২ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ, ১৯৩৭ সালে নানকিং আগ্রাসনে জাপানি নারীদের ধর্ষণ... বিগত শতাব্দিতে রয়েছে এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ। রাষ্ট্র-পরিচালিত সেনাবাহিনী হোক বা অনিয়মিত আধা-সামরিক বাহিনী হোক - কোন কারণ এসব সশস্ত্র বাহিনীকে সাধারণ নারী ও শিশুদের ওপরে আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে?

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গীতা সেহগাল বিবিসি নিউজ ওয়েবসাইটকে বলেন, এসব অত্যাচার-অপমানকে যুগ যুগ ধরে 'যুদ্ধের দখল বা যৌন-চাহিদা মেটানো' হিসেবে বিবেচনা করা ভুল হয়েছে। প্রায়শ ধর্ষণ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, বর্ণবাদগত দ্বন্দ্ব-বিবাদে আগ্রাসীদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা এবং বর্ণবাদী সীমারেখা পুনরায় স্থাপন করার পন্থা হিসেবে। তিনি বলেন, 'নারীকে দেখা হয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানকারী এবং জন্মদাত্রী রূপে। অতএব, একদল যখন অন্যদলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, প্রায়শ তারা এটা সফল করে ওই সম্প্রদায়ের নারীদেরকে গর্ভবতী করার মাধ্যমে। তাদের কাছে এই কর্মটি শত্রু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার একটা উপায় মাত্র।

মেডেসিন্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ১৯৯০-এর দশকে তারা প্রথমবারের মতো যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার সম্পর্কে অনুধাবন করে। 'বসনিয়াতে, জাতি-বর্ণগত পরিষ্কার-পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে, পরিকল্পিত ধর্ষণ ব্যবহৃত হয়েছে সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে। নারীদেরকে

ধর্ষণ করা হয়েছে যেন তারা সার্বীয় শিশুর জন্ম দেয়!' সেহগাল বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্র-পরিচালিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক একইরকমের কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে তাদের 'সুপরিকল্পিত আক্রমণ'-এর অংশ হিসেবে। "তারা বলতো আমরা তোমাদেরকে পাঞ্জাবি সন্তান জন্ম দেয়াব," তিনি বলেন। লক্ষ্য ছিল বিরোধী পক্ষের (বাঙালিদের) অখণ্ডতা-পবিত্রতা বিনষ্ট করা।

এ বছরে (২০০৪) অ্যামনেস্টি সরকার-সমর্থিত জানজাবিদ মিলিশিয়া বাহিনীকে, সুদানের দারফুর অঞ্চলে বসবাসকারী অ-আরব জনগোষ্ঠীকে শাস্তি, অপমান এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গণধর্ষণ প্রয়োগ করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। ওই আক্রমণের ফলে নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে যেতে হয়েছে নিজ নিজ ঘরবাড়ি। ছোট ছোট অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে তাদের সম্প্রদায়। তাদের সকলের মধ্যে বেড়ে গেছে এইচআইভি/এইডসের আশংকা। অ্যামনেস্টি তাদের 'লাইভস ব্লোন অ্যাপার্ট' প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, ওই সম্প্রদায়কে অস্থিতিশীল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে যৌন-ত্রাস এবং তাদের মাঝে বপন করা হয়েছে সন্ত্রাস। কলম্বিয়াতে যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলগুলো, সমগ্র শহর ও গ্রামে শাস্তিমূলক নিয়মাবলী (কোড অব কনডাক্ট) প্রয়োগ করার মাধ্যমে, নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার জন্য, শত্রুপক্ষের নারী ও মেয়েদেরকে ধর্ষণ, আহত এবং হত্যা করেছে।

সামরিক কৌশল হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার নতুন কোনো ঘটনা নয়। শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে এর ওপরে তথ্যধারণ শুরু হয়েছে; বিশেষত কঙ্গো, কলম্বিয়া এবং সুদানে, মন্তব্য করেন মিজ সেহগাল। আর যুদ্ধবিগ্রহ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে বেশ কয়েকটি দেশ এই অপরাধকে, যুদ্ধের পরিকল্পিত কৌশল নয় বরং, বিবেচনা করছে নির্দিষ্ট নারীর (কেস টু কেস ভিকটিম) ওপরে পরিচালিত অপরাধ হিসেবে। অনেক দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার কারণে ধর্ষণের অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। আবার অন্য কিছু দেশে নারীরা আক্রমণকারী ধর্ষকদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আবারো কষ্টকর পর্বের মুখোমুখি হতে চায়না। বসনিয়ায় কিছু ঘটনাকে আমলে নিয়েছিল আন্তর্জাতিক আদালত। ১৯৯০ দশকে সে দেশের ফোকা শহর এবং রুয়ান্ডায় মুসলিম মেয়েদেরকে জোর করে যৌন-দাসত্ব করানো হয়। কিন্তু ওইসব কুলাঙ্গার অপরাধীদের একটা বিরাট অংশ, শুধুমাত্র আইনি প্রক্রিয়াগত ঘাটতির কারণে, পার পেয়ে যায় শাস্তি থেকে।

১৯২৮ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালে জাপান কর্তৃক জোর করে যৌন-দাসত্বে নিয়োজিত করা ২ লক্ষ 'কমফোর্ট উইমেন'-দের

প্রতিনিধিরা (সন্তান-সন্ততি) আজও সংগ্রাম করে চলেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য। মিজ সেহগাল বলেন, গোপনে গোপনে কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং পূর্ব তিমুরের নারীদেরকে কঠোরভাবে বাধ্য করা হয়েছে পতিতাবৃত্তিতে যোগ দিতে। আর একজন নারীকে বন্দুকের মুখে ধর্ষণ করা হয়েছে নাকি দখলদার বাহিনী কর্তৃক পাচার করে ঠেলে দেয়া হয়েছে যৌন-দাসত্বে, সেটা সবচেয়ে প্রথমে বিবেচ্য নয়। কারণ, এই যৌন-অত্যাচার শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট নারীটির একান্ত নিজের বিষয় নয় বরং তার সম্প্রদায়ের জন্য বছর বছর ব্যাপী অনাগত ভবিষ্যতের।

অ্যামনেস্টি বলে, উত্তরজীবী বেঁচে থাকা নারীরা ভোগে আবেগময় তীব্র যন্ত্রণা, মানসিক চাপ, শারীরিক ক্ষত, রোগ, সমাজচ্যুতি এবং আরো অনেক ধরনের যাতনা যা তাদের জীবনকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অনেকদিন ধরে নারীর জীবন এবং তার শরীরও যে 'যুদ্ধাহত বা যুদ্ধক্ষেত্র' সে বিষয়টি রয়ে গেছে অজ্ঞাত।

ধর্ষিতার নাজুক অবস্থান এবং গর্ভপাত

আমরা সবাই জানি যে, ইসলামে গর্ভপাত হারাম! কিন্তু, ধর্ষিতা হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলেও কি সে গর্ভপাত করতে পারবে না? সেটা কি তার জন্যও নিষিদ্ধ? যদি নাই হয়, তাহলে তার 'অবৈধ' বাচ্চাটার কি হবে? সে কি তাকে মুসলমান হিসেবেই বড় করবে নাকি বেছে নিবে দত্তকায়ন? দত্তকায়ন কি অনুমোদিত? আর মুসলমানরা কি মুসলমান পিতামাতার জন্ম দেয়া শিশুকে দত্তক নিতে পারবে? আর আপনার কেমন লাগবে এটা জেনে যে আপনি একটা ধর্ষণের ফসল শিশুকে বড় করে তুলছেন? আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া বেশ কঠিন। ধর্ষণের বেশিরভাগই গর্ভধারণ পর্যন্ত পৌঁছায় না। আক্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে যৌন-সন্ত্রাস এবং ফলস্বরূপ রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতার কারণে ভ্রূণ গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। আক্রান্ত নারীর বয়স এবং মাসিক চক্র তাকে সম্ভাব্য অনুর্বর পর্যায়ে রাখতে পারে। যাই হোক না কেন, ধর্ষণ কখনোই পরিপূর্ণ বা পবিত্র যৌনসঙ্গমের বিষয় নয়।

ধর্ষণ বা অবৈধ সঙ্গমের ফলে উদ্ভূত গর্ভধারণ আক্রান্ত নারীটির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ এবং অবিচার। সেজন্যই তার ভ্রূণটিকে পূর্ণতা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা শ্রেয় নয়। যতবার সে তার বাচ্চাটির দিকে তাকাবে ততবার তার মনে পড়বে কিভাবে তার ওপরে সেই পাষণ্ড চালিয়েছিল সন্ত্রাস! এতে শুধু তার ভেতরে বেড়েই চলবে ক্রোধ এবং বাচ্চাটির প্রতি অনাত্মীয়তা।

অন্য প্রেক্ষিতে, না জন্মানো শিশুটি আগ্রাসী নয়। তার উপস্থিতি তার মায়ের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সে যে কোনো রকমের অপরাধ-মুক্ত। ওই ধর্ষকই একমাত্র আগ্রাসী। না জন্মানো শিশুটি তার আক্রান্ত মায়ের মতোই নিরপরাধ।

পরিস্থিতিটি কঠিন, বেদনাহত, আবেগময় এবং একান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বিষয়। এমন অবস্থায় আপনি কি করতেন? 'অনুশাসনের' বৃত্তের বাইরে যেতেন! এমন বিষয় নিয়েতো কতই আলোচনা হয়। আড্ডা জমে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যুক্তি এবং যুক্তি খণ্ডনের প্রতিযোগিতা। যে শিশুকে যথাযথ আদর-ভালবাসা-যত্ন দেবার জন্য আপনি প্রস্তুত নন, তাকে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসা কি বৈধ? ধর্ষিতা হলেতো বাস্তবতার নিরিখে গর্ভপাতকেই বেছে নিতে হবে; গোপনে হলেও। বৈধতা-অবৈধতার বিষয় আড্ডায় স্বাভাবিক হলেও, বাস্তবে নয়।

ধর্ষণপ্রসূত শিশুকে দত্তক হিসেবে দিয়ে দিলেও বড় হয়ে তার জানার অধিকার থাকবে তার উৎস সম্পর্কে। তবে এটাও ঠিক যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হলে এ কথাটি গোপন থাকাই শ্রেয়। প্রকৃতপক্ষে গর্ভপাতের বিষয়টি এক বৈপরীত্যের সংঘাত। শিশুটিকে রেখেও দেয়া যায়, আবার গর্ভপাতও করা যায়। আবেগে ভরপুর আমাদের মন; মানবিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে আমাদের মনে ফুটে ওঠে ফুটফুটে শিশুটির সম্ভাব্য নিষ্পাপ চেহারা। রেখে দেয়া যায় কি! রাষ্ট্রকে নিতে হবে ওই শিশু এবং মায়ের দায়িত্ব; সমাজের নির্যাস নয় তারা আমাদেরই 'আপনজন'!

আর এরকম অসহ্য বেদনার বিষয়ে পুরুষদের নিজ নিজ আসনে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেয়াই শ্রেয়! আক্রান্ত নারীটির নিজের আর তার ভেতরে বেড়ে ওঠা ওই 'পরগাছার' আত্মীয়তার বন্ধনের যন্ত্রণার একশ ভাগের একভাগ অনুভব করতেও অক্ষম আমরা, পুরুষেরা! যাহোক, ইন্টারনেটে একটানা অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ ডট কম ওয়েবসাইটের ওপেন বোর্ড ফোরামে পেয়ে গেলাম এক উপযোগী সাক্ষাৎকার। উত্তরদাতার পরিচয় স্পষ্ট না হলেও, প্রিয়পাঠক, আশাকরি যে এর সারবস্তু আমাদের এই কঠিন বিষয়টি অনুধাবনে অনেকটা সহজ পথ দেখাবে। এছাড়া আমরা আরো দেখব যে মাদার তেরেসার সহায়তায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫,০০০ দত্তকায়িত শিশুর একজন নাজমার প্রতিচিত্র; যাকে পাঠানো হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে [সম্ভবত কানাডা হয়ে]।

প্রশ্ন : [ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী] কোনো মেয়ে যদি ধর্ষিতা হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলেও কি তার জন্য গর্ভপাত করানো হারাম? সেটাও কি নিষিদ্ধ?

উত্তর : অনেক দিন আগে আমি এই বিষয়ে একটা বক্তৃতা শুনেছি। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ সুবহানাতায়ালা একজন ধর্ষিতা মেয়েকে তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে দেয়া অথবা প্রথম ৪০ দিনের মধ্যে নষ্ট করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

প্রশ্ন: দত্তকায়ন কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: নবীজি কর্তৃক জাইদ বিন হারিস (রা:)-কে লালন-পালন করার উদাহরণ রয়েছে। আপনি অন্য কারো বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে তুলতে পারেন কিন্তু সে আপনার নাম ব্যবহার করতে পারবেনা। আইনত সে কখনোই আপনার সন্তান হয়ে যাবে না।

ধর্ষণের ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে এটা গর্ভধারণের ১২০তম দিন পর্যন্ত অনুমোদিত; কেউ বলেন ৪০তম দিন পর্যন্ত। তার মানে এক্ষেত্রে মতের পার্থক্য রয়েছে।

দত্তকায়নের বিষয়ে জায়ী ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন...

দত্তকায়ন অনাথ শিশুদের যত্ন নেয়ার একটা সম্মানজনক ও সঠিক পন্থা বলেই এটা বিবেচিত ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য। কিন্তু দত্তক নেয়া শিশুর পারিবারিক বংশ-পরিচয় পরিবর্তন করা যায়না বা তার জন্মদাতা পিতামাতার নামে রাখা প্রকৃত নাম বদলে দত্তক-গ্রাহী পিতামাতার নামে নাম রাখা যায়না। জন্মদাতা পিতামাতার পরিচয় সবার মাঝে বিদ্যমান রাখার প্রয়োজনে দত্তকায়িত শিশুদের সবসময়েই তাদের প্রকৃত পিতামাতার পরিচয়েই পরিচিত হওয়া উচিত।

"আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের দত্তক নেয়া সন্তানকে তোমাদের সন্তান করে দেননি। সেটা শুধু তোমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা। আর আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাদেরকে তাদের (প্রকৃত) জন্মদাতার নাম ধরে ডাকো। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা আরো সঠিক।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪-৫)

আমার বিশ্বাস যে, যতক্ষণ আপনি সঠিক কাজটি করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এবং যুক্তিসংগত সূত্র অনুযায়ী আপনার মতামত নিরূপণ করেন, বেশিরভাগ সমস্যারই নিকটতম সঠিক উত্তর রয়েছে। তবে এটা (গর্ভপাত) খুবই কঠিন বিষয়। গর্ভপাত একটি আবেগময় ও স্পর্শকাতর বিষয়। জায়ীর মতো মানুষ কর্তৃক "শিশুকে চল্লিশ দিনের মধ্যে মেরে ফেল" বলার মাধ্যমে এটা সহজ হয়ে যায়নি। এ বিষয়ে ইসলামী প্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য আমার কাছে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য-প্রমাণাদি নেই। তবে আমি চেষ্টা করব এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মতামত প্রদান করব। আমি যেসব নারী ধর্ষণের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, গর্ভধারণের মাধ্যমে যাদের স্বাস্থ্য বিপদ-সঙ্কুল হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অসুবিধায় পতিত হয়েছে - তাদের সম্পর্কে কথা বলব। আমি একটা দুঃখজনক ঘটনার বর্ণনা করছি যেখানে গর্ভপাতের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা এবং ফলাফলে ঘটেছে মৃত্যু।

ক.
ধর্ষণ করা হয়েছে এমন কোনো নারীর ক্ষেত্রে, আমি তাকে শুধু গর্ভপাত বেছে নেয়ার কথাই বলতাম না, সেইসঙ্গে আমি তাকে এটা করতে উৎসাহ যোগাতাম। আমরা সমাজের 'ভাল মানুষদেরকে' বলতে শুনি, "উচ্চারণ করার জন্য কি বাজে বিষয়", যে আমাদেরকে ওইসব শিশুদেরকে নিয়েও ভাবতে হবে। একথাকে নাকচ করে দিয়ে আমার বক্তব্য হল, আমরা আসলেই ওইসব শিশুদের সম্পর্কে ভাবতে চলেছি। যে শিশুটি জন্ম নিবে তার কথা ভাবুন; ভাবুন যে, কীভাবে সে তার সত্তার শর্তসমূহের আওতায় আসবে। আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি শিশুই একটি বাড়িতে জন্ম নেবে যেখানে মা-বাবা তাকে ভালবাসবে। আমি মনে করি যে এটাই একটা শিশুর একেবারে ন্যূনতম অধিকার।

কেমন ধরনের জীবন হবে এরকম শিশুর? ধর্ষণের তীব্র মনোযন্ত্রণার প্রভাবে মা হয়তো শিশুটিকে প্রত্যাখ্যান করবে। হয়তো মা প্রসব-উত্তর অবসাদে ভুগতে শুরু করবে যা এক গুরুতর সমস্যা। মায়ের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনহীন শিশুরা বেড়ে উঠবে মানসিক এবং আচরণগত সমস্যা নিয়ে। কেমন হবে মায়ের অনুভূতি? ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম হতে চলা একটি শিশুকে গর্ভে ধারণ করে আছে জেনে? একটি শিশু যার পিতা ধর্ষণ করেছে তাকে? শিশুটি বড় হয়ে কি হবে আর কেমন হবে তার অনুভূতি? এমনতর অপরাধ করতে পারা পুরুষদের জন্ম দেয়ার জন্য সমাজের প্রতি সে অনুভব করবে ক্রোধ। সেই সমাজ যা তার মাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে? অসংখ্য ক্ষেত্রে এসব শিশু বড় হয়ে মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে।

আর এভাবে অনুভব করা বা এরকম মানসিকতার কারণে কেউ কি এসব শিশুদেরকে দোষ দিতে পারবে? এটা জেনে যে তারা জন্মেছে একটা ভয়াবহ অপরাধের ফসল হিসেবে; কারণ, সেসময়ের সেই অপরাধের চিহ্ন বা প্রমাণ তারা। এমন অপরাধ যেখানে কোনো পুরুষ কোনো নারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ করতে পারে চূড়ান্ত অবমাননা। একজন পুরুষ একজন নারীকে ধর্ষণের মাধ্যমে যতটা অপমান করতে পারে ততটা কি অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব? নয় মাসের গর্ভ ধারণ করার বাধ্যবাধকতার কথা ওই মাকে কে বলতে পারে? যার ধর্ষকের সন্তান তারই শরীর থেকে পেয়ে চলেছে জীবন এবং পুষ্টি!

এছাড়া, সমস্যা-সঙ্কুল শিশুর বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমাকে নাজমা নামের একটি বালিকার কথা বলতে দিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিক পিতামাতার কাছে বেড়ে উঠেছে সে। তারা নাজমার যত্ন নিয়েছে একান্ত নিজের বিবেচনা করেই। নাজমা কে? নাজমা কি ছিল? কোথা থেকে এসেছিল সে? নাজমা ছিল মিশ্র সংকর জাতির একটি বালিকা। এখন থেকে

অনেক বছর আগেই আত্মহত্যা করেছে সে; তখন তার বয়স ছিল ষোল। কিন্তু কেন? সমস্যাটি ছিল এরকম। নাজমাও জানতোনা যে, কে সে। খুবই সরল সাধারণ প্রকাশে সে ছিল একজন 'যুদ্ধশিশু'। মাদার তেরেসার সহায়তায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫,০০০ দত্তকায়িত শিশুর একজন ছিল সে। মুক্তিযুদ্ধকালে তিন লাখ ধর্ষিতা নারীর একজন বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল নাজমা। নাজমা তার মাকে ধর্ষণের ফসল। নাজমার 'পিতা' ছিল তার মাকে ধর্ষণ করা অসংখ্য মানুষের (!) মাঝের সম্ভাব্য একজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নাজমাকে তার দত্তক বাবা-মা তাকে দিয়েছিলেন ক্যাথোলিজম। আমাদের অনুরূপ অর্থাৎ ইসলামের মতোই একটি বিশ্বাস যেখানে আত্মহত্যাকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঠিয়ে দেয় অনন্ত শাস্তির নরকে। যদিও নাজমা সেসব বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যেতে সামর্থ্য ছিল এবং তার জৈব-স্বকীয় সংরক্ষণ ক্ষমতাই ছিল তার চালিকা-শক্তি। তবে নাজমা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল কারণ সে জীবনের মুখোমুখি হতে পারেনি। জেনেছিল যে, কীভাবে তার অভ্যুদয় হয়েছিল। ঘটনাচক্রে কীভাবে তার আবির্ভাব তার মাকে দিয়েছে বিপুল বেদনা। কীভাবে এটা তার মায়ের জীবনকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। নাজমাকে যখন তার জন্মের কথা জানানো হয়েছিল তখন সে এটা মেনে নিতে ব্যর্থ হয়। কে ছিল তার মা? তার মা কি বেঁচে আছে? তার মা কি তাকে ঘৃণা করতো? বেঁচে থাকার জন্য তার মা কি একজন পতিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল? নাজমার এতসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই যুদ্ধদিনের সাড়ে সাত কোটি 'বিজয়ী মানুষের'।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই পৃথিবীতে নাজমার মতো আরো অনেক নাজমাই আছে। ঊনিশশ যুদ্ধশিশু একাত্তরে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীদের দত্তক দেয়া হয়েছে বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্যাথলিক দেশে বাঙালি দত্তক সন্তান রয়েছে। তাদের সবারই বয়স এখন বত্রিশ (২০০৪ সালে)। পাকিস্তানের মতো একটি দেশ এবং সেই দেশের নোংরা নেতৃবৃন্দের মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতির বাস্তবিক প্রমাণ এসব তরুণ-তরুণী। এখন আপনি কি বলবেন যে, আমরা ওইসব ভ্রূণকে জন্মানোর অনুমতি দিয়ে করুণা করছি? তারা না জন্মানো পর্যন্ত, মায়ের জীবন এবং তার আবেগময় কুশলাদি অবশ্যই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য বিষয়। (গর্ভপাতের মাধ্যমে) নাজমাকে বাদ দেয়াই কি ভাল হতোনা; প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে পথ চলে শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছে যায় জীবন-সমাপ্তিতে। অন্তত ছোট্ট জীবনের বিপুল কষ্ট-বেদনা থেকে মুক্তি দেয়া যেত তাকে।

এরপরে আমরা দৃষ্টি দিই গর্ভধারণের বিষয়ে। যেখানে মেয়েরা মুখোমুখি হয় স্বাস্থ্য ঝুঁকির এবং এমনকি জীবনেরও। একটোপিক গর্ভধারণের কথাই বিবেচনা

করুন। এক্ষেত্রে একজন মায়ের জীবনের ঝুঁকি থাকে ভয়াবহ রকমের উঁচুমাত্রায়। আমি নিশ্চিত যে একজন পরিপূর্ণ মানুষের জীবনের বিবেচনাটি একটি ভ্রূণ যার চেতনা এখনো আসেনি তার চেয়ে অনেক বেশি করে অগ্রগণ্য। আবার মায়ের গর্ভ-যন্ত্রণার তুলনায় ওই না ফোটা ভ্রূণটিকে কিছুই সহ্য করতে হয়না। অন্যদিকে, অনাগত বাচ্চাটির সফল জন্ম হবে কি হবেনা সে বিবেচনার ওপরে ভিত্তি করে মায়ের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলাও অনুচিত।

এবার আমরা সরল, নির্বোধ এবং অপরিপক্ব কিশোরী-বালিকাদের দিকে নজর দিতে পারি। যারা সম্ভবত, অভিভাবকদের অনাদরে বা দৃষ্টির বাইরে, পরিচালিত হয় 'অতি-আবেগের' মাধ্যমে। জীবনকে উন্মুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় গর্ভধারণে। এদের জন্য সমাজের কোথাও নেই কোনো সহানুভূতি। এটা তাদের প্রাপ্যও নয়। নিজেরাই নিজেদের জন্য ডেকে আনে দুর্গতি। সামান্যতম স্নেহ, সামান্যতম মানসিক আশ্রয় মেলেনা কোথাও। অথচ আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, এটাও সত্য যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা 'নীরব ধর্ষণের' শিকার। যেখানে প্রেম আসে 'মেকী আবরণ' হয়ে। 'যৌনতার' সমাপ্তিতে বীরদর্পে বিদায় নেয় প্রেমিক-প্রবর! আজকের এই পরিপক্ব সময়ে নানা ধরনের গর্ভনিরোধক পন্থা সহজলভ্য হওয়ার পরে হয়তো কোনো অজুহাত খাটেনা। কিন্তু বিশেষত নীরব ধর্ষণের ফলাফলে যে ভ্রুণের জন্ম হয় তার জন্য গর্ভপাতন যুক্তিযুক্ত; নাহলে কী ধরনের শিশুর জন্ম হবে এক্ষেত্রে? ওই ছোট্ট মা কি ধরনের নীড় নিশ্চিত করবে শিশুটির জন্য? এখানে নিয়ম-নীতি বা সামাজিক বিচারের যুক্তি খোঁজার চেয়ে বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিত সম্ভাব্য শিশুটির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বক্তব্য দেয়া যেতে পারে কিন্তু একটা বিষয় চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য যে- "কোনো শিশুরই জন্ম হওয়া উচিত নয় কোনো অস্বাগতিক বা বরণহীন বৈরী বাড়িতে।"

আমার অনুভূতি হল এই যে, ধর্ষণের মাধ্যমে সূচিত হওয়া ভ্রুণের পাতন করাই শ্রেয়। আমরা যদি সৎ হই এবং আমাদের স্বার্থপরতা এবং সংশ্লিষ্ট বিচার-বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে যে উপসংহারে উপনীত হব তা হল - এখানে নারীটিই একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যার রয়েছে আবেগ, একগুচ্ছ কোষের নয়। তার মানে, আমার মতে, একজন পুরুষ (অথবা নারী) যে অন্তঃসত্ত্বা মাকে তার ধর্ষণ-জনিত গর্ভকে জোর করে হলেও চালিয়ে নিতে বাধ্য করে সে নিজেই একজন পিশাচ বা পাষণ্ড। কীভাবে তারা একটি মেয়েকে এ ধরনের ভাগ্য বরণ করে নিতে বলে; সেটা হবে আরেকটি প্রলম্বিত ধর্ষণ - সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে, প্রতিটি পলে পলে।

অতএব প্রিয়পাঠক, আসুন ভাবি দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়া মানুষদের নিয়ে। ওইসব অসহায় নারীদেরকে অপবাদ দিয়ে নিজেরা ভালোমানুষ হয়ে পায়ে কাদা না লাগিয়ে পথচলার কোনো অধিকার নেই আমাদের। কোনো মানুষ যদি মনে করেন যে একজন ধর্ষিতা নারীকে কলঙ্ক দেয়ার অধিকার তার রয়েছে, তাহলে তার ভাবা উচিত যে তাকে যদি নয় মাসের প্রতিটি মুহূর্তে ভাবতে হতো দুর্যোগের কথা এবং এর পরে সারাটা জীবন ধরে, সেক্ষেত্রে তার নিজের কেমন লাগতো!

গর্ভপাতের নৈতিক সঙ্কট

৪ঠা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় শাকিল আহমেদ ইবনে মাহমুদ রচিত এক নিবন্ধে গর্ভপাতের সঙ্কট এবং বেদনাসিক্ত পরিস্থিতি ফুটে ওঠে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রেক্ষিতে। বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে মূল সঙ্কটটি ছিল ধর্মীয় বেড়াজালের আবর্তে। সঙ্কটের একপ্রান্তে ছিল নিস্পাপ শিশুর আবির্ভাব আর অন্যপ্রান্তে অযাচিত সৃষ্টিকে বরণ করার দ্বিধাদ্বন্দ্ব। নিবন্ধের মাধ্যমে বিষয়টি অনেকটা সহজতর হয়েছে। প্রিয়পাঠক, চলুন দৃষ্টি দিই সেখানে।

বেশিরভাগ নারীর জীবনে, গর্ভপাত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টা এক আবেগময় বেদনাবিধুর নৈতিক সঙ্কট। আর বিষয়টার ওপরে মতামতটি জীবনবাদী এবং পছন্দবাদীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে বিভক্ত। ফলে, অত্যন্ত শক্তিশালী আবেগ ছাড়া গর্ভপাত সম্পর্কে আলোচনা করা বেশ কঠিন। আবার স্বল্প পরিসরে সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে একসঙ্গে প্রকাশও করা যায় না।

সকল ধর্মেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের কাছেই দায়বদ্ধ নই, একইসঙ্গে আমাদের সমাজ এবং এছাড়াও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাছেও দায়বদ্ধ। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ বিবেচনা থাকার কারণে, মানব-হত্যার বিরুদ্ধে বাইবেলে রয়েছে প্রচণ্ড বিরোধিতা। বাইবেলে সরাসরিভাবে গর্ভপাত সম্পর্কে কোনোকিছুর উল্লেখ না থাকলেও তবে এটা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলে যেসবের মাধ্যমে উঠে আসে গর্ভপাত। বাইবেল বলে যে, সন্তান জন্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত যৌনসম্পর্কটি বিপরীত লিঙ্গের মধ্যেকার বিবাহিত সম্পর্কে হওয়াই শ্রেয়।

ইহুদী সমাজে, ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের একটি তাওরাত অনুযায়ী, মানবজীবনের প্রতিটি পর্বের জন্য রয়েছে উঁচু ধারণা এবং গর্ভপাত

নিষিদ্ধ। হিন্দু গ্রন্থ গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করেছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিন্দুরা শিশুকে বিবেচনা করে ঈশ্বরের উপহার হিসেবে। মনুসংহিতায় মনু গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করেছে। সেখানে জন্ম না হওয়া ভ্রুণ ধ্বংসরূপে 'শিশুহত্যা'-কে সবচেয়ে বাজে কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগবেদে বাড়ন্ত ভ্রুনকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনাও রয়েছে। হিন্দু আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ শুশ্রুতা-সংহিতায় শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ ভ্রুণের গর্ভপাতকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, অসুস্থতা বা স্বল্পস্থায়ী জীবন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ব জীবনের কুকর্মের ফল। বৌদ্ধ দর্শনমতে, ভ্রুণ থেকে বেড়ে ওঠা জীবন্ত জীবের ক্ষতি করা যায়না এবং একই কারণে অনেক বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে গর্ভপাত একটি অপরাধ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আগে থেকেই ৩/৪ মাস পেরুনোর পর 'নড়াচড়ার' কাল থেকে ভ্রুণকে জীবন্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক বৌদ্ধরাই এই প্রাচীন ধারণার সঙ্গে আধুনিক জীববিজ্ঞানকে সমন্বিত করেছে। জাপানে বৌদ্ধধর্মটি প্রধান ধর্ম হলেও, সেখানে গর্ভপাতের মাত্রা খুবই বেশি; কারণ সেখানে গর্ভপাতকে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মিজুকো কুয়ো নামে গর্ভপাতিত ভ্রুণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা রয়েছে জাপানি বৌদ্ধদের। বিশ্বাস করা হয় যে, গর্ভপাত করা ভ্রুণ বাজে কর্মচক্রের শিকার। প্রকৃত অবস্থাটি হল জাপানি বৌদ্ধদের অননুমোদিত গর্ভপাতটি জাপানি সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত একটি কর্ম। জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি পন্থা হিসেবে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এটা। আবার একইভাবে, স্টেম-সেল গবেষণা এবং ক্লোনিংও শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামে, একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা নিষিদ্ধ। তবে জরুরি ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। কোরানে বলা আছে যে, বাচ্চার লালন-পালন সম্পর্কে চিন্তিত না হওয়ার জন্য; এই বিচারে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। তবে বিষয়টি যখন মায়ের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তখন মায়ের 'জীবন বাঁচানোর' প্রয়োজনে গর্ভপাত করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তটি নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপরে। আইন এবং স্বাস্থ্যগত প্রেক্ষিতে চিকিৎসকের পরামর্শ এবং দেশের আইন মেনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্রেয়। ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষিতটি মূল বিবেচ্য হলে গর্ভপাত বর্জনীয়। আবার মানবাধিকার এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিবেচনাটি মুখ্য হলে একজন নারীর নিজেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত; অর্থাৎ সে গর্ভপাতও বেছে নিতে পারে আবার বাচ্চাটিকে জন্ম দিয়ে তার দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারে।

একজন বীরাঙ্গনা
স্থানঃ ময়মনসিংহ ছবিঃ নাইবুদ্দিন আহমেদ

সকল নারীই...
প্রয়োজনে হয়ে ওঠে প্রীতিলতা!

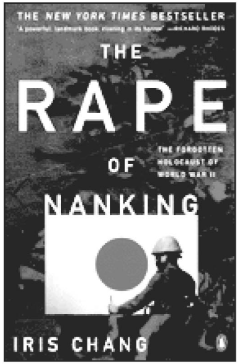

নানকিংয়ের বীভৎসতার উদ্ধত প্রকাশ...
আইরিস চ্যাং [লেখিকা]

পিটার ট্যাশেল
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক
বিশ্ব-মানবাধিকারের উচ্চারণে
নিরলস কলমসৈনিক

অধ্যায় - ৫
বিশ্বের যুদ্ধশিশু

দেশে দেশে যুদ্ধশিশু

যুদ্ধশিশু বলতে সাধারণত বিদেশি আগ্রাসী বা হানাদার সামরিক সদস্যের ঔরসে এবং স্থানীয় মায়ের গর্ভজাত শিশুকে বোঝানো হয়ে থাকে। দখলদার সৈন্যদের সহযোগীদের (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জামাত-রাজাকার বা দালাল চক্র) মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদেরকেও নির্দেশ করে এই শব্দ। বিদেশি সৈন্যের মাধ্যমে এভাবে কোনো শিশুপ্রাপ্তি ঐতিহাসিকভাবে একটি ক্ষমার অযোগ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। অন্যদিকে, স্থানীয় জন্মদাত্রী মা সবসময়ে তার নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের বিচ্ছিন্ন একজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

পূর্বকথা: যেসব শিশুদের পিতামাতার ন্যূনতম একজন দখলদার সেনাবাহিনীর সদস্য বা যাদের পিতারা বা পিতামাতারা শত্রু সৈন্যের সহযোগী (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জামাত-রাজাকার বা দালাল চক্র) তারা তাদের সংশ্লিষ্ট পিতামাতাদের যে কোনো রকমের যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে মুক্ত। তবুও এসব শিশুদেরকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হওয়া তাদের সংশ্লিষ্ট পিতামাতাদের কুকর্ম/অপরাধের কারণে নিজেদেরকেও অপরাধী মনে করতে হয়েছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণ পেরুনো বা বড় হওয়ার পরে এসব শিশুদের অনেকেই দোষ ও লজ্জা অনুভব করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জন্ম নেয়া শিশুরা এরকম এক উদাহরণ। এসব শিশুরা দাবি করেছে যে, যখন তারা তাদের পরিচয় সরকারিভাবে প্রকাশ করেছে, তখন তাদের এই পরিচয় নিয়ে বসবাস করতে হয়েছে এক ধরনের আন্ত-নির্বাসনে (নিজ দেশে পরবাসী!)। ১৯৮৭ সালে 'বর্ন গিল্টি' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেটায় উল্লেখিত হয় ১২টি যুদ্ধশিশুর সাক্ষাৎকার যাদের পিতা বা মাতা নরওয়েতে জার্মান হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা (যেমনটা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে করেছে দালালরা) করেছিল। তবে ওই ১২ জনের মধ্যের ১টি মেয়ে বেন্তে ব্লেহ্‌র অস্বীকার করে বইয়ে উল্লেখিত তার 'পরিচয়হীনতা'। এরপরে প্রথম কোনো নাজি শিশুর (নাজি সৈন্যের ঔরসে) আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় নরওয়েতে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ও আইসটাইন ইজেন রচিত বইটির নাম 'দি বয় ফ্রম গিমলে'।

আমেরাশিয়ান : এশীয় এবং এশিয়ায় হানাদার মার্কিন সেনাদের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে প্রায় ১ লক্ষ যুদ্ধশিশু। এসব শিশুর বেশিরভাগই জন্ম নিয়েছে প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরীয় যুদ্ধ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে। আবার এসব ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটিতে, যুদ্ধকালে নয় বরং, 'শান্ত-স্বাভাবিক সময়ে'। এসব শিশুকেই কথাশিল্পী পার্ল এস বাক অভিহিত করেছেন আমেরাশিয়ান হিসেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধশিশু : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধশিশুরা সংখ্যায় ছিল প্রায় কয়েক লক্ষের কোঠায়। জন্ম হয়েছিল জার্মান এবং মিত্র বাহিনীর সেনাদের মাধ্যমে। সবচেয়ে পরিচিত দলটি হল নরওয়েজীয় যুদ্ধশিশু; কারণ এদের বেশিরভাগই জার্মান কর্তৃক লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছিল। এসব তথ্যও রয়েছে মোটামুটিভাবে অক্ষত। জার্মান লেবেন্সবর্ন শব্দের অর্থ 'জীবনের ঝরণা'। এটা ছিল একটা নাজি সংস্থা। অ্যাডলফ হিটলার এবং নাজি বাহিনীর অধীনে একটা বড় আকারের নাজি সামরিক সংস্থা 'এসএস বা শুজস্ট্যাফেল অর্থাৎ প্রোটেকটিভ স্কোয়াড্রনের' নেতা হাইনরিখ হিমলারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা। এসএস সদস্যদের স্ত্রী এবং অবিবাহিত মাদেরকে মাতৃকালীন আশ্রয় এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে লেবেন্সবর্ন। শিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করে এরা। ১৯৩৫ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম এবং উত্তর ইউরোপে।

যুদ্ধশিশু ও মায়েদের স্বাভাবিক পরিণতি : ঐতিহাসিকভাবে হানাদার বাহিনীর কোনো সেনা সদস্যের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়াকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সম্ভব হলে, অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া মেয়েরা, আগত শিশুটির পিতা যে একজন বিদেশি সৈন্য, সম্ভব হলে, সেকথা লুকিয়ে রাখার জন্য প্রায়শ চেষ্টা করেছে। তাদের ভাগ্যের পরিণতি হিসেবে কয়েকটা পথ বেছে নেয়ার উপায় ছিল:

১. স্থানীয় একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া যে তার সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
২. পিতার পরিচয় 'অজ্ঞাত' দাবি করে একাকি মা হিসেবে সন্তানকে লালন-পালন করা।

৩. সম্পর্ককে স্বীকার করে, একাকি মা হিসেবে সন্তানকে লালন-পালন করা।
৪. সম্পর্ককে স্বীকার করে, হানাদার বাহিনীর কল্যাণ সহায়তা গ্রহণ করা (লেবেন্সবর্ন দ্রষ্টব্য)
৫. শিশুকে অনাথ আশ্রমে বা দত্তকায়নে দিয়ে দেয়া।
৬. জার্মানিতে অভিবাসন করা এবং জার্মান নাগরিকত্ব দাবি করা।
৭. অবৈধ গর্ভপাত করা।

যুদ্ধের পরে এসব মা ও শিশুরা স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়। সেই প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃতি ছিল পুরো ইউরোপে। আবার কিছু নারী ও শিশুকে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় যা ছিল ভয়ঙ্কর; ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাচার এবং ভিনদেশে বিতাড়ন। এসব বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার রূপ ছিল এরকম:

১. অপনামে ডাকা বা গালি দেয়া। 'জার্মান হোর' (পতিতা) এবং 'জার্মান কিড' (জারজ বাচ্চা) ছিল মামুলি উপমা।
২. স্থানীয় সমাজ এবং স্কুল থেকে আলাদা করে দেয়া বা ঝামেলা করা।
৩. কর্মচ্যুতি।
৪. মায়ের মাথা মুড়িয়ে দেয়া! যুদ্ধের প্রভাব হিসেবে এটা ঘটতো প্রায়শ।
৫. অস্থায়ী ভিত্তিতে কোনো আবদ্ধ এলাকা বা অন্তর্বর্তীকালীন শিবিরে অবস্থান করানো।

যদিও এসব প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধের ঠিক পরপর, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট বিরূপ মনোভাব টিকে থাকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত।

নরওয়েতে জার্মান সেনাদের সন্তান : ১৯৪০ সালে জার্মান সৈন্যরা আক্রমণ করে নরওয়ে। দেশটি দখল করে রাখে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সেখানে জার্মান সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭২ হাজারে। নিরূপিত হয়েছে যে অধিকৃত সময়ে জার্মান পিতা এবং নরওয়েজীয় মায়ের মাধ্যমে ১০ থেকে ১২ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে। এছাড়াও, কয়েক হাজার নরওয়েজীয় জার্মান সেনাদের সাহায্য বা দালালি করেছে। নাজি মতবাদ অনুসারে নরওয়েজীয়দেরকে বিবেচনা করা হতো খাঁটি আর্য হিসেবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ তাদের সেনাদের জন্য নরওয়েজীয় মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। পূর্ব ইউরোপের মতো অন্যান্য দখলকৃত এলাকায় এ ধরনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল কারণ নাজি দৃষ্টিভঙ্গিতে স্লাভরা নীচু জাতের! কি বিকৃত এবং বিচিত্র জাত্যানুভূতি!

লেবেন্সবর্ন কার্যক্রম : তৃতীয় রাইখের বর্ণগত বংশধারা বজায় রাখার জন্য নাজি নেতা হাইনরিখ হিমলারের গৃহীত কয়েকটি কার্যক্রমের একটি হল এই লেবেন্সবর্ন কার্যক্রম। প্রধানত এর মাধ্যমে বর্ণগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পিতামাতা এবং শিশুদের কল্যাণে কাজ করা হয়েছে।

জার্মান আইন (হিটলার ভেরোডনাং, জুলাই ২৮, ১৯৪২) অনুযায়ী জার্মান সেনা এবং নরওয়েজীয় মায়েদের সন্তানদের সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পালন করার জন্য ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নরওয়ের স্থানীয় লেবেন্সবর্ন কার্যালয় 'অ্যাবটেলাং লেবেন্সবর্ন'। এই সংস্থার আওতায় পরিচালিত হয়েছে বেশ কয়েকটি হোমস বা আশ্রয়কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা শিশুর জন্ম দিতে পেরেছে। যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়হীন নারীদের স্থায়ী আবাসনের সুবিধাও প্রদান করে এসব কেন্দ্র। এছাড়াও, জার্মান পিতাদের পক্ষে শিশুদের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, দাঁতের চিকিৎসা এবং পরিবহণ ভাতা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাও দিয়েছে।

সর্বমোট ৯ থেকে ১৫টি লেবেন্সবর্ন হোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মান পিতা এবং নরওয়েজীয় মায়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়া উল্লেখিত ১০ থেকে ১২ হাজার শিশুর ৮ হাজার শিশুকে 'অ্যাবটেলাং লেবেন্সবর্ন' কেন্দ্রে নিবন্ধিত করা হয়েছিল। এদের মধ্যেকার ৪ হাজার শিশুর পিতার পরিচয় জ্ঞাত ছিল।

যুদ্ধ চলাকালে এবং এর পরে, এসব শিশুকে নরওয়েজীয়রা সাধারণভাবে টিস্কেরাঙ্গার বলে ডাকতো; যার অর্থ জামান-কিড বা ক্রাউট কিড– একটি অপমানকর শব্দ। যুদ্ধোত্তর সময়ে এসব অপমান বা দুর্ব্যবহারকে স্বীকার করে নিয়ে আরো বেশি কৌশলী শব্দ যুদ্ধশিশু প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে সর্বজনীনভাবে এটা বিশ্বব্যাপী গৃহীত শব্দ।

যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে: যুদ্ধের পরে সাধারণ জনগণের মধ্যেকার বিশেষত যুদ্ধবিরোধী অংশ, এসব শিশু ও মাদেরকে সমাজচ্যুত বলে বিবেচনা করতো। অবৈধ উৎসের কারণে, এসব শিশু ও মাদেরকে আলাদা হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনেক যুদ্ধশিশুকে অন্যান্য ছোটরা এবং এমনকি কখনো কখনো বড়রাও আজেবাজে ভাষায় কথা বলতো। যুদ্ধের ঠিক পরপরই, ১৪ হাজার নারীকে গ্রেফতার করা হয়; যাদের ৫ হাজারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে, প্রায় দেড় বছর ধরে জোরপূর্বক শ্রম-কেন্দ্রে রাখা হয়। সেখানে তাদের মাথার চুল কামিয়ে দেয়া হয়, শারীরিকভাবে মারধর করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয়। সুইডেনের সংবাদপত্র ড্যাগেন্স নিহেটারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে

যুদ্ধশিশুরা জানায় যে, বার্জেনের একটা অনাথ-আশ্রমে ছোট ছোট শিশুদেরকে জোর করে সড়কে মার্চ করানো হতো যেন স্থানীয় মানুষেরা তাদেরকে চাবুক মারতে পারে এবং তাদের দিকে থুতু নিক্ষেপ করতে পারে!

১৯৪৫ সালে সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত এক জরীপে, কাউন্টিগুলোর এক-তৃতীয়াংশের স্থানীয় সরকারেরা যুদ্ধশিশুদের প্রতি তাদের প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে। একই বছরে, সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়, ওইসব মা এবং শিশুদেরকে তাদের নিজ নিজ পিতার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা যাচাই করে; কিন্তু পরে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

যুদ্ধের পরে তখনো লেবেন্সবর্ন হোমে বসবাস করা ৫০০ শিশুকে, হোম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, হোম চলে যেতে হয়। কিছু শিশুকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নেয়া হয় কারণ তাদের চারপাশে ছিল কঠিন আইন, অপর্যাপ্ত শিক্ষা এবং অপমান। ১৯৪৬ সালে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এবং দত্তকায়নের ব্যর্থ চেষ্টার পরে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২০টি শিশু স্থান পায় মানসিক হাসপাতালে! সেখানেই অনেককে পার করতে হয় তাদের ১৮তম জন্মদিন। নরওয়েজীয় সরকার ৮ হাজার শিশুকে তাদের মাসহ জোর করে অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরণেরও পরিকল্পনা নিয়েছিল।

আর্থিক এবং আইনগত বিষয়াবলী : ১৯৫০ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে নরওয়েজীয় সরকারের পক্ষে পশ্চিম জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে বসবাসকারী পিতাদের কাছ থেকে নরওয়েতে বসবাসকারী তাদের যুদ্ধশিশুদের জন্য সহায়তা আদায় করা সম্ভব হয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চলে এই আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ। পূর্ব জার্মানির পিতাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ সংরক্ষিত হিসাবে রেখে দেয়া হয় ১৯৭৫ সালে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়া পর্যন্ত।

কিছুসংখ্যক যুদ্ধশিশু তাদের প্রতি প্রদর্শন করা বাজে ব্যবহারের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা চালায়। বিষয়টিকে তারা দাবি করে একটি জেনোসাইড সংঘটনের প্রয়াসরূপে। ১৯৯৯ সালে ১২২ জন যুদ্ধশিশু আদালতে যায় ওই দাবি নিয়ে। যদিও মাত্র ৭ জন আর্জিতে স্বাক্ষর করেছিল, সেটা ছিল সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাপ্তি পরিমাপ করার একটা পরীক্ষার চেষ্টা। সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতার কারণে আদালত ওই দাবিকে নাকচ করে দেয়।

যাহোক, নরওয়ের একটি বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় যেসব নাগরিকেরা, রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণে, অবহেলা বা দুর্ব্যবহারের শিকার হয় তারা 'সাধারণ ক্ষতিপূরণের' জন্য আবেদন করতে পারে। শুধুমাত্র সামান্য অসুবিধা ভোগ করা

যুদ্ধশিশুদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০০৪ সালে ওই ক্ষতিপূরণ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হয়। 'ভয়-ভীতির' ক্ষেত্রে মৌলিক ক্ষতিপূরণের হার ছিল ২০ হাজার নরওয়েজীয় ক্রোনার (৩ হাজার ডলার)। 'দুর্ব্যবহার বা অপমানের' প্রমাণ প্রদর্শন সাপেক্ষে হার ছিল ২০০ হাজার নরওয়েজীয় ক্রোনার (৩০ হাজার ডলার)।

স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত 'ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটসে' ১৫৮ জন যুদ্ধশিশুর মামলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০৭ সালের ৮ই মার্চে [চূড়ান্ত ফলাফল অপেক্ষমাণ]। ওই যুদ্ধশিশুদের দাবি প্রতিটি পরিকল্পিত অত্যাচারের বিপরীতে ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার (১ লাখ থেকে ৪ লাখ ডলার)। নরওয়েজীয় সরকার মামলার দাবিকৃত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে।

সত্যতা স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা: মধ্য-আশির দশক থেকে যুদ্ধশিশুদের অবস্থা সম্পর্কে সবাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এবং সরকার তার অবহেলার কথা স্বীকার করে। ২০০০ সালের নিউ ইয়ার ইভের বক্তৃতায় নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণ্যে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বর্তমানে, বড় হয়ে, লেবেন্সবর্নের প্রাক্তন ১৫০ জন যুদ্ধশিশু, তাদেরকে যথাযথভাবে সুরক্ষা প্রদান করতে না পারা এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য, নরওয়েজীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করেছে।

ডেনমার্কে জার্মান সেনাদের যুদ্ধশিশু: ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে ডেনমার্ক দখল করে রেখেছিল জার্মানি। জার্মান সেনাদের জন্য ড্যানিশ মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি ছিল। নিরূপিত হয়েছে যে, দখলকালে বা তার পরপরই, জার্মান পিতা এবং ড্যানিশ মায়েদের মাধ্যমে ৬ থেকে ৮ হাজার যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছে। ড্যানিশ সরকারের ধারণ করা নথিপত্রে ৫,৫৭৯টি যুদ্ধশিশুর তথ্য রয়েছে। ১৯৯৯ সালে, ড্যানিশ সরকার এদেরকে নিজ নিজ পিতার সংশ্লিষ্ট তথ্যের আর্কাইভে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির জন্য দেশের স্বাভাবিক ৮০ বছর মেয়াদী গোপনীয়তার বাধ্যবাধ্যকতা থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জার্মান সেনাদের স্থানের পরে, সোভিয়েত, মার্কিন ও বৃটিশ সেনাদের মাধ্যমেও ডেনমার্কে জন্ম হয়েছে যুদ্ধশিশুর। তবে সেই সংখ্যা অজ্ঞাত।

ফ্রান্সে জার্মান সেনাদের যুদ্ধশিশু: সঠিকভাবে কতজন যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তা অজ্ঞাত। তবে নিরূপিত হয়েছে যে এই সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে ২ লাখের মাঝে। তবে নিশ্চিতভাবে তথ্যভুক্ত আছে যে, যুদ্ধোত্তর সময়ে ২৬ হাজার

মেয়েকে, জার্মান সেনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কারণে শাস্তি প্রদান করা হয়। দখল করার শুরুতে নাজি রাজত্বে জার্মান সেনাদের জন্য ফ্রেঞ্চ মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার নিষিদ্ধ ছিল। তবে, এই বিধিনিষেধ আরোপ করাটা কঠিন হয়ে ওঠায় সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে নমনীয় নীতি গৃহীত হয়। ডেনমার্ক এবং নরওয়েতে এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অনুসরণ করা হয়, কিন্তু পূর্ব ইউরোপে এ বিষয়ে কঠিন নীতি গৃহীত হয়। নীতির এই পার্থক্যের কারণ ছিল বর্ণগত বিভেদ-তত্ত্ব।

গুটিকয়েক যেসব দেশে জার্মান সেনাদের জন্য স্থানীয় মেয়েদের সংস্পর্শে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে নেদারল্যান্ড অন্যতম। ডাচ ইন্সটিটিউট অব ওয়ার ডকুমেন্টেশন প্রাথমিকভাবে নিরূপণ করেছিল যে, দখল বা আগ্রাসনকালে জার্মান সেনাদের ঔরসে প্রায় ১০ হাজার যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিককালে জার্মান ওয়েহ্রম্যাখ্টের [১৯৩৫-১৯৪৫ সময়ের জার্মান সশস্ত্র সেনাদের নাম] ধারণকৃত তথ্য-আর্কাইভের ভিত্তিতে নিরূপণ করা যায় যে, ওই সংখ্যা হবে ৫০ হাজারেরও বেশি!

জার্মানিতে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধশিশুরা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বেশ কয়েক বছর ধরে জার্মানিতে অবস্থান করেছিল মিত্রবাহিনী। মারিয়া হোন রচিত গ্রন্থ 'জিআইস্ অ্যান্ড ফ্রাঁইলেইন্স'-এর সূত্রে জানা যায় যে ১৯৪৫-৫৫ সাল সময়ে মিত্রবাহিনীর ঔরসে জন্ম নিয়েছিল ৬৬ হাজার যুদ্ধশিশু।

মার্কিন ঔরসে	:	৩৬,৩৩৪
ফ্রেঞ্চ ঔরসে	:	১০,১৮৮
বৃটিশ ঔরসে	:	৮,৩৯৭
বেলজিয়ান ঔরসে	:	১,৭৬৭
অন্যান্য/অজ্ঞাত ঔরসে	:	৬,৮২৯

'ডেঞ্জারাস লিয়াজোঁ: দি অ্যান্টি-ফ্র্যাটারনাইজেশন মুভমেন্ট ইন দ্য ইউএস অকুপেশন জোনস অব জার্মানি অ্যান্ড অস্ট্রিয়া, ১৯৪৫-১৯৪৮'-এ পেরি বিডিসকোম্বের সূত্রে জানা যায় যে, জার্মানদের আত্মসমর্পণ করার পরের দশ বছরে মার্কিন পিতাদের মাধ্যমে ৩৭ হাজার যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছিল। জার্মান এবং অস্ট্রীয় মেয়েদের সঙ্গে দখলদার মার্কিন সেনাদের মেলামেশাকে স্থানীয় জনগণ সন্দেহের চোখে দেখতো। তারা ভয় পেত যে, মার্কিন সেনারা স্থানীয় মেয়েদেরকে গর্ভবতী করে ফেলবে এবং সন্তানদেরকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে দিয়ে দেশত্যাগ করবে। তাদের আশঙ্কা আংশিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

উল্লেখিত ৩৭ হাজার যুদ্ধশিশুর সিংহভাগই স্থানীয় সেবামূলক সংস্থার পোষ্যে পরিণত হয়। আফ্রো-মার্কিন পিতাদের ঔরসে জন্ম নেয়া যেসব শিশুকে কখনোই দত্তক দেয়া (সম্ভব) হয়নি বিশেষত সেসব শিশুসহ বেশিরভাগ শিশুকে রাষ্ট্রের পোষ্য হিসেবে থাকতে হয় দীর্ঘদিন।

ইউরোপে কানাডীয় যুদ্ধশিশু: ১৯৩৯ সালে, বৃটেন কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এক সপ্তাহ পরে, কানাডাও যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধকালে কানাডীয় বাহিনী ইটালী এবং নরম্যান্ডি দুই স্থানেই মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলে যুদ্ধে অংশ নেয়। ইউরোপ মহাদেশে আগ্রাসনের আগে উল্লেখজনক সংখ্যায় কানাডীয় সেনা অবস্থান করছিল বৃটেনে। সর্বমোট এগারো মিলিয়ন (এক কোটি দশ লক্ষ) কানাডীয় সেনা, ইউরোপ এবং প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

বৃটেনে অবস্থানকারী কানাডীয় সেনাদের ঔরসে এবং বৃটিশ মায়েদের গর্ভে জন্ম হয় প্রায় ২২ হাজার যুদ্ধশিশুর। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে যেখানে কানাডীয় সেনারা অবস্থান করেছে, সেখানে জন্ম নিয়েছে যুদ্ধশিশু; বেলজিয়াম এবং অন্যান্য স্থানে স্বল্পসংখ্যক-সহ নেদারল্যান্ডে যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ছিল ৬ হাজার।

ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন আইডেন্টিটি প্রজেক্ট ২০০১

২০০০ সালের জুন মাসে স্টেইন উগেলভিক লারসেন ও এলনা জনসেন, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ শিশু নিবন্ধনের বিষয়টি উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে, নরওয়ের বার্জেন শহরের তৎকালীন মেয়র ইংমার লিওন্স এবং বার্জেন সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ শিশুদেরকে তাদের নিজ নিজ বাবা-মার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার জন্য পথ খুঁজে বের করা। এছাড়াও তাদের ভাবনায় ছিল - যুদ্ধে বাবা-মা 'শত্রুপক্ষে' থাকার কারণে অরক্ষিত শিশুদেরকে সুরক্ষা ও সাহায্য প্রদান করা। এসব কাজের পন্থা নির্ধারিত হয়েছিল এভাবে: নিরাপদ ও দক্ষভাবে যুদ্ধ ও আপদকালীন সময়ের পরপরই দ্রুততার সঙ্গে আন্তর্জাতিক দলগুলোকে শিশুদের নিবন্ধন এবং তাদের বাবা-মার পরিচয় লিপিবদ্ধ করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের বাস্তবতার ওপরে ৫ মাস ধরে চলে অনুসন্ধান। একই সময়ে ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন আইডেন্টিটি প্রজেক্ট গঠিত হয়:

স্টেইন উগেলভিক লারসেন	-	চেয়ারম্যান
এলনা জনসেন	-	ওয়ার বেবী
সিরি গ্লোপেন	-	চেয়ারম্যান, মিশেলসেন ইন্সটিটিউট অব হিউম্যান রাইটস
আর্নি মাইকেল ল্যাড্রো	-	চিফ কমিশনার অফিস, বার্জেন শহর
স্ভিরি হোয়ি	-	চিফ কমিশনার অফিস, বার্জেন শহর
ম্যাগনে রাউন্ডালেন	-	সেন্টার ফর ক্রাইসিস সাইকোলজি
হেলগে বোমান	-	হকল্যান্ড স্কাইহুস/ইউআইবি
মর্টেন কুটশেরা	-	এগিল র‍্যাফটো হিউম্যান রাইটস হাউজ

প্রকল্পের আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করে যুদ্ধের পরে প্রভাবিত/আক্রান্ত সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করে সাহায্য নিশ্চিত করা হবে।

যুদ্ধ শিশুর সংজ্ঞা: এই প্রকল্পে 'যুদ্ধ শিশু' বলতে বোঝানো হয়েছে যে শিশুর পিতা-মাতার একজন সেনা বা শান্তিরক্ষা বাহিনী সংশ্লিষ্ট এবং অন্যজন স্থানীয় নাগরিক। সংঘটিত পটভূমির প্রভাবে এসব শিশুদের কলঙ্কই এখানে মুখ্য। শিশুদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাবে পার্থক্য থাকতে পারে। কিছু শিশুকে সমাজের বাইরে প্রেরণ করা হতে পারে; অন্যদেরকে সমাজের ভেতরেও নেয়া হতে পারে। কেউ কেউ মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে আবার অন্যদের এরকম সমস্যা নাও হতে পারে।

প্রকল্পের নির্দেশনামা: প্রকল্পটি নীচে উল্লেখ করা শিশুদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে:

১. বিদেশী সৈন্য, শান্তিরক্ষী বাহিনী বা মিত্র বাহিনীর সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কের [অগ্রহণযোগ্য] মাধ্যমে জন্ম নেয়া কালিমাযুক্ত শিশু।

২. রণকৌশলের প্রয়োজনে যৌন-সন্ত্রাস বা ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশু।

প্রকল্পটির সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় 'কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড'। কনভেনশনে বলা হয়েছে যে, সকল শিশুরই পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিচয় সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে এবং তাদেরকে নিজ নিজ বাবা-মা থেকে আলাদা করা যাবে না।

কারা যুদ্ধশিশু? : এই প্রকল্পের অভিপ্রায় হল, যুদ্ধরত দুই বিপরীত পক্ষে অবস্থানকারী পিতামাতার শিশু বা বড় হওয়ার পরে যাদের পিতামাতা তাদেরকে

কালিমাযুক্ত করে সেসব শিশুদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরেই সাধারণত শুরু হয় এসব শিশুদের দুঃখ-কষ্ট। প্রতিটি যুদ্ধে দেখা যায়, স্থানীয় নারী ও সেনাদের মেলামেশার ফলে জন্ম নেয় শিশু। সৈন্যকে বিবেচনা করা হয় শত্রু বা শত্রু-সহযোগী হিসেবে। বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে এসব শিশুদের সবারই সমস্যা প্রায়শ একই রকমের।

দুই দল বড় হওয়া শিশু এই বিষয়টির উত্থাপনে সোচ্চার হয়েছে। প্রথম দলে রয়েছে মার্কিন ও কানাডীয় সেনা কর্তৃক ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে জন্ম নেয়া শিশু। অন্য দলে রয়েছে জার্মান সেনাদের ঔরসজাত নরওয়েজিয়ান শিশু। দুটি দলই অনুরূপ। দুই দলকেই মুখোমুখি বিভেদ এবং কলঙ্কের হতে হয়েছে। দুই দলকেই নিজ নিজ বাবাকে খুঁজে বের করার জন্য অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করা মার্কিন সেনাদের ঔরসে জন্ম নেয়া আরেক দল শিশুও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এই দলটিই সংখ্যায় সম্ভবত বৃহত্তম। প্রতিবেশী দেশগুলোতে জন্ম নেয়া শিশুদেরকে বিবেচনায় নিলে এই সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০।

যুদ্ধশিশুর সংখ্যা কত?: আমরা কখনোই জানতে পারব না যে মোট কতজন শিশু যুদ্ধে আলাদা হওয়া বাবা-মাকে দেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর ইউরোপে হানাদার জার্মান সেনা কর্তৃক জন্ম দেয়া শিশুদের সংখ্যা হাজার হাজার। কোনো কোনো পরিসংখ্যানে ভিয়েতনামে আমেরিকান/এশিয়ান [আমেরাশিয়ান] শিশুদের সংখ্যা ১ লাখেরও বেশি।

নীচে উল্লেখ করা সংখ্যাগুলো ন্যূনতম হিসেবে পরিসংখ্যায়িত। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে:

সময়	দেশ	যুদ্ধশিশুর সংখ্যা
১৯৭৫-১৯৯৯	পূর্ব তিমুর	কয়েকশ
১৯৯৭-১৯৯৯	সুদান	অপহৃত মেয়েদের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে যুদ্ধশিশু
১৯৯০-১৯৯৮	লাইবেরিয়া	২৫,০০০
১৯৯২	ক্যাম্বোডিয়া	কয়েকশ (জাতিসংঘের সেনা/প্রশাসনিক কমকর্তাদের মাধ্যমে)
১৯৯৩	রুয়ান্ডা	২,০০০-৫,০০০
১৯৯২	বসনিয়া	৮,০০০ গর্ভধারণ; জন্ম নিয়েছে ৪,০০০ শিশু
১৯৮০-২০০১	তুরস্ক/কুর্দিস্তান	কয়েকশ

১৯৪৮-২০০১	মায়ানমার	কয়েকশ
১৯৮০	ইরান/ইরাক	কয়েক হাজার
১৯৬৫-১৯৭৫	ভিয়েতনাম	৪০,০০০
১৯৬৫-১৯৮২	ফিলিপাইন	৫২,০০০
১৯৭২	বাংলাদেশ	২৫,০০০ (পাকিস্তানি সেনাদের মাধ্যমে)
১৯৬৫	কোরিয়া	কয়েক হাজার (মার্কিন সেনাদের মাধ্যমে)
১৯৪০-১৯৪৫	কোরিয়া	কয়েক হাজার (কমফোর্ট উইমেন-দের গর্ভে)
১৯৪০-১৯৪৫	নরওয়ে	১২,০০০
১৯৪১-১৯৪৫	ফ্র্যাংক্রির্কে	৮০,০০০
১৯৪১-১৯৪৫	নেদারল্যান্ড	১০,০০০-৫০,০০০
১৯৩৯-১৯৪৬	নেদারল্যান্ড	৬,০০০ (কানাডীয় ঔরসজাত)
১৯৪৪-১৯৪৯	যুক্তরাজ্য	২০,০০০ (মার্কিন ঔরসজাত)
১৯৩৯-১৯৪৫	পোল্যান্ড	অজ্ঞাত
১৯৪২-১৯৪৫	রাশিয়া	অজ্ঞাত
১৯৩৯-১৯৫০	ইউক্রেন	অজ্ঞাত
১৯৪৪-১৯৪৯	বৃটিশ/কানাডীয়	৩০,০০০

এই পরিমিতি অনুযায়ী মানব সভ্যতায় এ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে ৩ লাখেরও বেশি যুদ্ধশিশু; প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কয়েক বছরে বিশ্ব দেখেছে অসংখ্য সশস্ত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শান্তিরক্ষা কার্যক্রম। ফলে, ৫ লক্ষ বা সম্ভবত ১০ লক্ষাধিক যুদ্ধশিশু জন্ম নিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এ মুহূর্তে সারাবিশ্বে বেঁচে থাকা যুদ্ধশিশুর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ [সূত্রঃ কাই গ্রেগের 'দি ওয়ার চিলড্রেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক প্রতিবেদন; ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন আইডেন্টিটি প্রজেক্ট; বার্জেন, নরওয়ে, ২০০১]

যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলের যুদ্ধশিশুদের প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি

উপক্রমণিকা: যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব পাবলিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পরিচালনা করেছে "প্রোটেকটিং চিলড্রেন বর্ন অফ সেক্সুয়্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন ইন কনফ্লিক্ট জোনস: এক্সিসটিং প্র্যাকটিস অ্যান্ড নলেজ গ্যাপস" শীর্ষক এক প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালক ছিলেন যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক চার্লি কার্পেন্টার। সঙ্গে পরামর্শক হিসেবে ছিলেন কাই গ্রেগ, ডোনা শার্কে এবং জ্যুলিয়া বালদি। গবেষণায় সহকারী হিসেবে ছিলেন রবিন হুইলার এবং বেটসি জোস-থোটা। তাদের এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বসনিয়া-হারজেগোভিনা, পূর্ব তিমুর এবং দারফুরের করুণ তবে কঠিন সত্যরূপ। আর আমরাও অনুধাবন করতে পারি যে যুদ্ধশিশুর সমস্যা সমাধানে শুধু বাংলাদেশকেই নয়, বরং অন্যান্য দেশকেও কীভাবে সামাল দিতে হয়েছে প্রায় একই ধরনের কঠিন সময়।

যুদ্ধাক্রান্ত এলাকায় যৌন সন্ত্রাস ঘটে ব্যাপকভাবে। ফলে জন্ম নেয় শিশু। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বিগত এক দশকেই (১৯৯৫-২০০৫) গণধর্ষণ এবং যৌনসন্ত্রাসে জন্ম নিয়েছে কয়েক হাজার শিশু। জন্ম উৎসের কারণে এসব যুদ্ধশিশুকে পোহাতে হয় গভীর সামাজিক বৈষম্য। প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে, এসব যুদ্ধশিশুরা প্রায়শ মুখোমুখি হয় অপবাদ, কলঙ্ক, পরিত্যাগ এবং এমনকি শিশুহত্যার আগ্রাসনের। চরম দারিদ্র্য এবং নিরাপদ পারিবারিক কাঠামোর আশ্রয়হীন এসব শিশুরা বিশেষভাবে হয়ে যায় পথ-শিশু এবং প্রায়শ শিকার হয় পাচারের। বড় হওয়ার পরে এসব শিশুরা হয়ে পড়ে 'রাষ্ট্রহীন'। তাদের নিজস্ব আইনগত নাজুক অবস্থানের কারণে কোনো আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে এদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয় না। জন্মদাতা বাবা-মার পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পথে আইনগত বাধার কারণে এদের অবস্থান হয় চরম নাজুক। শারীরিক, অর্থনৈতিক, মনো-সামাজিক - সকল প্রেক্ষিতেই, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সময়ের পরিস্থিতির ভয়াবহ প্রভাব পড়ে এদের ওপরে। যুদ্ধশিশুদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব পাবলিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে মার্চ ২০০৫ সময়কালে পরিচালিত হয় একটি বিস্তৃত গবেষণাধর্মী কার্যক্রম। প্রিয়পাঠক, চলুন এবার প্রবেশ করি যুদ্ধশিশু-বিষয়ক বিশ্বপ্রেক্ষিতে।

পূর্বকথা : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে যুদ্ধকালে সুপরিকল্পিতভাবে বা হঠাৎ করে সংঘটিত ধর্ষণে, সেনাদল কর্তৃক ধৃত বন্দি নারী বা যৌনদাসী বা জোরপূর্বক স্ত্রীদের গর্ভে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি ক্রমশ হয়ে উঠেছে নাজুক। কাই গ্রেগের প্রতিবেদন অনুযায়ী এমুহূর্তে সারা বিশ্বে বেঁচে থাকা যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ৫,০০,০০০ (গ্রেগ, ২০০১:৭)। সমাজের এসব শিশুদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হল এরা সবাই 'অন্যদের' (সালজম্যান, ১৯৯৮)। অবৈধ এবং শত্রুসন্তান হিসেবেই জোটে অপবাদ। পরিবারে এবং সমাজে তাদের মানবাধিকার লংঘিত হয় সম্ভাব্য সকল রকম পন্থায়। এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্য সংঘটিত হয় নাগরিকত্ব না দেয়ার মাধ্যমে!

কেস স্টাডি: বসনিয়া-হারজেগোভিনা

যুগোস্লাভিয়ায় ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত যুদ্ধের পরিচয় হত্যা, সন্ত্রাস আর অগুণতি সংখ্যক শিশু যারা ছিল যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট যৌন-সন্ত্রাসের ফসল। একক বা পরিকল্পিত ধর্ষণ-জনিত গর্ভধারণের বিষয়টি ঘটেছিল উভয় পক্ষেই। বসনীয় সার্ব সেনাবাহিনী এবং যুগোস্লাভ জাতীয় সেনাবাহিনী দুই পক্ষই একে অন্যের বিরুদ্ধে গণহারে পরিকল্পিত ধর্ষণের নীতি গ্রহণ করেছিল। এই নীতির আওতায় ছিল বসনীয় এবং ক্রোয়েশীয় নারীদেরকে তাদের নিজ নিজ জাতিসত্তার মূলধারাকে বদলে দেয়ার পন্থা হিসেবে জোর করে গর্ভবতী করা। এভাবে জন্মানো শিশুর সংখ্যা নিয়ে রয়েছে মতভেদ এবং সঠিকভাবে নিরূপণ-অযোগ্য। ১৯৯৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি বিতর্কিত পরিসংখ্যানে প্রকাশ করে যে প্রায় ২০,০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছে। জাতিসংঘ এই সংখ্যার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। ১৯৯৩ সালে মেজোউইকি প্রতিবেদন নিশ্চিত করে যে, প্রতি ১১৯টি ধর্ষণ-জনিত গর্ভধারণে জন্ম নিয়েছে ৯টি যুদ্ধশিশু [৭.৫ শতাংশ]।

এসব গর্ভধারণের বেশিরভাগই সম্ভবত গর্ভপাত পর্যন্ত গড়িয়েছে। ১৯৯৪ সালে সেন্টার ফর রিপ্রোডাকটিভ ল অ্যান্ড পলিসি কর্তৃক নিউইয়র্কে প্রকাশিত প্রতিবেদন বলে যে, ১৯৯২ সালে ক্রোয়েশীয় হাসপাতালে শরণার্থী নারীদের মধ্যে ৩৮টি ধর্ষণ-জনিত গর্ভধারণের তথ্য লিপিবদ্ধ করে। সবগুলো প্রাথমিক গর্ভ এবং দুটি পরিণত গর্ভের পাতন করা হয়। মাত্র ৭টি গর্ভ চলমান থাকে এবং শিশুর জন্ম হয়। ১৯৯৩ সালের মেজোউইকি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১১৯টি

ধর্ষণ-জনিত গর্ভের মধ্যে ১৫টি বাদে সবগুলোর পাতন করা হয়। গর্ভপাতের সুবিধা না থাকা, লজ্জায় প্রাথমিক পর্যায়ে না আসতে পারা, বন্দী থাকা ইত্যাদি কারণে কিছু গর্ভ টিকে থাকে।

এছাড়াও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণ-জনিত গর্ভধারণের লজ্জা-বেদনা সত্ত্বেও মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে জন্ম দেয়। জোয়ানা ড্যানিয়েলের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বসনিয়ায় যুদ্ধশিশুদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: (১) বসনিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন পরিবারে দত্তক নেয়া যুদ্ধশিশু, (২) রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত যুদ্ধশিশু, এবং (৩) [প্রায়শ চরম দারিদ্র্য এবং সামাজিকভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও) নিজ নিজ মায়ের কাছে বড় হতে থাকা যুদ্ধশিশু।

সাহায্যকর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে জানা যায় যে, অনেক যুদ্ধশিশুকেই সম্ভবত ভিনদেশে পাচার করা হয়েছে বা মায়েদের সঙ্গে অভিবাসী করা হয়েছে। ইউনিসেফের সত্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে সারায়েভো, মোসটার, তুজলা এবং জেনিকার ২৩ জন যুদ্ধশিশুর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, মায়েদের সঙ্গে থাকা বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে থাকা যুদ্ধশিশুদের তুলনায়, বিভিন্ন পরিবারে দত্তক নেয়া শিশুরা অর্থনৈতিক এবং মনো-সামাজিকভাবে উন্নততর জীবন-যাপন করছে।

অন্যদিকে, দত্তক নেয়া বাবা-মারা ক্রমশ পড়ছেন আরেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্রায় বড় হয়ে ওঠা যুদ্ধশিশুদেরকে কীভাবে বলবেন তাদের নিজ নিজ মূল উৎস। কিছু কিছু যুদ্ধশিশু তাদের নাগালের সূত্র থেকে জেনেও গিয়েছে এসব কথা। মায়েদের কাছে বড় হতে থাকা শিশুরা মুখোমুখি হচ্ছে বিভিন্ন অসুবিধার; মনো-সামাজিক চাপ এবং সেইসঙ্গে কায়ক্লিষ্ট ও প্রতিবেশী বা একান্নবর্তী পরিবার কর্তৃক সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া জীবনধারার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধরত মায়ের জন্য আবেগঘন দায়িত্ব ও সহানুভূতি।

বসনিয়া-হারজেগোভিনায় একাকি যুদ্ধ-ধর্ষিতা মায়েদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের এই হল চিত্র। সামাজিক সহযোগিতা এবং মানসিক সমর্থনের ঘাটতি সেখানে স্পষ্টত বিদ্যমান। অতি সাম্প্রতিককালের আগে পর্যন্ত বসনিয়ায় এসব যুদ্ধশিশুদের জন্য মানবিক সাড়া ছিল অনুপস্থিত। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, মেডিকা জেনিকার মতো হাতে গোনা নারী সংশ্লিষ্ট এনজিওর মাধ্যমে এসেছে সীমিত সহযোগিতা। আরো ব্যাপক এবং উন্নততর সমন্বিত সাহায্য-সহযোগিতা এসব পরিবারের জন্য নিশ্চিত করবে অর্থনৈতিক এবং মনো-সামাজিক সমর্থন। একই সঙ্গে বসনীয় সমাজে বেদনাক্লিষ্ট উত্তরাধিকারের বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন আশাব্যঞ্জক অবকাশ।

কেস স্টাডি: পূর্ব তিমুর

বিভিন্ন সময়ে পূর্ব তিমুরে বয়ে গেছে অসংখ্য ভিনদেশি শাসনের ধাক্কা। ১৬শ শতাব্দি থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত শাসন করে পর্তুগিজরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, ডাচ এবং অস্ট্রেলীয় সেনারা পূর্ব তিমুরের মাটিতে জাপানি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করে গেরিলা যুদ্ধ।

১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুর দখল করে নেয় ইন্দোনেশিয়া। ব্যাপক সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে দ্বীপের অর্ধেক এলাকায় প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রশাসন। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রেফারেন্ডাম। ইন্দোনেশীয় সৈন্যরা চলে যায় এবং তখনই শুরু হয় সন্ত্রাসের নতুন পর্ব। ২০০২ সালের ২০শে মে তারিখে স্বাধীন হয় পূর্ব তিমুর। নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিমুরীয় নারীদেরকে ধর্ষণ এবং আগ্রাসী সেনাদের সঙ্গে জোরপূর্বক বিয়ের বিষয়টি ছিল ব্যাপক। এসব ধর্ষণের ফলে জন্ম নিয়েছিল অনিরূপিত সংখ্যক শিশু। আগ্রাসনের কালে নারীদেরকে সেনাদের স্ত্রী হতে বাধ্য করা হয়েছে। ক্রীতদাসীদের মতো জীবন-যাপন, প্রতিদিন সৈন্যদের সেবা করা, তাদের জন্য কাজ করা এবং তাদের বিছানায় শুতে বাধ্য ছিল অসহায় ওইসব নারীরা। বিশেষভাবে এসব অন্যায়-অত্যাচার চালানো হয় স্বতন্ত্র-স্বাধীন নেতাদের স্ত্রী ও আত্মীয় নারীদের ওপরে। সুদীর্ঘ সিকি-শতাব্দি ধরে আগ্রাসনকালে এবং রেফারেন্ডামের পরে ধর্ষণ-জনিত জন্ম নেয়া শিশুদের সংখ্যা নিরূপণ করেনি কোনো সরকারি সংস্থা। নরওয়ের বার্জেন নগরের ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন আইডেন্টিটি প্রজেক্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী একটি জেলায় অন্তত ১০০টি ধর্ষণ-জনিত শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশটির জনসংখ্যা ওই জেলার জনসংখ্যার তুলনায় দশ গুণ বেশি হওয়ার কারণে নিরূপিত হয়েছে যে প্রায় ১,০০০ শিশুর জন্ম হয়েছে। এর সঙ্গে বিগত ২৫ বছর আগ্রাসনকালের সংখ্যা যোগ করলে চূড়ান্ত সংখ্যা হবে বিশাল।

কিছু কিছু প্রতিবেদন বলে যে. এসব শিশু এবং তাদের মায়েরা সম্প্রদায় কর্তৃক অপবাদের শিকার হয়েছে। পূর্ব তিমুরে সাধারণত একাকি মায়ের (যেমন, বিধবা মা) যত্ন নেয় একান্নবর্তী পরিবার। নিকটাত্মীয়দের থেকে কম সাহায্য-সমর্থন পাওয়ার কারণে এসব মা ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে ক্রমশ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ১৯৯৯ সালের সন্ত্রাসে জন্মানো শিশুদের মাদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যে আলাদাভাবে বসবাস করতে হয়েছে। ক্যাথলিক অনাথ আশ্রমের সিস্টাররা বলেছে যে কীভাবে ধর্ষণ-জনিত শিশুতে ভরে গেছে তাদের

আশ্রমগুলো। স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে দারিদ্র্য এবং কলঙ্কের অপবাদ এসব শিশুকে নিয়ে গেছে পরিত্যাগের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে। জাতিসংঘ এবং কিছুসংখ্যক এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে এরকম একাকি মাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। তবে, ধর্ষণ-জনিত শিশুদের জন্য নেই কোনো সরকারি সহায়তা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়নি এদের সংখ্যা নিরূপণে। তিমুরের নতুন সরকার চায়, অতীত ভুলে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে! তবে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করছে জাতিসংঘ। কিছু সংখ্যক ইন্দোনেশিয় সেনাকে অভিযুক্ত করা সম্ভব হলেও এ পর্যন্ত কাউকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়নি।

কেস স্টাডি : দারফুর

সুদানের দারফুর অঞ্চলে চলমান সংঘর্ষে সংঘটিত গণধর্ষণ এবং যৌনদাসত্বের ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে অযাচিত শিশু। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কলহ-বিবাদ ২০০৩ সালে এসে রূপ নেয় ব্যাপক সংঘর্ষে। সুদানের দুই অনারব গোষ্ঠি সরকারি স্থাপনাগুলোতে শুরু করে আক্রমণ। তাৎক্ষণিকভাবে সুদানি সরকার স্থানীয় আরব মিলিশিয়া অধ্যুষিত বাহিনী 'জানজাবিদ'-কে সরকারের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি প্রদান করে। শুরু হয় যুদ্ধ। দুর্ভিক্ষ, বিতাড়ন, হত্যা বা ধর্ষণের মাধ্যমে শত শত হাজার হাজার সুদানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই যুদ্ধে। সাধারণ নাগরিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার মাধ্যম হিসেবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো দারফুরেও পরিচালিত হয় ব্যাপক গণধর্ষণ ও যৌনদাসত্বের কৌশল। আক্রমণের অন্যতম প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহারকারী জানজাবিদ নির্ভর করেছে তাদেরই সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ প্রয়োগের ওপরে। নিজেরাও রক্ষণশীল মুসলমান হওয়ার কারণে সাধারণ মুসলমান নারীদের ওপরে তাদের পরিচালিত যৌন-সন্ত্রাসের ফলাফল হিসেবে উদ্ভূত কলঙ্ক ও প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল তারা। প্রকৃতপক্ষে গণধর্ষণ পরিচালনার পেছনে এটাই ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ধর্ষণের সময়ে তার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কথা মনে করে একজন মা বলেন যে, "আমরা তোমাদের সন্তানদের শরীরের রঙ বদলে দিতে চাই।" জাতিসত্তা ধ্বংসের ক্ষেত্রে এটা ছিল জোরপূর্বক গর্ভধারণের একটা প্রমাণ।

দারফুরের সংঘর্ষ সম্পর্কিত বেশিরভাগ গবেষণাই দৃষ্টিপাত করেছে ধর্ষিতা নারী ও কিশোরী এবং একইসঙ্গে সম্প্রদায়ের ওপরে এর ফলাফলের ওপরে। এসব সন্ত্রাসের ফলে জন্ম নেয়া শিশুদের নিয়ে খুব কম গবেষণাই পরিচালিত হয়েছে। সম্ভবত এজন্য যে, এটি খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা এবং বাচ্চারা কেবল জন্ম নিয়েছে বা নিচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধানী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক গবেষণা নির্দেশ করে যে মায়েদের মতো জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুরাও কলঙ্কিত এবং সমাজ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা কর্তৃকও নিগৃহীত বা পরিত্যক্ত। প্রথাগতভাবে দারফুরের সমাজে, সন্তানের পরিচয় হয় পিতার পরিচয়ে, মায়ের নয়। অতএব শিশুটি যদি 'শত্রুর' অনুরূপ চেহারার নাও হয়, তাকে দেখা হবে বিমাতাসুলভ দৃষ্টিতে। বর্তমানে গ্রহণ করা হলেও, ভবিষ্যতে করা হবে পরিত্যক্ত। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমাজ কর্তৃক এসব শিশুদেরকে 'জানজাবিদ শিশু' বা 'নোংরা শিশু' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

শিশুহত্যার গুজব শোনা গিয়েছিল সাহায্য-কর্মীদের কাছ থেকে। তবে এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। এসব ধর্ষণের ফলে সঠিক কজন শিশুর জন্ম হয়েছে তা জানা সহজলভ্য নয়; তবে, স্পষ্টত ধারণা করা যেতে পারে যে, সংঘটিত হয়েছে হাজার হাজার ধর্ষণ। সমাজের সংরক্ষণশীলতার কারণেই এসব তথ্যা পাওয়া দুষ্কর। ধর্ষণ একটি নিষিদ্ধ বিষয় যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যায় না; ফলে বেশিরভাগ ধর্ষণই থেকে যায় গোপন। যৌন-সন্ত্রাসকারী অপরাধীদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান না করার সুদানি সরকারের নীতির কারণে বিষয়টি আরো গোপনীয় হয়ে উঠেছে। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউনিসেফ বলে, "পশ্চিম সুদানে চলমান সংঘাতে ধর্ষিত মায়েরা ডজন ডজন শিশুর জন্ম দিয়ে চলেছে।" ইউনিসেফ ধর্ষণের অপবাদ বা কালিমা হালকা করার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার আরো প্রসারের পরামর্শ দিয়েছে। একবার সবাই যদি অনুধাবন করে যে, ধর্ষণ মায়ের কোনো অপরাধ নয় এবং নিষ্পাপ শিশুটিকে তার বাবার অপকর্মের জন্য দায়ী করা অনুচিত, তাহলেই কলঙ্ক-অপবাদের বিষয়টি দূর হয়ে যাবে। মা ও শিশু তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবে।

উপসংহার: যুদ্ধকালের ধর্ষণ এবং যৌনসন্ত্রাসে জন্ম নেয়া শিশুরা যুদ্ধাক্রান্ত শিশুদের এক বিশেষ নাজুক শ্রেণি। কিন্তু আজ পর্যন্ত গবেষকরাও তাদের সম্পর্কে কম বিশ্লেষণ করেছে আবার মানবাধিকার কর্মীরাও কম সেবা প্রদান করেছে। ক্রমেই প্রমাণ প্রকাশিত হচ্ছে যে, যুদ্ধশিশুরা সংঘর্ষকালে এবং তার পরে তাদের মানবাধিকার সংরক্ষণে নানা ধরনের বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। শিশু অধিকার মুখপাত্রদের জন্য এসব বাধা-বিঘ্ন নিরূপণ করা বাঞ্ছনীয়। শিশু অধিকারবাদী, সশস্ত্র যুদ্ধের বিরোধী এবং মানবাধিকার কর্মী সবাই সম্মিলিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এসব শিশুদের প্রয়োজনীয়তা এবং নাজুকতা নিরূপণ করে সমন্বিত এবং সুসভ্য কার্যক্রম হাতে নিবে– এটাই কাঙ্ক্ষিত।

আফ্রিকার বীরাঙ্গনা
সব নারীর নাড়ি এক সুতোয় গাঁথা!

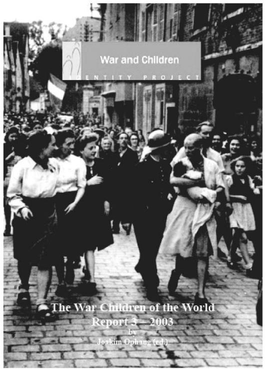

ফরাসী অপবিত্র (!)
বীরাঙ্গনার মাথা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে!
যুদ্ধশিশু কোলে নিয়ে কোথায় যাবে সে...?

সাবলীল হাসিতে!
পৃথিবীটা তাদেরও...
ছবি: ইউটিউব/ফ্লিকার

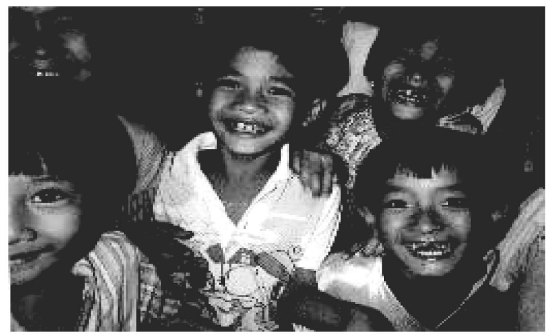

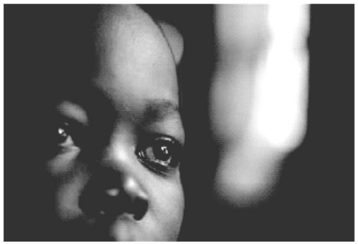

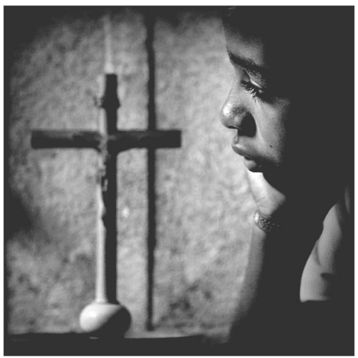

কোন চোখে কি দ্যাখে
নিষ্পাপ সৃষ্টি!
ছবি: ইউটিউব/ফ্লিকার

অধ্যায় - ৬

যুদ্ধশিশুর অধিকার, সংশ্লিষ্ট যুদ্ধাপরাধ এবং বিচার

শিশু অধিকার কনভেনশন

জাতিসংঘের 'কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড' শীর্ষক কনভেনশনের আর্টিকেল-২১ বিবৃত করেছে শিশু দত্তকায়ন সম্পর্কে। বাংলাদেশ সরকার এই আর্টিকেলের প্রতি রক্ষণশীলতা প্রকাশ করে। উভয় বা একজন জন্মদাতার অনুপস্থিতিতে বা অভিভাবকের অনাদর বা অনুরূপ কারণে নাজুক শিশুকে সংরক্ষণ করা এবং তার শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য দেশের অভ্যন্তরে সর্বোত্তম বিকল্প হল দেশের অভ্যন্তরে দত্তকায়ন। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জন্ম নেয়া শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পক্ষপাতের কারণে গ্রহণ করা হয়না। চরম দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, পারিবারিক বিপদের মুখে শিশুদেরকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো জোর করে পরিত্যাগ করা হয়। এসব শিশুরা যদি কোনোভাবে বেঁচেও যায়, তারা শুধু রাস্তার ভবঘুরেদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে থাকে; আবার কোনো অপ-সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি অনাথ আশ্রম থাকলেও, দত্তকায়নের বিপরীতে আশ্রম কোনো সঠিক সমাধান নয়।

যুদ্ধশিশুদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট একটি আইনের প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয় ১৯৭২ সালে। ক্রমবর্ধমান যুদ্ধশিশুদের বিষয়টি সামাল দেয়ার জন্য পরিত্যক্ত শিশুদেরকে দত্তকায়ন ও অভিভাবকত্ব প্রদান করার জন্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক (আইন বিভাগ)

মন্ত্রণালয় জারী করে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১২৪ (১৯৭২); শিরোনাম - বাংলাদেশ অ্যাবানডান চিলড্রেন (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডার ১৯৭২। কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'শিশুদের নিয়ে অপব্যবহার করা' সম্পর্কিত সমালোচনার মুখে, কোনোরকম গভীর তদন্তানুসন্ধান ছাড়াই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাত্র কয়েক বছর পরে রহিত করা হয় এই আইন। আজও আইনটি রহিত অবস্থায়ই রয়ে গেছে।

আদেশ নম্বর ১২৪ (১৯৭২) রহিত হওয়ার পর থেকেই দত্তকায়ন আইনের জন্য, শিশু অধিকার ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট, সকল পক্ষ থেকে একটানা দাবি উত্থাপিত হয়ে চলেছে। তবে সরকারের সাড়া নেই। নাজুক শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে, পর্যবেক্ষণসহ উপযোগী একটি দত্তকায়ন ব্যবস্থা হতে পারে একটি ইতিবাচক অবকাশ।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

একটি প্রাচীন বল্কান প্রবাদে বিবৃত হয়েছে: "চরম বিপদের মুখোমুখি অবস্থায়, সেতুটি পার না হওয়া পর্যন্ত, শয়তানের সঙ্গে পথ চলার অনুমতি রয়েছে।"

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টি মনে এলেই আমাদের মনে প্রথম ভেসে ওঠে জেনোসাইডের কথা। জেনোসাইডের অর্থ গণহত্যা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি। এর মূল অর্থ 'একটি জাতির নির্মূলকরণ বা জাতিসত্তা-ধ্বংস'। সমাধান-অযোগ্য কঠিন সময়ে সংঘটিত হয় ব্যাপক সংখ্যায় হত্যাযজ্ঞ। এই জাতিসত্তা-ধ্বংসের একটি সামাজিক বা অপরাধমূলক বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপক আকারে জটিলতা-বিশৃঙ্খলা। তার মাত্রা যেরকমই হোকনা কেন-এর ফলে ভেঙে পড়ে সমাজ কাঠামো।

তার মানে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'-এর বিশাল প্রেক্ষাপটে 'গণহত্যা' একটি অংশ মাত্র। 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শব্দগুচ্ছটি প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯১৫ সালে, তুরস্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যার বিরুদ্ধে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়ার যুক্ত নিন্দা-ঘোষণায়। পরবর্তীকালে, ১৯৪৫ সালে প্রণীত নুরেমবার্গ চার্টার (চার্টার অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল)-কে আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য করা যায়। কারণ, ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৯৫ নম্বর রেজোলিউশনের মাধ্যমে এটাকে সমর্থন করা হয়েছে। সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য এই চার্টারে বিবৃত হয়েছে তিনটি শ্রেণিভুক্ত অপরাধ :

সামরিক ট্রাইবুনালের সংজ্ঞা

১. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ – আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সূচনা বা পরিচালনা, অথবা আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি বা আশ্বাস (বীমা) ভঙ্গ করে যুদ্ধ, অথবা এখানে উল্লেখিত যেকোনো বিষয় সফল করার জন্য যৌথ পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া।

২. যুদ্ধাপরাধ – যুদ্ধনীতি বা যুদ্ধের আইন-কানুন ভঙ্গ করা। এসব ভঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (তবে এসবেই সীমিত নয়), হত্যা, অপব্যবহার বা সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনে বা দখল করা অঞ্চলে ক্রীতদাস-শ্রমিকরূপে নির্বাসন, যুদ্ধবন্দি বা সমুদ্রে অবস্থানকারী মানুষদের সঙ্গে কু-আচরণ বা হত্যা, জিম্মি-হত্যা, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি চুরি-লুণ্ঠন, লক্ষ্যহীনভাবে শহর-নগর-গ্রাম ধ্বংস করা, অথবা প্রয়োজন সমর্থন করে না এমন ধরনের ধ্বংসলীলা।

৩. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ – হত্যা, ধ্বংস, ক্রীতদাসকরণ, নির্বাসন এবং যুদ্ধের আগে বা চলাকালে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য অমানবিক কার্যক্রম, অথবা রাজনৈতিক, জাতিগত বা ধর্মীয় ভিত্তিতে নির্যাতন, দেশের অভ্যন্তরীণ আইন ভঙ্গ হোক বা না হোক, এই ট্রাইবুনালের আইনত আওতার মধ্যে যেকোনো অপরাধ সংঘটন বা সংযুক্ত হওয়া।

আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেক্ষিত

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল প্রবর্তনের পর থেকেই, জাতিসত্তা-ধ্বংস, গণহত্যা বা অনুরূপ যেকোনো অপরাধসমূহকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শ্রেণিতে যুক্ত করা হয়েছে। পূবর্তন যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল (আইসিটিওয়াই ১৯৯৩) এবং রুয়ান্ডার জন্য গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল (আইসিটিআর ১৯৯৪)-এর অনেক উন্নয়ন করা হলেও চূড়ান্তভাবে ২০০২ সালে গঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট। ১৯৪৭ সাল থেকেই জাতিসংঘ এই আদালতটি গঠনের চেষ্টা করে আসলেও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের রোম স্ট্যাটিউট গ্রহণের মাধ্যমে সফল হয় ১৯৯৮ সালে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবটি সমর্থন করে ১২০টি দেশ, বিরোধিতা করে ৭টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্রসহ) এবং নীরব থাকে ২১টি দেশ। ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৯৭টি দেশ এই চুক্তিকে আইনে রূপ (রেটিফিকেশন) দিয়েছে। আন্তর্জাতিক এই আদালতটি হেগ শহরে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সংজ্ঞা

অপরাধীদেরকে তাদের নিজ নিজ কর্মের জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি করার জন্য উপযোগী করে গঠন করা হয়েছে আইসিসি বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'বিচারের সময়ে' অবশ্যিকভাবে উপস্থিত করা হয় এবং নিরপরাধ গণ্য করা হয়। তিন ধরনের অপরাধ এই আইনের আওতায় পড়ে:

১. **জাতিসত্তা-ধ্বংস (জেনোসাইড)** – কোনো জাতি, গোত্র, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা, যেমন: (ক) গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে হত্যা করা; (খ) গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা; (গ) গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধারা, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা; (ঘ) গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মদানকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা; (ঙ) জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদেরকে অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

২. **মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ** – আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থেকে, কোনো সাধারণ জনতার ওপরে ব্যাপক বা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা: (ক) হত্যা; (খ) উৎখাত; (গ) অধিবাসীদেরকে নির্বাসন বা জোরপূর্বক স্থানান্তর করা; (ঘ) বন্দী করা অথবা আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক অধিকার খর্ব করে স্বাধীনতা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত করা; (ঙ) অত্যাচার; (চ) ধর্ষণ, যৌন-দাসত্ব, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক গর্ভধারণ, জোরপূর্বক গর্ভপাত করণ, বা অনুরূপ অন্য কোনো ধরনের যৌন-সন্ত্রাস; (ছ) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো সূত্রে বা আদালতের আওতায় কোনো অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কে, সার্বিকভাবে বা নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর ওপরে রাজনৈতিক, বর্ণগত, জাতিগত, গোত্রগত, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত, ধর্মগত, লিঙ্গভেদ বা বিশ্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অননুমোদিত হিসেবে স্বীকৃত কোনো প্রেক্ষিতে অত্যাচার করা; (জ) জোরপূর্বক মানুষকে নিরুদ্দেশ করা; (ঝ) জাতিগত বৈষম্য; (ঞ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কষ্টকর হয় এধরনের অমানবিক কার্যক্রম, বা শারীরিক বা মানসিক বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করা।

৩. **যুদ্ধাপরাধ** – (ক) জেনেভা কনভেনশন ভঙ্গ করা; (খ) আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত কাঠামোর আওতায়, আন্তর্জাতিকভাবে সশস্ত্র বিবাদে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও রীতিনীতি গুরুতরভাবে ভঙ্গ করা; (গ) আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের আওতাধীন নয় এরকম কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে, চারটি

জেনেভা কনভেনশনের তিন নম্বর আর্টিকেল গুরুতরভাবে ভঙ্গ করা; (ঘ) আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত কাঠামোর আওতায়, আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের আওতাধীন নয় এরকম কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুরুতর আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করা।

লিঙ্গভেদ, জাতিসত্তা এবং যুদ্ধশিশুর অধিকার

২০০৪ সালের জুন মাসের ওয়াশিংটন পোস্টে 'সুতীব্র চিৎকারে' শিরোনাম প্রকাশিত হয় - 'উই ওয়ান্ট টু মেক এ লাইট বেবী [আমরা এক আলোর শিশু তৈরি করতে চাই]'। কাহিনীতে ছিলঃ খার্তুম সরকারের সহযোগিতায় আরব মিলিশিয়া কর্তৃক দারফুরের কালো নারী ও কিশোরীদেরকে গণধর্ষণ ও জোরপূর্বক গর্ভবতী করা (সূত্রঃ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০০৪)। আর এই আর্তনাদের সোচ্চার কণ্ঠে ছিলেন বিশ্ব-মানবাধিকার ও শিশু-অধিকার কর্মী এবং যুদ্ধশিশু বিষয়ক গবেষক আর. চার্লি কার্পেন্টার।

২০০৩ সাল থেকে জানজাবিদ ঘোড়সওয়ার সেনাবাহিনী পশ্চিম সুদানের দারফুর অঞ্চলের গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে বইয়ে দেয় ঝড়। অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুটতরাজ এবং সর্বোপরি আরব-চেহারার সন্তান জন্ম দেয়ানোর উদ্দেশ্যে নারী ও কিশোরীদের ওপরে সংঘটিত হয়েছে গণধর্ষণ। অন্যদিকে, ওই গণধর্ষণের পক্ষে সামরিক যুক্তি ছিল, দারফুরের সাধারণ নাগরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০০৪)। কিন্তু জোরপূর্বক গর্ভবতী করাও ছিল অপরাধীদের ইচ্ছা; এর মাধ্যমে দারফুরের অ-আরবীয় জনসংখ্যার ওপরে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলা এবং ধর্ষণ-শিকারদেরকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে 'শত্রু-কর্তৃক' গর্ভধারণের মাধ্যমে অপমানিত করা। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে সৃষ্টি হবে অবাঞ্ছিত এক প্রজন্ম। আর ওই নিষ্পাপ শিশুদের ওপরে পড়বে ভয়াবহ প্রভাব। কারণ তারা বেড়ে উঠবে এমন এক সমাজে যা তাদেরকে ধারণ করবে জানজাবিদ পিতার ঔরসজাত জারজ সন্তান হিসেবে!

যুদ্ধকালে যৌন-সন্ত্রাসের ফসল হিসেবে শিশুর জন্ম বিশ্বের ইতিহাসে ঘটেই চলেছে। সুসান ব্রাউনমিলারের মতে, শত্রুর ধর্ষণে সন্তান জন্মদান একটি প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। বাংলাদেশ, বসনিয়া-হারজেগোভিনা এবং দারফুরের উপমা উল্লেখ্য। এছাড়াও, আগ্রাসী বাহিনী পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করুক বা না করুক, যুদ্ধাক্রান্ত এলাকায় যৌনসন্ত্রাস এবং অন্যান্য নির্যাতনের মাধ্যমেও জন্ম নেয়

যুদ্ধশিশু। বিগত কয়েক দশকে শত শত হাজার হাজার যুদ্ধশিশু জন্ম নিয়েছে গণধর্ষণ, যৌন-নির্যাতন বা হয়রানির মাধ্যমে।

দারফুর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে জানা যায় যে, এসব যুদ্ধশিশুরা প্রায়শ ভুগছে লজ্জা, অপমান আর বৈষম্যে, এবং এমনকি বরণ করতে হচ্ছে শিশুহত্যার করাল থাবা! পূর্ব তিমুর, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, কসোভো, লাইবেরিয়া... এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এরকম অনেক দেশেই যুদ্ধকালের ধর্ষণ এবং যৌন-নির্যাতনে জন্ম নেয়া শিশুদেরকে প্রায়শ বিবেচনা করা হয় "শত্রুর সন্তান" বলে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মীরা যুদ্ধশিশুদের জাতিগত পরিচয় এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার। তাদের শিক্ষা, পরিবার, পরিচয়, শারীরিক নিরাপত্তা এবং এমনকি বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাও মাঝেমধ্যেই বিঘ্নিত হয়। সংবাদ-মাধ্যম, সাহায্য সংস্থাসমূহের আলোচনা এবং প্রকাশনায় যুদ্ধে ধর্ষণের এমনতর চিত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ওই বেদনাবিধুর গাথার সমান্তরালে আজ পর্যন্ত খুব কম সহায়ক কার্যক্রমের দেখা মেলে যা ধারাবাহিকভাবে, মানবাধিকারের প্রেক্ষিতে, এসব শিশুদের অবস্থান এবং ভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়াসগুলোর উপযোগিতা নিরীক্ষা করে, বা এসব জন্মকে ঘিরে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল্যায়ন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি যে, এসব শিশুদেরকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যাগ করার ধরন এক নয়। অন্যদিকে কীভাবে বা কোন পরিবেশের আওতায় ধর্ষিতা এবং তাদের পরিবার এ ধরনের শিশুকে মেনে নিবে তাও তেমন স্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক মানবিক সম্প্রদায়ের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, যুদ্ধকালে যৌন-সন্ত্রাস এবং যুদ্ধাক্রান্ত শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে গুরুত্ব পায়নি। পরিচালিত হয়নি সুসংগঠিতভাবে সত্যানুসন্ধানী কার্যক্রম। নিরূপিত হয়নি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ফলে জন্ম নেয়া শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায়। যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে গবেষণায় ও তাদের ভাগ্যের দিকে আইনি দৃষ্টি দেয়ায় ঘাটতি, বা তাদের দেখাশোনা করা - সবটাই সমস্যাসঙ্কুল। সমস্যা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবন করতে না পারলে, তাদের সর্বোত্তম যত্ন-আত্তি প্রতিষ্ঠা করাও হয়ে ওঠে কঠিন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন যুদ্ধশিশুদেরকে মানবাধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা। আর সেই সুরক্ষার সুবিধাভোগী হবে যুদ্ধাক্রান্ত সাধারণ জনগণ।

ধর্ষণ বা যৌন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে জন্ম নেয়া এবং মানবাধিকারের চরম লংঘনের শিকার যুদ্ধশিশুদের বেদনার বিষয়টি কীভাবে বোধ্য হবে। আর কিভাবেইবা এসব দূর হবে? বিভিন্ন পরিবেশ, অঞ্চল এবং সংস্কৃতিতে কীভাবে

এর বিভিন্নতা ঘটে। মানবাধিকার কর্মীদের বুঝতে হবে যে, কেন কোনো ধর্ষিতা মা তার সন্তানকে মেরে ফেলে আর অন্য মা তাকে স্বাগত জানায়। কেন যুদ্ধোত্তর কোনো কোনো সরকার যুদ্ধশিশুদেরকে গ্রহণ করে নিয়ে বিদেশে দত্তকায়নে না পাঠিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে আগ্রহী হয়। বড় বড় মানবাধিকার সংগঠনে কেন এই বিষয়টি নিয়ে বিরাজ করে নীরবতা। আর কীভাবেইবা, যুদ্ধের পরে যুদ্ধশিশুসহ ধর্ষিতা নারীদের চাহিদা এবং অধিকারের জন্য সম্মানজনক একাত্মতা নিশ্চিত হবে। একবিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে, যুদ্ধাক্রান্ত সাধারণ জনগণের সুরক্ষা বা মানবিক নিরাপত্তার বিষয়ে সোচ্চার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মীদেরকে এসব প্রশ্নকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করা যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সঠিক বা সুবিন্যস্ত তথ্য পাওয়া সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে অনুমিত, শ্রুত বা বেসরকারি সূত্রে পাওয়া বিপুল তথ্য-প্রমাণ নির্দেশ করে যে, যুদ্ধকালে ধর্ষণ এবং যৌন-হয়রানির মাধ্যমে ভয়াবহ মাত্রায় বৈষম্য সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী সন্ত্রাসের মাঝে রুয়ান্ডা এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনায় জাতিসত্তা ধ্বংসের (জেনোসাইড) উদ্দেশ্যে সংঘটিত ধর্ষণ থেকে শুরু করে, রেফারেন্ডাম-উত্তর সময়ে পূর্ব তিমুরে ঘটনাচক্রে সংঘটিত সন্ত্রাস, উগান্ডা ও সিয়েরা লিওনের অপহৃত মেয়েদের যৌন হয়রানি ও যৌনদাসত্ব, পূর্ব তিমুরে ইন্দোনেশীয় অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক মেয়েদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে করার মাধ্যমে জন্মানো শিশু-কিশোরদের গঠন কেমন হতে পারে! অঞ্চল, ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণায় ফুটে উঠেছে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ চিত্র। তবে সব দেশের যুদ্ধশিশুদের অবস্থা এক হয়না। ধারণা করা যেতে পারে যে, যেসব শিশুদের অবয়বে তাদের উৎস স্পষ্ট, তাদের অবস্থান বেশ নাজুক। যেমনটা ঘটেছে, মার্কিন বাহিনীর ঔরসে জন্মানো 'ভিয়েতনামেরিকান' শিশু অথবা দারফুরে জানজাবিদদের গণধর্ষণে জন্মানো অর্ধ-আরবীয় শিশুদের ক্ষেত্রে। আর যেখানে এর বিপরীতে পরিস্থিতি বিদ্যমান, সেখানে ধর্ষণে জন্মানো শিশুরা সাধারণ জনস্রোতে মিশে যেতে পারে অনায়াসে। যেমনটা ঘটেছে বসনিয়া-হারজেগোভিনায়। এসব শিশুদের জৈব-জন্ম সূত্রের ওপরেও নির্ভর করে তাদের মানবাধিকার। যুদ্ধের মাধ্যমে জন্মানো শিশুদের একটি মানবেতর পরিণতি ভোগ করতেই হয়; তা হল 'শিশুহত্যা'। স্পষ্টত এটা জাতিসংঘের কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড-এর আর্টিকেল ৬(২) অনুযায়ী 'শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকারের' পরিপন্থী।

যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধকালে পরিকল্পিত ধর্ষণের মাধ্যমে জন্মানো শিশুদেরকে এড়ানো হয়েছে, পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং কখনো কখনো মেরেও ফেলা

হয়েছে। তথ্য যা পাওয়া যায়, প্রকৃত চিত্র যে তার চেয়ে অনেক বেশি তা সহজেই অনুমেয়। কসোভোতে এক মা তার সদ্যোজাত শিশুকে, সেবাদানকারী ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের নার্সদের সামনেই, ঘাড় মটকে মেরে ফেলে (স্মিথ ২০০০)! হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে সংঘটিত রুয়ান্ডার গণহত্যা ও ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া দুই থেকে পাঁচ হাজার শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছে (নওরোজী ১৯৯৬)। ধর্ষিতা মায়েরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে, তারা বাচ্চাদের যথেষ্ট যত্ন নিতে পারেনা; সেক্ষেত্রেও ঘটেছে 'অনাদরে শিশু-মৃত্যু'।

ধর্ষণের শিশুদেরকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও পোহাতে হয় অপমান ও যন্ত্রণা। রুয়ান্ডাতে এরা সমালোচিত হয়েছে 'শয়তানের সন্তান' হিসেবে (নওরোজী ১৯৯৬); কসোভোতে 'লজ্জার সন্তান' (স্মিথ ২০০০); পূর্ব তিমুরে 'শত্রুর সন্তান' (পাওয়েল ২০০১); এবং নিকারাগুয়ায় 'দৈত্যের সন্তান' (ওয়েইটসম্যান ২০০৩)। আর আমাদের বাংলাদেশে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিত্র আরো ভয়াবহ। ছেলে বাচ্চাদেরকে শুধুমাত্র যৌন-সন্ত্রাস বা জাতীয় অপমানের জীবন্ত চিহ্নই নয় বরং বিবেচনা করা হয়েছে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে ওঠা 'পঞ্চম বাহিনী' হিসেবে (টুমী ২০০৩)!

বিশ্ব এবং স্থানীয় প্রচার মাধ্যমগুলো এসব শিশুদেরকে 'অন্য মানুষ' হিসেবে চিত্রায়িত করে। উগান্ডাতে মায়েরা তাদের নিজ নিজ সন্তানদের নাম রাখার বিষয়ে ধর্ষণের মাধ্যমে জন্মের চিহ্ন বা বেদনায় অংশ নিতে আগ্রহী হয়না। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে শিশুদেরকে শনাক্ত এবং পরিচয় নির্ধারণ করার কারণে তাদের কপালে চিহ্নিত হয়েই যায় কষ্টের ছাপ। অবস্থান নির্ধারিত হয় সমাজের বাইরে! ইউনিসেফের একটা অপ্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, যুগোস্লাভিয়ায় এরকম অযাচিত সমাজ-চ্যুতি ওইসব শিশুদের ওপরে ফেলেছে মানসিক চাপ। আর বড় হওয়ার পরে তারা খুঁজে ফিরেছে অর্থপূর্ণ সামাজিক পরিচয় এবং প্রায়শ প্রশ্ন করে তাদের জন্মের উৎস সম্পর্কে (ব্যালোরডা ২০০৪)।

সশস্ত্র যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে যৌন-হয়রানি বা যৌনদাসত্বের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরা, জাতিসত্তা ধ্বংসের সুপরিকল্পিত সামরিক অভিযানে জন্ম নেয়া শিশুদের মতো একই রকমের সমস্যার মুখোমুখি হয়। 'স্ত্রী' হিসেবে ধরে আনা এবং যৌনদাসত্বসম পরিবেশে জীবনযাপন করা তথাকথিত নারী সৈন্যদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুরা মা-সহ সেনাবাহিনী ছাড়ার পরে পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে (বেনেট ২০০২)। শান্তিরক্ষী বাহিনী, হানাদার বাহিনী বা মানবাধিকার কর্মী কর্তৃক যৌন হয়রানির মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরা পিতৃ-পরিচয়, পিতৃ-অধিকার, সাহায্য-সহযোগিতা বা নামহীনভাবে বড় হতে পারে (গ্রেগ ২০০১)।

পরিবার এবং সমাজকর্মীদের আশ্রয় বঞ্চিত এসব শিশুদের বিশেষত শিশুপাচারের স্বীকার বা রাস্তায় ভবঘুরে হওয়ার আশঙ্কা থাকে (কার্পেন্টার ২০০৫)। স্পষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে তাদের ওপরে মিশ্রিত বা ভিন্নধারার সীলমোহর সেঁটে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে দেয়ার মতো বিষয়ও ঘটতে পারে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে যেখানে ধর্ম-গোত্র বা পৈতৃক উৎসের ওপরে নির্ভর করে নির্ধারিত হয় জাতীয়তা এবং নাগরিক অধিকার, সেখানে যৌনসন্ত্রাস বা হয়রানির মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরা থাকে রাষ্ট্রহীনতার আশঙ্কায়! লাইবেরিয়া কয়েকটি মাত্র দেশের একটি যেসবের সংবিধান যুদ্ধশিশুদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে (রেন ও সারলীফ ২০০২)। বসনিয়ার শরণার্থী মায়েদের শিশুদেরকে প্রতিবেশী ক্রোয়েশিয়ায় প্রাথমিকভাবে নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল (জর্ডান ১৯৯৫)। শিশুদের মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের ওপরে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একারণেই শিক্ষার মতো মৌলিক সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি হয়ে উঠেছে সমস্যাসঙ্কুল। তবে দেখা গেছে যে, যেখানে রাষ্ট্র শিশুদের নাম রাখা এবং জাতীয়তার অধিকার সংরক্ষিত করে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়, সেখানে সমাজ বহির্ভূত হয়ে পড়ার সমস্যা, সমাজ বা ধর্ম-গোত্রের কার্যকরী সদস্য হওয়ার অধিকারের বিষয়টি আইনের আওতায় নিয়ে আসা বা নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি আরো বেশি করে ঝামেলাপূর্ণ।

যুদ্ধের সময়ে ধর্ষণ বা অত্যাচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরা কিছুটা বড় হওয়ার পরে, এরকম এক নাজুক অবস্থানের মধ্যে, একটা অর্থপূর্ণ সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিই মুখ্য। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য একজনকে অবশ্যই একটি সম্প্রদায়ের অংশ হতে হয় (ডোনেলি এবং হাওয়ার্ড ১৯৯৮)। অতএব, যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলে শিশুদের সুরক্ষায় মনো-সামাজিক মাত্রার নিরিখে এই বিপরীতমুখী সহাবস্থানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার-ভাবনা

মার্কিন গবেষক ডেবরা ডিলায়েট তার 'থিওরাইজিং জাস্টিস ফর ওয়ার বেবীজ' শীর্ষক নিবন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন যুদ্ধশিশুদের জন্য সম্ভাব্য উপযুক্ত বিচারপন্থা নিয়ে। নিঃসন্দেহে বিষয়টা গুরুতররূপে কঠিন। আসুন

প্রিয়পাঠক, সেখান থেকে আংশিক উদ্ধৃতিসহ আলোচনায় আমরাও চেষ্টা করি এই সুকঠিন সমাধানের সন্ধান পাওয়ার জন্য।

কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সময়ে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে যুদ্ধশিশু বিষয়ে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছেন। যুদ্ধকালে ধর্ষণ এবং যৌন-হয়রানির মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হয় 'যুদ্ধশিশু' নাম। যুদ্ধশিশু সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন। তাহলেও, নিরূপিত প্রমাণাদি বলে যে, যুদ্ধশিশু শ্রেণিটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছেলেমেয়ে যারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়। কিছু ধর্ষিতা নারী গর্ভপাতের সুযোগ পেলেও নানা ধরনের অসুবিধার কারণে অনেকেই সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হয়। কিছু নারী জন্মের পরপরই বা পরে তবে শৈশবেই শিশুসন্তানকে মেরেও ফেলে। বেঁচে থাকা যুদ্ধশিশুরা হয়ে যায় অনাথ-এতিম; উভয় অভিভাবকের সম্প্রদায়ের অবহেলা এবং বৈষম্যের শিকার হয় তারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধশিশুদেরকে সমাজ মেনে নিলেও সমাজের বুকে তারা হয়ে থাকে যুদ্ধকালের সন্ত্রাসের স্মৃতিচিহ্ন যার ফসল সে নিজেই। মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সংঘটিত হয়েছে এই ভয়াবহ মাত্রার ভারসাম্যহীন অনাচার। উল্লেখযোগ্য কোনো বিচার হয়নি! কিভাবে হতে পারে এই বিচার? প্রিয়পাঠক, চলুন সেই ভাবনায় এগিয়ে যাই।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'যুদ্ধশিশু' বিষয়টির বিপরীতে রয়েছে এক কঠিন এবং বহুস্তরের সুপ্ত বাধা। কীভাবে এসব শিশুদেরকে শিকার হিসেবে যুদ্ধশিশু-রূপে চিত্রায়িত করা যাবে, যখন তাদের [প্রশ্নবিদ্ধ] জন্মই তাদের অস্তিত্বের উৎস। জোরপূর্বক গর্ভধারণের প্রক্রিয়াটি অনৈতিক হলেও, নিঃসন্দেহে, যুদ্ধশিশুদের 'জন্ম' অন্যান্য মানুষের জন্মের মতোই স্বাভাবিক এবং পবিত্র। যুদ্ধশিশুর এই শ্রেণিটির মধ্যে কি যুদ্ধকালে ধর্ষণের ফলে 'জন্ম না নেয়া' ভ্রুণও থাকবে? বিষয়টি প্রজনন অধিকারের আওতাভুক্ত বলে বেশ জটিল। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে, যুদ্ধশিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিচারের প্রয়াস বেশ কঠিন। সমস্যাটিতে শুধুমাত্র শিশুই নয়, একইসঙ্গে মা-ও অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্নভাবে যুদ্ধশিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যুদ্ধকালে ধর্ষণের ফলে 'জন্ম না নেয়া' ভ্রুণকে অন্তর্ভুক্ত করলে গর্ভপাত করা ভ্রুণও শিকারের 'একটি শ্রেণি' হিসেবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে ওইসব যুদ্ধশিশুরা বা যুদ্ধভ্রুণেরা হয় 'শিশুহত্যা'র শিকার! বেঁচে থাকা যুদ্ধশিশুরা শিকার হয় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির; যেমন, পরিত্যক্ততা, অবহেলা/অত্যাচার, অসম্মান এবং বৈষম্যের। শিশু এবং মা–এই দুই শ্রেণির শিকারদের পার্থক্য সরলভাবে বয়সের নাও হতে পারে; অনেক

ক্ষেত্রে যুদ্ধশিশুদের মায়েরাও 'শিশু'! আবার বড় হয়ে যাওয়ার পরেও যুদ্ধকালে ধর্ষণে জন্মানো মানুষদেরকে 'যুদ্ধশিশু' বলে ডাকা হয়ে থাকে।

যুদ্ধশিশুদের মায়েরা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে, তারা যুদ্ধকালের যৌন-সন্ত্রাস বা লাঞ্ছনার শিকার। জোরপূর্বক গর্ভধারণের শিকার তারা। যখন ধর্ষকদেরকে বিয়ে করার জন্য বাধ্য করা হয় এসব মা-দেরকে, তখন তারা হয়ে পড়ে জোরপূর্বক বিয়ের শিকার। ধর্ষণের শিকার নারীদেরকেই সে সমাজে ধিক্কার দেয়া হয় সেখানে এসব মা সামাজিক অবমাননা এবং বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। ধর্ষণের ফলে জন্ম হওয়া শিশুটি তার মায়ের পবিত্রতা-চ্যুতির সুস্পষ্ট প্রমাণ! অনেক সমাজে ঘরে ফিরে আসার পরে এসব নারীকে মেরে ফেলে পুরুষেরা। অতএব, এমনতর সমাজে বা সামাজিক পরিবেশে যুদ্ধশিশুর লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজাতভাবেই বিপজ্জনক। এছাড়াও, মানতে হবে যে, যেসব ধর্ষিত নারী শিশুদেরকে পরিত্যাগ করে তারা বেশিরভাগ সময়ে বাধ্য হয়েই সেটা করে থাকে। সেরকম ক্ষেত্রে মা এবং পরিত্যক্ত শিশু দুজনেই শিকার হয় সামাজিক অপমানের।

এরকম এক স্পর্শকাতর বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আইনি কার্যক্রমে 'যুদ্ধশিশু' থেকে গেছে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য! আজ পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, মানবিক সাহায্যে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা, শান্তিরক্ষী এবং যুদ্ধোত্তর বিচার স্থাপনের প্রচেষ্টা – সবপক্ষই বিষয়টাকে এড়িয়ে চলেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সুবিচার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অদৃশ্য যুদ্ধশিশুদের দৃশ্যমান করার প্রয়াসেই এই লেখা। এই প্রয়াসে রয়েছে বিভিন্নরকমের বিবেচ্য প্রশ্ন। যুদ্ধশিশুদের বিচারের রূপরেখা কী হবে? যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান কাঠামো কি যথেষ্ট? যুদ্ধশিশুদের সমস্যা বিবেচনার সামনে কি ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে? যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে যুদ্ধশিশুদের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কি সম্পূর্ণ নতুন কোনো কৌশলী পন্থা প্রয়োজন?

এসব প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক যুদ্ধশিশুই এখনো পরিণত বয়স্ক হয়নি; বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত যুদ্ধে। কাজেই অতি কম বয়সে যুদ্ধশিশুদের নিজেদের জন্য বিচার প্রার্থনা করা অসম্ভব। শুধুমাত্র বড় হয়ে নিজেদের, অন্যান্য যুদ্ধশিশু, নিজেদের মা এবং অন্যান্য ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে বিচারের জন্য সোচ্চার হতে পারে। যেমনটা করেছে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু রায়ান বাদল (দ্রষ্টব্য: রেমন্ড প্রভেনশার নির্মিত তথ্য-চলচ্চিত্র 'ওয়ার বেবিজ')। যুদ্ধশিশুরা যখন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘৃণিত এবং বিচ্ছিন্ন, তখন তাদের পক্ষে থাকে না কোনো শক্তিশালী কণ্ঠ। এই বাস্তবতাই

নির্দেশ করে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার মুখপাত্রদেরকে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে যুদ্ধশিশুদের চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

মানবাধিকার হরণ এবং যুদ্ধাপরাধের শিকার হওয়া মানুষদের পক্ষে বিচার নিশ্চিত করার জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহ প্রকাশ করছে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ, নীতিনির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে গড়ে উঠেছে সন্তোষজনক সংখ্যক আইনি সহায়তা সংস্থা। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিচার সুনিশ্চিত করার প্রয়াসে বিচারকার্য, ট্রুথ কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা ক্ষমা প্রার্থনাসহ বিভিন্ন ধরনের আইনি ও রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারের সামনে নিয়ে আসার বিষয়টা নতুন নয়। নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালের পরে অনেক রাষ্ট্রই এই প্রয়াসে এগিয়ে এসেছে। বিচারের রায় হিসেবে ক্ষতিপূরণের ওপরেও নির্ভর করেছে অনেক রাষ্ট্র। যাহোক না কেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিচার নিশ্চিত করার পন্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কোনো উদাহরণ নেই। যুদ্ধশিশু সংশ্লিষ্ট বিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধানের আগে এসব পন্থার সবলতা এবং দুর্বলতার চিত্রে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে নির্ভরযোগ্য দুটি পন্থা হল: **শাস্তিমূলক** (punitive) বিচার এবং **নিরাময়মূলক** (restorative) বিচার। শাস্তিমূলক বিচারের আওতায় যুদ্ধাপরাধী এবং মানবাধিকার লংঘনকারীদেরকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার ওপরে জোর দেয়া হয়। অন্যদিকে, ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ থেকে উঠে আসা সমাজে, নিরাময়মূলক বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য থাকে সামাজিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। ট্রুথ কমিশন এবং ক্ষমা প্রার্থনার মতো কৌশলগুলো নিরাময়মূলক বিচারের উদাহরণ। ক্ষতিপূরণকে শাস্তিমূলক বিচারের শ্রেণিভুক্ত করা যায় কারণ এর মাধ্যমে অপরাধী পক্ষের ওপরে জরিমানা ধার্য করা হয়।

অপরাধ এবং জবাবদিহিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাস্তিমূলক বিচার। এই বিচারের লক্ষ্য থাকে ব্যক্তির যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাধিকার লংঘনে অপরাধীর অপরাধের শাস্তি; এটা এড়িয়ে যায় সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ (যেমন, পাকিস্তানি শাসকের নির্দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দলবদ্ধভাবে হত্যা-ধর্ষণ করেছে) সন্ত্রাস-সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়। তার মানে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাধিকার লংঘনে বিধ্বস্ত সমাজে শাস্তিমূলক বিচারের মূল উপাদান হল অপরাধীর অপরাধ শনাক্ত করা। সংঘবদ্ধ অপরাধের বদলে ব্যক্তি-অপরাধের ওপরে গুরুত্ব দেয়ার কারণে শাস্তিমূলক বিচারকে বিবেচনা করা হয় উপযুক্ত পন্থা হিসেবে।

ভয়াবহ সন্ত্রাসের মাঝ থেকে উঠে আসা সমাজে গণতান্ত্রিক আইনের শাসন

থাকার কোনো ঐতিহ্য দেখা যায়না। আবার কার্যকরী বিচারকাজ চালানোর মতো অর্থনৈতিক বা সামাজিক সম্পদেরও ঘাটতি থাকে। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয় যে, সেই অবস্থায় জাতীয় পর্যায়ে বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে থাকে বিরাট বাধা। উদাহরণস্বরূপ, রুয়ান্ডার জাতীয় আদালতের বন্দিশালায় রয়েছে ১২০,০০০ জন অভিযুক্ত আসামি। বর্তমানের গতিতে চললে, এসব বন্দিদের সকলের বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে লেগে যাবে ১৫০ বছর (সূত্র: নিউফার ২০০০)! তার মানে প্রকৃত সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের সনাতনী বিচার পদ্ধতি অবাস্তব।

জাতীয় আদালতগুলোতে বিচারকাজ পরিচালনা করার জন্য সবসময়ে আদর্শভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে না। সেজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, শাস্তিমূলক বিচার পরিচালনার জন্য, প্রতিষ্ঠা করেছে অস্থায়ী বা অ্যাড হক ট্রাইবুনাল। সমালোচকদের মতে, অ্যাড হক ট্রাইবুনালকে বিচার প্রতিষ্ঠায় বড়জোর সীমিত একটা পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সমালোচকরা চ্যালেঞ্জ করেছে নুরেমবার্গ এবং টোকিও ট্রাইবুনালের আইনগত গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। কারণ ওই বিচারে সংঘবদ্ধ এবং ব্যক্তির অপরাধের মাঝের সীমারেখাকে হালকা করে দেয়া এবং এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টোর মাধ্যমে বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সমালোচনায় আরো এসেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিচার পরিচালিত হয়েছে 'ভিক্টরের বিচার'-এর একটা বেআইনি/লক্ষ্যচ্যুত রূপে যেখানে মিত্র বাহিনীর অনুরূপ অপরাধকে এড়িয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ।

পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে অ্যাড-হক ট্রাইবুনাল। ওই ট্রাইবুনাল এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো এবং ভিক্টরের বিচার সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে সমর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও, প্রতিটি মামলায় ট্রাইবুনালটি মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারার জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। অতএব, আন্তর্জাতিক মাত্রায় যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য অ্যাড হক ট্রাইবুনাল কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান নয়। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) অ্যাড হক ট্রাইবুনালের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে।

শাস্তিমূলক বিচারের অনানুরূপভাবে, নিরাময়মূলক বিচারে প্রকৃত বিচার নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এখানে ব্যক্তি অপরাধীকে শাস্তিদানের বদলে, সংঘর্ষে লিপ্ত দলগুলোর মাঝে সামাজিক সম্পর্ক মেরামত/পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়ে থাকে। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে শাস্তিমূলক বিচারের তুলনায় নিরাময়মূলক বিচার অনেক বেশি কার্যকরী। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তি অপরাধের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির জবাবদিহিতার বদলে

পুরো দলকে দায়ী করা হতে পারে; আবার দলবদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির অপরাধের ওপরে বেশি গুরুত্ব দিলে দলবদ্ধ অপরাধের (যেমন, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অপরাধ) মাত্রা হালকা হয়ে যেতে পারে।

নিরাময়মূলক বিচারের বক্তারা প্রায়শ উল্লেখিত জটিলতা এড়ানোর জন্য ট্রুথ কমিশনকে মনে করেন সর্বোত্তম পন্থা। তারা আরো মনে করেন যে, অতীতের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রামাণ্য দলিল তৈরির ক্ষেত্রে ট্রুথ কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। স্বীকার করতে হয় যে, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গকে অপরাধী প্রমাণ করা বা তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় ট্রুথ কমিশন। তবে একথাও সত্য যে, সব না হলেও, কিছু সংখ্যক ট্রুথ কমিশন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরাধীদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদান করে থাকে। দলবদ্ধ বিবেচনার ক্ষেত্রে দলবদ্ধ বিবেচনার একটা বিশেষ সুবিধা হল, ট্রুথ কমিশন মেনে নেয় যে, বেশিরভাগ যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে একটা বাস্তবতা হল – আক্রান্ত এবং আগ্রাসীর মধ্যে বিভাজন রেখাটি সুস্পষ্ট থাকে না। আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি বাস করেন যারা একইসঙ্গে আক্রান্ত এবং আগ্রাসী! অতএব, এটা স্পষ্ট যে, বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ট্রুথ কমিশন, শাস্তি প্রদানের বদলে, জোর দেয় সামাজিক চাপমুক্তি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায়।

ট্রুথ কমিশনের অনেক শক্তিশালী দিক থাকলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিচার প্রতিষ্ঠায় এটা একটা অসম্পূর্ণ কৌশল। সাধারণত এতে থাকে সীমিত নির্দেশমালা বা ম্যান্ডেট। ফলে, কোনো সরকার কর্তৃক পরিচালিত অত্যাচার এবং সন্ত্রাস সম্পর্কিত সত্যের ব্যাপক অনুসন্ধানের পথে বাধারূপে কাজ করে এই সীমাবদ্ধতা। এছাড়াও, প্রায়শ ট্রুথ কমিশন কাজ করে সীমিত সময় ও সম্পদ নিয়ে। ফলে সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন বা প্রকাশিত হয় না। পক্ষে বিভিন্ন দাবি থাকলেও, সমালোচকদের মতে ট্রুথ কমিশন স্বাভাবিক বিচারের চেয়ে উন্নততর নয়। ট্রুথ কমিশনের অভিমতে অত্যাচারীদের শাস্তি প্রদান না দেয়ার জন্য অত্যাচারিত মানুষের মনে স্থায়ী ক্ষোভ থেকে যেতে পারে; ফলে, ধীরে ধীরে চাপা ক্ষোভ প্রকাশিত হয়ে, সামাজিক মেরামতের বদলে, আবার দেখা দিতে পারে ধারাবাহিক সন্ত্রাস। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন (টিআরসি) যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তার উল্লেখ বিষয়টিকে পরিষ্কার করবে। টিআরসি-র অংশ হিসেবে ক্ষমা প্রক্রিয়ার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট বৈষম্যের শিকার হওয়া অনেক আফ্রিকান মানুষ। তাদের কারো কারো

মতে টিআরসি ছিল শুধুমাত্র 'ফাঁপা ক্ষমা এবং শূন্য বা অকার্যকর পুনর্মিলন'।

আমাদের বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক সরকার এবং তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রত্যক্ষ আদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আমাদের বাংলাদেশে, পরিচালিত করে অত্যাচার-নিপীড়ন-জ্বালাও-পোড়াও অর্থাৎ ধ্বংসযজ্ঞ এবং ধর্ষণলীলা। নয় মাস ধরে চলে তাদের ওই অসভ্য অভিযান। মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয় সেই বর্বরতা। এখানে পাকিস্তানি কোন্ সেপাই বা কোন্ অফিসার কোন্ বাঙালিকে হত্যা করেছে বা অত্যাচার করেছে বা ধর্ষণ করেছে সেটা প্রথমত গৌণ এবং দ্বিতীয়ত বাস্তবতার নিরীখে শনাক্তযোগ্য নয়। অতএব, প্রায় চার দশক পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জোরদার দাবীর প্রেক্ষিতে, বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে, অত্যাচারিতকে আদালতে মামলা করতে বলা প্রকৃতপক্ষে তার ওপরে মানসিকভাবে একই অত্যাচার করার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়! প্রসঙ্গত বলতেই হয় যে, ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে মামলা করবে কে? তিনি নিজে কোনো হত্যা করেননি বা ধর্ষণও করেননি! তিনি শুধু এসব করার আদেশ দিয়েছিলেন! মূল কথাটা হল, একাত্তরের বাংলাদেশে জাতিসত্তা ধ্বংসের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিচালনা করার যুদ্ধাপরাধ করেছে প্রথমত জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এবং তার সামরিক সঙ্গীরা [পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও জিওসি জেনারেল টিক্কা খান, চিফ অব স্টাফ জেনারেল পীরজাদা, সিকিউরিটি চিফ জেনারেল ওমর খান এবং ইনটেলিজেন্স চিফ জেনারেল আকবর খান]। দ্বিতীয়ত যুদ্ধাপরাধ করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তৃতীয়ত যুদ্ধাপরাধ করেছে বাংলাদেশের জামাতে ইসলামী (পরবর্তীকালের জামায়াতে ইসলামী), ছাত্রসংঘ (পরবর্তীকালের ছাত্র শিবির), নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং সংশ্লিষ্ট দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনী, আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী। এক কথায় এদেরকে অভিহিত করা যায় 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দালাল-চক্র' হিসেবে। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ার কারণে 'পাকিস্তানি'-রা দায়ী; অর্থাৎ সকল পাকিস্তানি নাগরিক বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অপরাধী - আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কথা বলা ঠিক নয়। সেটা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং অসার।

যুদ্ধের পরে শত্রুকে চিহ্নিত করার কোনো অবকাশ না থাকায় প্রত্যক্ষভাবে কোনো মামলা করার কোনো বাস্তবতা ছিলনা। যদিও আদালতে অনেক মামলা রুজু হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষের হাতে অস্ত্র থাকার কারণে হ্যাইজ্যাক থেকে শুরু করে নানা ধরনের অপরাধ ঘটছিল। বিশেষত ব্যক্তিগত

আক্রোশে সুযোগ বুঝে 'রাজাকার, রাজাকার, ধর, ধর' বলে গণপিটুনীকে হত্যার ঘটনাতে বেসামাল হতে যাচ্ছিল পরিবেশ। সেরকম এক নাজুক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন তার 'ঐতিহাসিক সাধারণ ক্ষমা'। যদিও ওই ক্ষমার আওতায় এসেছিল অপরাধীদের একটি অংশমাত্র; তবে, পরিবেশের উন্নতি ঘটে লক্ষণীয়ভাবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে, কয়েক বছর চুপচাপ থেকে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই, সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের বদান্যতায় জামাতে ইসলামী আত্মপ্রকাশ করে 'জামায়াতে ইসলামী' এবং ছাত্র সংঘ আত্মপ্রকাশ করে 'ছাত্রশিবির' নামে। এরপর থেকে আজ অবধি, বাংলার মানুষের বিজয়ের বিরুদ্ধে এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষের বিরুদ্ধে একটানা চলছে তাদের 'স্বঘোষিত এবং স্বরচিত' জিহাদ!

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। যুদ্ধপরবর্তীকালে, আটক যুদ্ধবন্দি ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের কথা বঙ্গবন্ধু বারবার বিভিন্ন বক্তৃতায় জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, সিমলা চুক্তির আলোচনার সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলে বসেন যে, ওই আটক পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বিচার করা হলে, পাকিস্তানে আটক বাঙালি সেনা অফিসারদের ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচার করে হত্যা করা হবে। অন্যান্য সাধারণ বাঙালিদেরও একই পরিণতির আভাস দেন। সেই নাজুক পরিস্থিতিতে, সিমলা চুক্তির আওতায়, পাকিস্তানি আটক সেনা কর্মকর্তাদের মুক্তির বিনিময়ে, পাকিস্তানে আটক বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীকালে সেসব বাঙালি সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রতি কোনোরকমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো উদাহরণ জাতি প্রত্যক্ষ করেনি। বরং সমালোচকরা প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিল, জাতিকে বারবার কথা দিয়েও, সিমলা চুক্তিতে আটক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদেরকে বিচার না করতে পারার কারণে সেদিন বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক পরাজয় (!) ঘটেছিল এবং ভুট্টোর হয়েছিল কূটনৈতিক বিজয়! "সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ। কি বিচিত্র এদেশের মানুষ।"

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদেরকে তথাকথিত 'সাধারণ ক্ষমা' করে দেয়ার বিষয়টি জামায়াত-শিবির তথা মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি এমনভাবে চারদিকে প্রচার করেছে যে, গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যাই হয়ে উঠেছে সত্য! সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা এক নিরেট মিথ্যাচার। চলুন ফিরে দেখি ইতিহাসের সত্যকথন।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে, মাত্র ১৪ দিনের মাথায় ২৪শে

জানুয়ারিতে, পাকিস্তানি দালাল/ রাজাকার/ আল-বদর/আল-শামস এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগীদের বিচার করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু জারি করেন রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৮ 'স্পেশাল ট্রাইবুনাল অর্ডার ১৯৭২'। ওই আদেশের আওতায় গ্রেফতার করা হয় ৩৭,০০০ অভিযুক্ত মানুষকে। পরে এদের মধ্যে ২৬,০০০ জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট বা গুরুতর অভিযোগ (ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা বা ধর্ষণ) না পাওয়ায় এদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন সাধারণ ক্ষমা। বাকিদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে মামলা। ৮০০ জনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে শাস্তি প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার সময়েও ১১,০০০ চিহ্নিত দালাল, রাজাকার বা আল-বদর ছিল বিচার প্রক্রিয়ার অধীনে। এদের মধ্যে ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী এবং শীর্ষস্থানীয় জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান। তাদের জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে কোনোরকমের ক্ষমা করা, করুণা প্রদর্শন বা মুক্তি দেয়ার মতো কোনো কিছুই ঘটেনি।

১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক, বাংলাদেশ সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ ধারা অনুযায়ী, ধর্ম-ভিত্তিক সকল রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ই নভেম্বরে প্রবর্তিত হয় বাংলাদেশ নাগরিক আইন। ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিলে গেজেট জারি করার মাধ্যমে গোলাম আযম এবং তার অপরাধের দোসরদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়া হয়। এসময়েই পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকার জারি করে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন ১৯৭৩'।

১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে সেসময়ের সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান বাতিল করে দেয় 'বাংলাদেশ অপরাধ আইন' এবং 'দালাল আইন'। মুক্তি দিয়ে দেন শাস্তিপ্রাপ্ত ৮০০ জন এবং বিচারাধীন সকল বন্দিকে! এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ই জানুয়ারিতে জিয়া সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদেরকে নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়! সেই অনুসারে, নাগরিকত্ব হারানো এবং দেশান্তরী গোলাম আযম গং, অন্যান্য দালাল, রাজাকার এবং আল-বদর সদস্যদেরকে বাংলাদেশে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রবাসে ১৯৭৩ সালে গোলাম আযমের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' [সূত্রঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা - 'লন্ডন ষড়যন্ত্র']! ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সম্প্রচার মাধ্যম থেকে বাংলাদেশকে 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে অভিহিত করা হতো! যাহোক, বিশেষত পাকিস্তান এবং সৌদি আরব থেকে ফিরে আসে সব কুলাঙ্গারেরা। ফিরে আসার পরে সবাইকে

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়! বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে সৌদি আরবের মতো দেশগুলো। এভাবেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্রের উত্তরোত্তর সাফল্য (!) বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপরে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সদম্ভে উচ্চারিত হয় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির জিন্দাবাদের ধ্বনি - 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'! প্রাণের ধ্বনি মুক্তির ধ্বনি পাকিস্তানিদের আতঙ্কের ধ্বনি 'জয় বাংলা' চলে যায় নির্বাসনে! একই দিন থেকে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে চট্টগ্রামে স্থাপিত প্রথম বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধকালের নয়মাস ধরে মুজিবনগর থেকে সম্প্রচারিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' উত্তরাধিকার জাতির কণ্ঠ 'বাংলাদেশ বেতার' হয়ে যায় 'রেডিও বাংলাদেশ'! আর মুক্তি পাওয়া, নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া, আবার ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতি করার অধিকার লাভ করা সেইসব দালাল-রাজাকার-আলবদর-আলশামসের সদস্যরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি তোলে, "স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, লও লও লও সালাম!"

এই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা আজো চলমান। ঢাকায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর মূল স্বাধীনতার ঘোষণাটি, বেতারে প্রচারকারীদের মধ্যে মেজর জিয়া ছিলেন চতুর্থ ব্যক্তি। কিন্তু ১৯৭৫ সাল থেকে মেজর জিয়াকেই অযৌক্তিকভাবে স্বাধীনতার মূল ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ প্রয়াস চলছেই। চট্টগ্রামের 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম প্রচারক চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জনাব এম এ হান্নানের নামে স্থাপিত হয় 'এম এ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবরে জামায়াত-বিএনপি জোট ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বিমান বন্দরের নাম বদলে ফেলে! নতুন নাম হয় 'শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। দেয়ালে আঁকানো হয় জিয়ার বেতার ঘোষণা প্রচারের চিত্র সম্বলিত ম্যুরাল। কিন্তু, নাম বদলানোর উদ্যোগী ষড়যন্ত্রকারীরা এতটাই অর্বাচীন বা অন্ধ ছিল যে ওই ম্যুরালচিত্রে (শিল্পী মৃণাল হক অঙ্কিত) লিখে ফেলেন, "আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের *স্বাধীনতা যুদ্ধ* ঘোষণা করছি...।" এটা কি জেনে, নাকি, না জেনে ভুল! লক্ষণীয় যে, এই লেখায় জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, করেছেন স্বাধীনতা 'যুদ্ধের' ঘোষণা। এটা পরোক্ষভাবে এবং সুকৌশলে মিথ্যাচারকে 'গ্রহণযোগ্য' করানোর অপকৌশল মাত্র।

প্রসঙ্গ, এবং প্রসঙ্গান্তরে, ক্ষুদ্র পরিসরে ওপরে বর্ণিত এই পরিচিত্র নির্দেশ করে যে, বিচারের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক এবং নিরাময়মূলক মডেল প্রাধান্য দিয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যকে এবং বিচার সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়। শাস্তিমূলক মডেলের ধারণায় বিচার অর্জিত হয় অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়ে এবং সামগ্রিক অপরাধের ওপরে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে ব্যক্তির অপরাধকে। অন্যদিকে, নিরাময়মূলক মডেলের ধারণায় বিচার অর্জিত হয় সামাজিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির অপরাধের ওপরে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে সামগ্রিক অপরাধকে। এই স্পষ্ট পার্থক্যের প্রেক্ষিতে এবারে দৃষ্টি দেয়া যাক কোন পন্থার বিচার প্রযোজ্য হতে পারে আমাদের আলোচ্য যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচারের প্রচেষ্টায়।

যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার : শাস্তি না নিরাময়? : ওপরের আলোচনায় দুটি পন্থার বিচারের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি যতই ব্যাপক হোকনা কেন, আজ পর্যন্ত একটি বিষয় থেকে গেছে একই রকমের! যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে দুইপন্থাই এড়িয়ে গেছে যুদ্ধশিশুদের বিষয়টিকে। এই অবহেলার কারণেই আন্তর্জাতিক আইন এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুদ্ধশিশুদের অবস্থানটি প্রায় অদৃশ্য। যুদ্ধোত্তর বিচার প্রক্রিয়ার প্রবক্তারা ইচ্ছা করে আক্রান্ত মানুষের অবিচ্ছেদ্য 'একটি শ্রেণি' হিসেবে এড়িয়ে যায়নি। বরং, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত সমাজের কোনো প্রান্তরেখায় বসবাস করা যুদ্ধশিশুদেরকে তারা 'দেখতেই' পায়নি!

আবার বিদ্যমান বিচারের পন্থাগুলো যুদ্ধশিশুদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েও থাকতো, এটা স্পষ্ট নয় যে, বিচার নিশ্চিত করার জন্য এসব পন্থাগুলো উপযোগী হতো। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-অপরাধীকে প্রয়োজন। অতএব যুদ্ধশিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন হল: কারা অপরাধী? একটি মাত্রায় এর উত্তরটি খুবই সরল। যারা 'যুদ্ধশিশুদের মাদেরকে' ধর্ষণ করেছে এবং জোর করে গর্ভবতী করেছে, তারাই অপরাধী। এই মাত্রায়, সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ব্যাপক পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন পড়েনা। ধর্ষণ এখন আন্তর্জাতিক আইনের ঘোর পরিপন্থি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ, মনে করা যেতে পারে যে, যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতা সামান্য বাড়িয়ে যুদ্ধশিশুকে যুদ্ধকালের ধর্ষণে আক্রান্ত মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেই হয়ে যাবে সমাধান।

তবে, এই ধারণাটি আপাত দৃষ্টিতে যতটা সরল বলে মনে হয়, ততটা নয়। মানবাধিকার লংঘনের শিকার হিসেবে যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচারের ক্ষেত্রে

প্রাথমিকভাবে অপরাধীরূপে ধর্ষকদেরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে, অপরাধীদের শ্রেণিবিন্যাস করাটা যথেষ্ট জটিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যুদ্ধকালে আগ্রাসী ধর্ষকরা ধর্ষণ করে থাকে 'বিশেষ নির্দেশের' কারণে। এসব ক্ষেত্রে, যদি গর্ভধারণের বিষয়টি ঘটে যায়, তাহলে ওইসব ধর্ষকদেরকে প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয় বরং বিবেচনা করতে হয় আরো এক শ্রেণির 'শিকার' হিসেবে। আরো বলতে হয় যে, যুদ্ধকালের ধর্ষণে ধর্ষকই 'একমাত্র অপরাধী পক্ষ' নয়। গর্ভপাতের বিরোধীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে, যেসব ধর্ষিতা মা গর্ভপাত করায় তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্ম না দেয়া ভ্রুণের বিরুদ্ধে সংঘটিত করে 'সন্ত্রাসী অপরাধ'। আর ধর্ষিতা মায়েরা, জন্মদানের পরে সদ্যোজাত যুদ্ধশিশুকে মেরে ফেললে, তারাও হয়ে যায় 'শিশুহত্যার অপরাধী'। এছাড়াও, যুদ্ধশিশুদের মায়েরা যখন তাদের নিজ নিজ শিশুকে পরিত্যাগ করে, তখন সেসব শিশুদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য প্রায়শ পরোক্ষভাবে দায়ী হয়ে যায় তাদের মায়েরা। অন্যদিকে, সমাজের যেসব মানুষ যুদ্ধশিশুদেরকে সমাজচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন করে অথবা বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেসব মানুষকে, যুদ্ধশিশুদেরকে তাদের প্রাপ্য মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে 'অপরাধী' হিসেবে গণ্য করা যায়। এমনকি সমাজের যেসব মানুষ এমনতর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে যা এমন চাপ সৃষ্টি করে যার কারণে যুদ্ধশিশুরা চলে যায় সমাজের প্রান্তরেখায়; তাদের ভাগ্যে জোটে নাজুক অবস্থান।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে যুদ্ধশিশুদের জন্য কিছুটা হলেও একটা লজ্জাজনক অবস্থান মেনে নিতে হয়। তার মানে এই নয় যে, যুদ্ধশিশুদেরকে সমাজের একপাশে ঠেলে দেয়ার কারণে, সমগ্র সম্প্রদায়কেই বিচারের সম্মুখীন করতে হবে! আবার, এটাও অবাস্তব যে, যেসব নারীরা ভয়াবহ রকমের অত্যাচারের শিকার হয়েছে তাদেরকেই, ভ্রুণ-হত্যা, শিশু-হত্যা বা শিশু পরিত্যাগের অপরাধে বিচারের উদ্যোগকে স্বাগত (!) জানাবে জাতীয় সমাজ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। সেধরনের উদ্যোগ সম্ভবত যুদ্ধশিশুদের প্রতি বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির মাত্রাই বাড়িয়ে তুলবে এবং সামাজিকভাবে তাদেরকে আরো দূরে ঠেলে দিবে। চূড়ান্তভাবে, যুদ্ধশিশুদেরকে আইনের দর্শনের শিকার হিসেবে বিবেচনা করলে উত্থাপিত হবে আরো এক বেদনাদায়ক বিষয়। আগেই বলা হয়েছে যে, যুদ্ধশিশু শ্রেণিটির মৌলিক সমস্যাটি হল তাদের জন্মই তাদেরকে 'শিকারে' পরিণত করেছে [জন্মই যাদের আজন্ম পাপ!]। আবার সেই জন্মই যাদের অস্তিত্বের উৎস, তাদের জন্মকে সমাজে ক্ষতিকারক (!) একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা অনুচিত; একই কারণে আইনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগটিও মূলত আমাদের ব্যর্থতা।

শাস্তিমূলক বিচারের উদ্যোগটি বিশেষভাবে সমস্যাগ্রস্ত হতে পারে কারণ এর ফলে যুদ্ধশিশু এবং তাদের মা'দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে পারে দ্বন্দ্ব বা সংশয়; যদিও, জোর করে ধর্ষিতা এবং গর্ভবতী হয়ে পড়া নারীরাই গর্ভপাত করে থাকে। যুদ্ধশিশুদের সুবিশাল সমস্যার অংশ হিসেবে জোর করে গর্ভধারণের বিষয়টির প্রেক্ষিতে গর্ভপাতকে বিবেচনা করা হলে, তাহলে শাস্তিমূলক বিচার ব্যবস্থা কি বলতে পারে যে, যারা ধর্ষিতা এবং গর্ভবতী হয়ে গর্ভপাতকে বেছে নেয় তাদেরকেই বিচারের সামনে নিয়ে আসতে হবে। যুদ্ধকালে সংঘটিত সন্ত্রাসের শিকারের একটি শ্রেণী হিসেবে যুদ্ধশিশুদেরকে দৃশ্যমান করার প্রচেষ্টা সহজ হয়না, সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি-আচারে যৌন-সন্ত্রাস সম্পর্কে স্বাভাবিক নীরবতার কারণে। অন্যকথায়, শাস্তিমূলক বিচারের উদ্যোগে ধর্ষিতা নারীদেরকে অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করলে যুদ্ধশিশুরা চলে যাবে সমাজের আরো প্রান্তরেখায়। সার্বিক প্রেক্ষিত যখন বিবেচ্য হবে, তখন যুদ্ধশিশুদের নাজুক অবস্থানের জন্য কাকে শাস্তি দেয়া হবে? ধর্ষক, নাকি ধর্ষিতাকে! নাকি উভয়কেই! অধিকাংশ যুদ্ধশিশুই তাদের প্রাপ্য অধিকার না পাওয়ার জন্য আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে অসমর্থ থাকে। বড় হতে হতে কেটে যায় অনেক বছর। অতীতের এক ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের বিচার চাওয়াটা প্রায়শ আর তেমন সাড়া পায়না। যেখানে ধর্ষিতা জন্মদাত্রী মায়েরা এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যুদ্ধশিশুদেরকে পরিত্যাগ করেছে, সেখানে ওইসব যুদ্ধশিশুদের পক্ষে কে উত্থাপন করবে অভিযোগ? সম্ভবত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব এই কঠিন কাজটি করা।

শাস্তিমূলক বিচার প্রয়াসে এই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার প্রভাব পড়ে যুদ্ধশিশুদের ওপরে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার এবং শাস্তিপ্রদান সবসময়ে সামাজিক ধরনের সন্ত্রাসকে বিবেচনায় আনে না। যেক্ষেত্রে, ধর্ষকের বিচারে যুদ্ধশিশুকে দ্বিতীয় শিকার হিসেবে বিবেচনা করে, সেটাই যথাযোগ্য বিচার পদ্ধতি।

নিরাময়মূলক বিচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বেশি করে প্রতিশ্রুতিশীল; তবে উল্লেখজনক বাধাও রয়েছে এক্ষেত্রে। যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচারের ক্ষেত্রে ট্রুথ কমিশনের অবদানের পন্থাগুলো স্পষ্ট। কারণ, ট্রুথ কমিশনের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হল যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে অতীতের অত্যাচার সম্পর্কিত একটা প্রমাণিক দলিল প্রণয়ন করা। ঐতিহাসিক সন্ত্রাসকে অস্বীকার করার প্রয়াসকে বাধা দেয় ট্রুথ কমিশন। ট্রুথ কমিশনের মতে সন্ত্রাস এবং অত্যাচারের স্বীকৃতিও আক্রান্ত মানুষের পক্ষে এক ধরনের বিচার। আবার 'সত্যের' প্রামাণিক দলিলের কারণে একই সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তিকেও বাধা দেয়। এই পন্থায় যুদ্ধশিশুদেরকে দৃশ্যমান

করা এবং ট্রুথ কমিশনের ম্যান্ডেটে অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট। এটুকুর মাধ্যমেই আদর্শগতভাবে সচেতনতা বাড়িয়ে যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার পাওয়ার পথে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৭৪ সাল থেকে গঠিত একুশটি ট্রুথ কমিশনের ছয়টির (বলিভিয়া, চিলি, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, শ্রীলংকা এবং চিলি) সামনে, সময়ের ব্যাপ্তির কারণে, 'টিনএজার' যুদ্ধশিশুরা সাক্ষী দিতে সমর্থ হয়েছিল। আরো ছয়টির (জার্মানি, গুয়েতেমালা, নেপাল, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উগান্ডা) সামনে, প্রলম্বিত সময়ের কারণে, পরিণত বয়সের যুদ্ধশিশুরা সাক্ষী দিতে সমর্থ হয়েছিল।

যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্বই যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সংঘর্ষ-যুদ্ধবিগ্রহ-সন্ত্রাসের প্রতীক! এটাই যুদ্ধশিশুদের নাজুক অবস্থানের মূল কারণ। একদিকে, এটা সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করে যে কেন যুদ্ধশিশুদেরকে প্রায়শ হত্যা, ঘৃণা বা পরিত্যাগ করা হয়; যুদ্ধে আক্রান্ত মানুষদের কাছে তারা প্রতিনিধিত্ব করে সংঘটিত সন্ত্রাস এবং 'শত্রুর'! অন্যদিকে, যুদ্ধের বিধ্বস্ততা কাটিয়ে ওঠার পরে সমাজ যুদ্ধশিশুদের মা এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে আগ্রহী হতে পারে – এটা একটা সম্ভাবনা মাত্র। এটাও একটা সম্ভাবনা যে এর মাধ্যমে শত্রু এবং শিকারের মধ্যে পার্থক্য-রেখা কিছুটা হলেও ফিকে হয়ে যেতে পারে। সমাজ-সম্প্রদায় যদি, সংঘটিত সন্ত্রাসী পরিবেশ এবং ধর্ষকের অমানবিকতা সত্ত্বেও, যুদ্ধশিশুর মানবিকতাকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে সেই স্বীকৃতিই হয়ে উঠবে সামাজিক মেরামতের প্রথম ধাপ। আরো সমস্যা রয়েছে। যুদ্ধশিশুদেরকে স্বীকৃতি দিলেই ট্রুথ কমিশন তাদের জন্য সুবিচারের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হয়না। যুদ্ধে নারীদের বিরুদ্ধে যৌন-সন্ত্রাসকে এ পর্যন্ত ট্রুথ কমিশন যা করেছে তা নির্দেশনামূলক; 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত অপরাধ'-এর আওতায় ধর্ষণ এবং অন্যান্য যৌনসন্ত্রাসকে বিবেচনা করেছে 'অরাজনৈতিক অপরাধ' হিসেবে। এই প্রেক্ষিতে, বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এখনো পর্যন্ত যুদ্ধশিশুদেরকে যুদ্ধ-সন্ত্রাসের শিকার হওয়া একটি শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেনি ট্রুথ কমিশন।

প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়ার অনানুরূপভাবে ট্রুথ কমিশনের বিচারের ভিত্তি হল একটি অ-শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে যৌন-সন্ত্রাসের শিকাররা নিজেদের অভিজ্ঞতার সাক্ষী দিতে অনাগ্রহী বা দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। ফলে, যুদ্ধশিশুরা থেকে যায় একই তিমিরে। নিজেদের ওপরে সংঘটিত অত্যাচারের সাক্ষী দিতে অনাগ্রহী ধর্ষিতারা জন্ম দেয়া, এবং বিশেষ করে পরিত্যাগ করা, যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কেও একই মনোভাব দেখাবে সেটাই স্বাভাবিক। এটা আশা করা যায়না যে কমবয়সী যুদ্ধশিশুরা নিজেদের সাক্ষী নিজেরাই দিবে। এক্ষেত্রে সাক্ষী দেয়ার জন্য কোনো

ন্যূনতম বয়সও নির্ধারিত নেই। বয়স্ক বা পরিণত বয়সের যুদ্ধশিশুরা হয়তো ট্রুথ কমিশনের সামনে সাক্ষী দিতে সমর্থ হবে। আর এটা করতে পারলে তারা মানসিকভাবে কিছুটা শক্তিশালীও হয়ে উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে ট্রুথ কমিশন গঠিত হয় সংঘটিত সন্ত্রাসী অচলাবস্থার কাছাকাছি সময়ে। এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধশিশুরা কমবয়সী হওয়ার কারণে ট্রুথ কমিশন সম্পূর্ণ উপযুক্ত পন্থা নয়। এমনকি বড় যুদ্ধশিশুরাও আবেগময় বেদনাক্লিষ্ট হওয়ার কারণে এই পন্থাটি উপকারীর চেয়ে বেশি করে অপকারীও হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে বলতে হয় যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিচারের প্রয়াসে বিদ্যমান পন্থাসমূহ যুদ্ধশিশুদের জন্য উপযোগিতার ক্ষেত্রে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। ধর্ষকদের শাস্তি প্রদান করার মাধ্যমে শিকার হিসেবে যুদ্ধশিশুদের জন্য আংশিক বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; কিন্তু, এতে সমাজে বসবাসকারী যুদ্ধশিশুদের প্রতি বৈষম্যের কোনো সমাধান সম্ভব নয়। যুদ্ধশিশুদের বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য ট্রুথ কমিশনকে অগ্রাধিকার দেয়া হলে তত্ত্বীয়ভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সংঘটিত সন্ত্রাসের সত্যচিত্র প্রতিভাত হয়। এমনকি সন্ত্রাসী সংঘর্ষে লিপ্ত পক্ষসমূহের সংযোগকারী মানবিকতার প্রতীক রূপেও প্রতিষ্ঠিত হয় যুদ্ধশিশু। বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সংস্কার হল যৌনসন্ত্রাসের শিকারদের সম্পর্কে নীরবতা পালন করা এবং এই কারণে যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যধারণের নিশ্চয়তা প্রদান করে না ট্রুথ কমিশন। মূলত ট্রুথ কমিশন, আগ্রাসী বা শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় বিচার বা শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে, সামাজিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে এই পন্থায় যুদ্ধশিশুদের চাহিদা পূরণ নাও হতে পারে। অতএব, পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে, যুদ্ধশিশু এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন নতুন কৌশল এবং উদ্যোগ।

যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচারের বিকল্প উদ্যোগ : যুদ্ধশিশুদের মনে জমে ওঠা দুঃখ-বেদনা লাঘব পেতে পারে ট্রমা থেরাপির মাধ্যমে। স্বীকার করতে হয় যে, এভাবে এককভাবে যুদ্ধশিশুদের বেদনা প্রশমনের প্রয়াস প্রচলিত বিশ্বাসের বিচারের সীমার বাইরে। যাহোক থেরাপির মাধ্যমে একজন শিকার চলে আসে প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে ট্রমা থেরাপি যুদ্ধশিশুর বেদনা প্রশমনে মানসিক উপায়-উপকরণ প্রদান করলেও, তার প্রতি সামাজিক বৈষম্যের বিষয়ে কোনোকিছু করতে অক্ষম।

আরেকটি বিকল্প হতে পারে যুদ্ধশিশু এবং তাদের মাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। বিচার প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নির্ভর করে যে

পরিবেশ-পরিকাঠামোতে সংঘটিত হয়ে থাকে সন্ত্রাস, তার ওপরে। যুদ্ধকালে যৌনসন্ত্রাসে আক্রান্ত নারী এবং যুদ্ধশিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে সৃষ্ট নাজুক অবস্থানের উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য-সমর্থন উপযোগিতা খুবই কার্যকরী। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সুবিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী জ্ঞানীগুণী এবং আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের কাছে যুদ্ধশিশুদের আন্তর্জাতিক দত্তকায়নের বিকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচনামূলক বিভিন্ন কারণে এই পন্থার বিরুদ্ধে আসে নানাবিধ বাধা। এর মধ্যে মূল যুক্তিটি হল যে, এটা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও রয়েছে এর সুযোগে শিশুপাচারের অভিযোগ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধশিশুদের প্রতীকী অবস্থানটি, সামাজিক মেরামতের প্রয়োজনে শত্রুপক্ষের মানবিক প্রেক্ষিতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ থেকে যুদ্ধশিশুদেরকে সরিয়ে ফেললে তারা আর এই ভূমিকা পালন করতে পারে না। তবে সরিয়ে ফেলার পরে যদি তাদের নিজেদের মৌলিক মানবাধিকার বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক দত্তকায়নকে বিবেচনা করা উচিত উপযুক্ত পন্থা হিসেবে। যাহোক, বর্তমানে যুদ্ধশিশুদের 'শত্রুর প্রতিনিধি' পরিচয় সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিবর্তন করাটাই হবে যুদ্ধশিশুদের জন্য প্রকৃত বিচার।

যৌনসন্ত্রাসের প্রতি সাড়া হিসেবে নীরবতার কারণে শিকার হিসেবে নারীদের অবস্থান চলে যায় সামাজের প্রান্তরেখায়। বেশিরভাগ নারীবাদী মনে করেন যে, যুদ্ধে আক্রান্ত শিকারদের বিচারের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল 'নীরবতা-ভঙ্গ' করা। তবে যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠার পথে এটাই যে সর্বোত্তম পন্থা নাও হতে পারে। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন যে যুদ্ধশিশুদের রক্ষায় এই নীরবতা একটি কার্যকরী অস্ত্র। এটা আশা করা যায়না যে, একটি সমাজ তার বুকে সৃষ্ট যুদ্ধশিশুদের স্বাগত জানাবে। সেক্ষেত্রে, তাদের অবস্থান, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা ও একীভূতকরণ সম্পর্কে নীরবতাই, জনসমক্ষে তাদের সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ বা জন্মপ্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে, তুলনামূলকভাবে বেশি উপযোগী।

কেনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখিত নীরবতা সম্পর্কে শক্ত যুক্তি থাকলেও, এসম্পর্কে সরব হওয়া এবং যুদ্ধকালে ধর্ষণ ও যৌন-সন্ত্রাসের শিকারদের একটি শ্রেণি হিসেবে যুদ্ধশিশুদেরকে, যুদ্ধে ধর্ষিতাদের পাশাপাশি, দৃশ্যমান করার পক্ষে রয়েছে আরো শক্ত যুক্তি। যতক্ষণ যুদ্ধশিশুদেরকে অদৃশ্য করে রাখা হবে ততক্ষণ তারা তাদের প্রাপ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েই থাকবে। যুদ্ধশিশুদেরকে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যর্থতার

মাধ্যমে শিশু অধিকারকে মানবাধিকার রূপে এগিয়ে নেয়ার কাঠামো হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সীমাবদ্ধতাই প্রকাশিত হয়। মানবাধিকার যদি বিশ্বের সকল মানুষের সর্বজনীন অধিকার হয়ে থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বিদ্যমান ফাঁক, যা যুদ্ধশিশুসহ শিশুদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে সীমিত করে দেয়, তা বন্ধ করতে হবে।

যুদ্ধকালে যৌন-সন্ত্রাসে আক্রান্ত নারীদের দুঃখকষ্টের সংবেদনশীলতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে না পারলে যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠা করার ফলাফল হয়ে যেতে পারে বিপরীত। অতএব, এক কথায় যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচারের প্রয়াসের ভিত্তি হতে হবে সযত্ন বিবেচনায়; যেন যুদ্ধশিশু এবং যুদ্ধনারীসহ যুদ্ধাক্রান্ত সকল শ্রেণির চাহিদার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারসাম্য।

সম্ভাব্য সমাধানের পথ : যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্রয়াসে যুদ্ধশিশুর অদৃশ্যমানতা প্রতিফলিত করে যে, আন্তর্জাতিক কর্মীরা ভুলভাবে ভেবে আসছেন – যুদ্ধ লিঙ্গমুক্ত একটি ঘটনা এবং এই কারণে সন্ত্রাসের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দেয়নি কোনো দৃষ্টি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে সন্ত্রাসের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যর্থতাটি বিশেষত যৌন-সন্ত্রাসে বেশ সুস্পষ্ট। আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ এখন বেশি করে দৃষ্টি দিচ্ছে লৈঙ্গিক প্রেক্ষিতের দিকে। এতে বোঝা যায় যে, পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

যদিও যুদ্ধশিশুদের অদৃশ্যমানতাই এই সমস্যার একটা বড় অংশ, যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার নিশ্চিত করার জটিলতাটা তার চেয়ে আরো বড়। তার মানে বিষয়টা এতটা সহজ নয় যে, [রেসিপিতে] 'যুদ্ধশিশুকে ঢেলে দেন আর নাড়তে থাকুন' বললেই সমাধান হয়ে যাবে। একদিকে, যুদ্ধশিশুদেরকে যুদ্ধকালে সংঘটিত সন্ত্রাসের শিকারদের একটি শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৌশল নির্ধারণ করাটা হবে প্রথম পদক্ষেপ। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ যদি যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দেয় বা মেনে না নেয়, তাহলে তাদের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে না। অন্যদিকে, যুদ্ধশিশুদেরকে দৃশ্যমান করলেই তাদের জন্য উপযুক্ত বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবেনা। যুদ্ধশিশুদের সমস্যার সমাধানে বিদ্যমান বিচার-পদ্ধতির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শাস্তিমূলক এবং নিরাময়মূলক প্রচলিত বিচার পদ্ধতির বদলে বিকল্প হিসেবে থেরাপি, আন্তর্জাতিক দত্তকায়ন, যুদ্ধশিশু ও মা-কে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদিকে বিবেচনায় নেয়া শ্রেয়। চূড়ান্তভাবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যুদ্ধশিশু ও ধর্ষিতা মায়েদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও বৈষম্য সংঘটনের পেছনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত লৈঙ্গিক

দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ছুড়ে দিতে হবে চ্যালেঞ্জ।

যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করার প্রয়াসটি অস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। বিশ্বজুড়ে আজ পর্যন্ত যুদ্ধশিশুদের বিষয়টিকে জ্ঞানী সমাজ শুধু এড়িয়েই যায়নি, সেইসঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার বিশ্বজনীন প্রয়াসে যুদ্ধশিশুদের অদৃশ্যমানতাকেই প্রতিরূপে তুলে ধরেছে। এক কথায় সমাধান দেয়া দুরূহ। এখানে যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বজুড়ে সম্ভাব্য পন্থা বা চলমান প্রয়াসকে আলোচনার মাধ্যমে হালকাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব আলোচনা তখনই সার্থক হবে, যখন যুদ্ধশিশুদেরকে ক্রমবর্ধমান হারে সন্ত্রাসী সংঘর্ষের শিকার হিসেবে তুলে ধরা হবে। আশা করা যায় যে, যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিনিধিরা তাদের এজেন্ডায় যুদ্ধশিশুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সেই সময়টি এলে, যুদ্ধশিশুদের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধাবিপত্তি এবং যুদ্ধশিশুদের পরিধির চারপাশে বিদ্যমান অপরিহার্য লৈঙ্গিক কাঠামো সম্পর্কে, নীতিনির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সুচিন্তিত জ্ঞান থাকতে হবে।

যুদ্ধশিশু এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি

সমাজের প্রান্তরেখায় অবস্থান করা যুদ্ধশিশুরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বেঁচে আছে; আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মারাও যায়। সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন, তবে এটা সুস্পষ্ট যে অনেক যুদ্ধাঞ্চলেই, ধর্ষণের ফলে, একটা বিরাট সংখ্যার যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছে বিশ্বজুড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের ধর্ষণলীলায় বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল ২৫,০০০ যুদ্ধশিশু। ১৯৯৪ সালে সুপরিকল্পিত ধর্ষণ অভিযানের ফলে রুয়ান্ডায় জন্ম হয়েছিল ১০,০০০ যুদ্ধশিশুর। সঙ্গত কারণেই আমাদের সমাজে-সংসারে যুদ্ধশিশুদের অবস্থান বেশ নাজুক। এমনকি যুদ্ধাক্রান্ত অঞ্চলের শিশুদের নিয়ে রচিত সাহিত্যেও কোনো স্থান হয়নি যুদ্ধশিশুর! যুদ্ধকালের ধর্ষণে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুরা কোনোমতে প্রবেশ করে আমাদের দৃষ্টিসীমায়; ধর্ষণকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতিদান, জাতিসত্তা ধ্বংসের একটি পন্থা এবং মানবাধিকারের চরম লংঘনের মাঝখানে কোনোমতে একটুখানি স্থান হয় সেসব অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীদের। মার্কিন গবেষক সিওভান ম্যাকেভয়-লেভি রচিত 'চিলড্রেন বর্ন অব ওয়ারটাইম রেপ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস কালচার' শীর্ষক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি মানবাধিকারের

প্রেক্ষিতে যুদ্ধশিশু, তাদের মা এবং সেইসঙ্গে, এমনকি ধর্ষকদেরও অধিকারের অবকাশ!

বাস্তব ক্ষেত্রে, ধর্ষণের মাধ্যমে উদ্ভূত অনেক শিশুকেই জন্মের আগে গর্ভপাত করা হয় এবং অন্যদেরকে জন্মের পরপরই মেরে ফেলা হয়। এরপরও বেঁচে যাওয়া যুদ্ধশিশুদের অবস্থান হয় যুদ্ধাক্রান্ত অঞ্চলের অন্যান্য পরিত্যক্ত, অনাথ এবং কলঙ্কিত শিশুদের মধ্যে। যুদ্ধ শেষ না হলে, চক্রাকারে এসব দুর্ভাগা যুদ্ধশিশুদেরকে বানানো হয় শিশু-সৈনিক, শিশু শ্রমিক এবং এমনকি যৌনদাস/দাসী! সৌভাগ্য হলে এসব যুদ্ধশিশুদের একটি অংশের পুনর্বাসিত স্থান হয় সমাজের মাঝে; তবে সেখানেও চিরকালের জন্য সে থাকে ভয়াবহ অতীতের স্বাক্ষর হয়ে।

যুদ্ধের শেষে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের অনেকেই এগিয়ে আসে মানবাধিকারের উন্নয়নে। ধারণা করা হয় যে, এসব উদ্যোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবাধিকার সংস্কৃতি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মানবাধিকার লংঘনকে বাধা দিতে সমর্থ হবে। এর মাধ্যমে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি বন্ধুবৎসল সমাজ। সাধারণত ট্রুথ কমিশনের সুপারিশমালায় এটা অন্তর্ভুক্ত থাকে। জোরপূর্বক মাতৃত্বে জন্ম নেয়া শিশুর অভিভাবকহীন অবস্থানের প্রেক্ষিতে এসব উদ্যোগ-তথ্যাদি কঠিন বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়। অদৃশ্য, অস্বীকৃত এবং কণ্ঠ-হীন বা নীরব যুদ্ধশিশুদেরকে সমাজ-চিত্র থেকে প্রকাশিত করা হয় তখনই, 'নতুন সমাজ গঠনকালে' যখন তারা থাকে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে। মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে 'যুদ্ধশিশুর' লেন্স দিয়ে কি দেখা যায়; ভারসাম্যহীন অধিকার; ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদের অধিকারহীনতা। ওই লেন্সে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীরবতা বনাম মানবিক অধিকারের কাহিনী এবং যুদ্ধোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ। যখন মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় এসব সংঘর্ষ এবং সঙ্কট বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন একইসঙ্গে এসবের মধ্যে আছে 'নতুন কিছু একটা শুরু করার' অবকাশ।

কোনো মানুষ, কোনো সম্প্রদায়, কোনো জাতীয় আন্দোলনের সামরিকায়ন সম্ভব হয়না – আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নারীত্ব এবং পুরুষত্বের প্রভাব/পার্থক্যের পরিবর্তন ছাড়া। সামরিকায়নের মাধ্যমে পুরুষ হওয়ার অর্থ বদলে যায়; এবং বদলে যায় নারী হওয়ার অর্থও। কোনো কোনো অবস্থায় সামরিকায়ন বদলে দেয় শিশু হওয়ার অর্থ? শৈশব কি বদলে যায় যখন শিশু প্রত্যক্ষ করে সন্ত্রাস, যখন সেই শিশু হয়ে যায় শিশু-সৈনিক, যখন সে ধর্ষণের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে বেড়ে ওঠে মায়ের গর্ভে? আর কীভাবে বদলে যায় শিশু? শান্তি প্রতিষ্ঠায়,

শান্তি প্রক্রিয়ায় এবং মানবাধিকার সংস্কৃতির পরিকল্পনায় এবং ধারণায় স্পষ্টত অনুপস্থিত থাকে যুদ্ধশিশু।

যুদ্ধশিশু আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, সামরিকায়ন এবং পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব সমাজে শিশুদের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করে। যুদ্ধশিশু আমাদেরকে, ধর্ষণ-অপরাধী, শিশুমৃত্যুর অর্থ, গর্ভপাত এবং মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল্য ও বিচার সম্পর্কে, ভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়। এতসব কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি অবস্থানে যুদ্ধশিশু, মানবাধিকারের ধারণাটি স্পষ্ট করার পরিবর্তে জটিল করে দেয়। কিন্তু, প্রচ্ছন্নভাবে, যুদ্ধশিশুদের 'চিকিৎসা', তাদের বাঁচা-মরা, সমাজ থেকে অপসারণ বা পুনরায় গ্রহণ, নতুন জাতীয় কর্মকাণ্ড ও নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় তাদের অন্তর্ভুক্তি, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাগ্য – সবকিছুই যুদ্ধোত্তর সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতির গভীরতা ও স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষা হতে পারে।

মানবাধিকার সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজন এবং ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, তিনটি সংযুক্ত রূপে প্রকাশ করা যায় এটাকে। এর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তি ও সরকারের কর্মকাণ্ডের মাত্রা। প্রথমত, মানবাধিকার সংস্কৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে, জনগণকে মানবাধিকার লংঘনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, আইন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, সংশোধিত পুলিশ ও সামরিক বাহিনী, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার কমিশন ও সুনির্দিষ্ট তদন্ত কমিশন (যেমন, আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত)।

দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সংস্কৃতির মতবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন হয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের রূপান্তর। এর লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া যেন ভবিষ্যতে ভয়াবহ মাত্রায় মানবাধিকার লংঘন হয়ে ওঠে অসম্ভব। এসব মূল্যবোধে রয়েছে, আইনের শাসনের জন্য সহায়তা, রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, অধিকার সচেতনতা, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার জন্য সহায়তা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিশ্রুতি। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা এবং চর্চাকে বিবেচনা করা হয় এই উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। যে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐতিহ্যের ইতিহাস থাকে তাদের মাঝেই থাকে মানবাধিকার সংস্কৃতি।

তৃতীয়ত, মানবাধিকার সংস্কৃতিকে প্রায়শ বিবেচনা করা হয় অতীত এবং পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। মানবাধিকার

সংস্কৃতিকে ভিন্নরূপে বলা যায় একটা 'পুনর্মিলিত সমাজ' হিসেবে; যেখানে থাকে সকল সদস্যের মর্যাদা প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক প্রয়াস। এভাবেই পুনর্মিলনের (রিকনসিলিয়েশন) পথে মানবাধিকারের থাকে একটি বিশেষ অবস্থান। অতীতকে স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিত পরিদৃষ্টির (ভিশন) মাধ্যমে নিশ্চিত হয় রূপান্তরিত সম্পর্ক।

মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক এবং মূল্যবোধের রূপান্তর, এবং অতীতের প্রতি মানবাধিকার-বান্ধব নিরীক্ষা – এই তিনটি আন্ত-সম্পর্কযুক্ত স্তম্ভের প্রতি সন্তোষজনক মাত্রার তত্ত্বীয় মতৈক্য বিদ্যমান থাকলেও, অনেক প্রশ্ন থেকেই যায়। সবচেয়ে নাজুক সামাজিক গোষ্ঠীর লেন্স দিয়ে এবং তাদের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণে রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব।

প্রিয়পাঠক, এবারে দৃষ্টি দিই মানবাধিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে যুদ্ধশিশু আমাদেরকে কি শেখায় এবং তত্ত্বীয় ও বাস্তবক্ষেত্রে মানবাধিকারের অনুধাবনে যুদ্ধশিশুর লেন্স আমাদেরকে কোন্ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। মতবাদী (থিওরিস্ট) এবং পেশাদার (প্র্যাকটিশনার) ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, মানবাধিকার সংস্কৃতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল মানবাধিকার সংরক্ষণে নতুন আইন প্রণয়ন করা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। নতুন এবং সংশোধিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিবেচনা করা হয় অতীতে যতি দেয়া, সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ করা, জনস্বাগত আস্থা নির্মাণ করা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, মানবাধিকারের চরম লংঘনের পুনরাবৃত্তি রোধ করার উপযুক্ত পন্থা হিসেবে। যুদ্ধশিশুর লেন্সের মাধ্যমে, মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে, অন্তত তিনটি সাংঘর্ষিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যুদ্ধশিশু এবং তাদের মায়েদের অধিকারের মধ্যে, যুদ্ধশিশু এবং আগ্রাসী সৈনিকদের মধ্যে এবং ধর্ষকদের মানবাধিকার স্বীকৃতিকে ঘিরে থাকা মানসিক চাপ।

অধিকারের দ্বন্দ্ব

যুদ্ধশিশু এবং তাদের মায়েরা: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে ধর্ষণ এবং যৌন-সন্ত্রাসকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাধারণত, যুদ্ধ থেকে শান্তির পথে রূপান্তরের 'প্রায়োগিক রাজনীতি' কাজ করে এক্ষেত্রে অপরাধীদেরকে শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে ধর্ষণে বেঁচে যাওয়া নারীদের অধিকারের বিষয়কে আরো জটিল করে তোলে 'যুদ্ধশিশু'। যুদ্ধাপরাধ হিসেবে

ধর্ষণের ধারণায় প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে, যুদ্ধশিশুদেরকে আরো গভীর অন্তরালে সরিয়ে দেয়ার মতো, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। কারণ, আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও প্রতিশোধ বা শাস্তিদানের মাধ্যমে, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধশিশুদেরকে আড়াল করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। ওইসব প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সরব হতে উৎসাহ যোগালে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্ষণে বেঁচে যাওয়া নারীদেরকে বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে যেতে পারে। জন্মের পরপরই মা বা পরিবারের সদস্য কর্তৃক যুদ্ধশিশুকে মেরে ফেলার মাধ্যমে বিষয়টি আরো জটিল রূপ নেয়। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন (১৯৮৯) অনুযায়ী 'শিশুহত্যা' শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার-পরিপন্থি। তবে, মায়েদের পক্ষে শিশুহত্যাকে বেছে নেয়ার অভিযোগটি সন্দেহজনক। ধর্ষণের পরে শিশুহত্যার বিষয়টি নারীর সীমিত ক্ষমতায় ঘটার মতো বাস্তবতা থাকে কিনা সেটাও ভাবা প্রয়োজন। আর এমনটা ঘটলেও, অনেকের মতে সেসব নারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিপ্রদানকেও মনে করেন নিষ্ঠুর এবং অবিচার। যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর সময়ে যুদ্ধশিশুদেরকে, বাস্তবতার নিরিখে, এধরণের মৃত্যু থেকে রক্ষা করাও বেশ কঠিন।

নিশ্চিতভাবে, মানবাধিকার সংস্কৃতির আলোচনায় ওঠে আসবে যুদ্ধশিশুর ভ্রূণের অধিকারের প্রশ্নটি। একটা সত্যিকারের মানবাধিকার সংস্কৃতি কোনোভাবেই জোরপূর্বক মাতৃত্বকে মেনে নিতে পারেনা; এটা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত নয়, যুক্তসঙ্গত নয় বা নারীকে খল অবস্থানে ঠেলে দিতে পারে না। যেখানে ধর্ষিতা নারীদের জন্য গর্ভপাত একটি কৌশলগত বিকল্প, সেখানে জোরপূর্বক মাতৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। তবে, যুদ্ধকালে ধর্ষণের প্রেক্ষিতে গর্ভপাতের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রভাবের মাধ্যমে কীভাবে এই মুক্তি সহজতর করা সম্ভব হবে সেজন্য মানবাধিকারের সংস্কৃতির পরিদৃষ্টিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এটা নির্ভর করে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কাঠামোয় গর্ভপাতকে কীভাবে বিবেচনা করা হয় তার ওপরে। বিষয়টা শুধু জীবনের সূচনার বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং মৃত শিশুদের আধ্যাত্মিক ভাগ্য এবং সমাজ-সংসারে এর প্রভাবের সঙ্গেও। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভপাত করা শিশুদের ভ্রূণ কি আবার ফিরে আসে ভবিষ্যতের শিশুদের মধ্যে! নাকি তারা (প্রচ্ছায়া) থেকে যায় সমাজে অসুখ-বিসুখ এবং দুর্ভাগ্যের ক্রুদ্ধ আত্মারূপে।

এছাড়া, যুদ্ধাক্রান্ত অঞ্চলের অস্থিতিশীল অর্থনীতি এবং নিরাপত্তাহীন অবস্থার কারণে গর্ভপাতের বিভিন্ন রকমের স্থানীয়/দেশীয় পন্থা অনুসরিত হয়ে থাকে।

ফলে সেসব নারীদের স্বাস্থ্যগত মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয়; প্রজনন ক্ষমতার ক্ষত এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি। সুসান ব্রাউনমিলারের সূত্রে জানা যায় যে, আমাদের বাংলাদেশে নানারকমের দেশীয় পদ্ধতিতে গর্ভপাত করার ফলে দেখা দিয়েছিল স্বাস্থ্যগত জটিলতা। সেইসঙ্গে পানিতে ডুবে আত্মহত্যা এবং ইঁদুরের বিষ খাইয়ে শিশুহত্যার প্রচেষ্টার তথ্যও পাওয়া গেছে। বেশ দেরিতে গর্ভপাত করার ফলে জটিলতা আরো বেড়ে যায়; কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যর্থ গর্ভপাতের প্রচেষ্টায় জন্ম হয় বিকলাঙ্গ শিশু। এসব সবকিছু মিলিয়ে নারীর প্রজনন অধিকার এবং যুদ্ধশিশুর প্রতিরক্ষার মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। এক্ষেত্রে পশ্চিমের 'পছন্দ' বিতর্কটি যথেষ্ট পরিমাণে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্য বিষয়কে ধারণ করে না।

যুদ্ধকালে আগ্রাসী বাহিনীর গণধর্ষণের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য থাকে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করা। সমাজের বুকে যারা হয়ে থাকবে দমন-পীড়ন-পরাজয়-অপমানের চিহ্ন হিসেবে এবং মিশ্রণের মাধ্যমে 'হালকা' করে দিবে বিদ্যমান সমাজ-সংস্কৃতিকে। বিজয় বা দখলের প্রচেষ্টায় 'গর্ভপাতকে' দেখা যেতে পারে ওই প্রচেষ্টার প্রতি সক্রিয় প্রত্যাখ্যান হিসেবে। এর বিপরীতেও যুক্তি প্রদর্শন রয়েছে; মন্দ বীজ বা মন্দ বংশ ধ্বংস করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আগ্রাসীদের কৌশলকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায় মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে যুদ্ধশিশুদের প্রচ্ছন্ন ইতিবাচক ভূমিকার সম্ভাবনা। শিশুহত্যার অনুরূপভাবে, ধর্ষণের পরে গর্ভপাতকে বন্ধ করে দেয়াটা কাঙ্ক্ষিত হলেও এখানে এটা কোনো যুক্তি নয়। যুদ্ধ-ধর্ষণের পরে নষ্ট করে ফেলা ভ্রূণ বা সদ্যোজাত ভ্রূণের অধিকার স্বল্পসময়ের জন্য মানবাধিকার সংস্কৃতিতে হয়তো ততটা স্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়না। আমরা যখন যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করি, আমরা তাদের পক্ষে শক্তি-সামর্থ্যের দাবি সৃষ্টি করি।

যুদ্ধশিশু এবং আগ্রাসী সৈনিকেরা: যুদ্ধোত্তর প্রেক্ষিতে ধর্ষককে দৃশ্যমান সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়াটা সাংগঠনিকভাবে অসম্ভব। এটা নিশ্চিত যে, নতুন মানবাধিকার সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ারূপে, তাদের কেউ কেউ আবার আবির্ভূত হবে পুলিশের বা সামরিক পোশাকে। ভিন্ন প্রেক্ষিতে, সৈনিকদের একীভূত করাটা, চুক্তি-পূর্ব আলোচনায় সাফল্য এবং স্থায়িত্বশীল শান্তির জন্য, আকাঙ্ক্ষিত। বাস্তবতার নিরিখে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সীমিত সংখ্যক অত্যাচারী সৈনিকদের শাস্তিপ্রদান করা হয়েছে। যখন ট্রুথ কমিশন সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে, তখন তারাও, ব্যাপক সংখ্যক আগ্রাসীর জন্য এটা করতে পারলেও করে সীমিত

সংখ্যকদের জন্য; ফলে একটা বিরাট সংখ্যার অত্যাচারীরা থেকেই যায় বাইরে। যুদ্ধ থেকে শান্তির পথে রূপান্তরে সামরিক সদস্যদের বাস্তব চাহিদাই সম্ভবত ব্যাখ্যা করে যে, কেন শান্তি প্রক্রিয়ার চুক্তিতে (যেখানে নতুন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের বীজ রোপিত হয়ে থাকে) ধর্ষণ এবং যুদ্ধশিশুদের বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়না [সূত্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অব পিসের ডিজিটাল সংগ্রহ– 'পিস অ্যাকর্ড'। সম্ভবত একারণেই 'যৌন-সন্ত্রাস' সন্ত্রাসের কোনো সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই; তবে, হয়ে থাকলে, সেটা হতো অস্ত্র-সংবরণের আদেশ বা সীজফায়ার চুক্তির পরিপন্থি। এই প্রেক্ষিতে অধিকারের যে মৌলিক অসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয়, সেকারণে যুদ্ধোত্তর সময়ে, নারী ও শিশুর অবস্থান থাকে সামরিক বাহিনীর পুরুষদের নীচে!

যুদ্ধশিশুরা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, ধর্ষণের শিকারদের জন্য, একীভূত হয়ে যাওয়া এসব সৈনিকরা নিজেদের অপকর্মের অপরাধী। সৈনিকদের অধিকারে অগ্রাধিকার প্রদানের অর্থই হল বেঁচে থাকা ধর্ষিতাদের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়া। একইসঙ্গে, যুদ্ধোত্তর সময়ের প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ এবং যৌন-সন্ত্রাসকেও আন্তরিক বা গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা নাও হতে পারে। কিন্তু বিচার-শান্তি এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতির বিপদের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে তোলে 'যুদ্ধশিশু' প্রেক্ষিত। বিষয়টি আরো জটিলতর হয়ে ওঠে, যখন যুদ্ধশিশুর চাহিদায় মানবাধিকার সংস্কৃতিকে আবশ্যিকভাবে যুদ্ধশিশুকে, সৈনিকদের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষক) মানবাধিকার এবং ধর্ষণের পরে বেঁচে থাকা মানুষদের পাশাপাশি, সব ধরনের বৈষম্য-মুক্ত রাখতে হয়।

ধর্ষণ যেখানে পরিকল্পিত সামরিক কৌশল, প্রায়োগিক ও প্রতীকীরূপে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী শুধুমাত্র নারীদের দমন-পীড়নের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকে না, সেইসঙ্গে জড়িত থাকে শিশুদের অস্বীকার ও অবহেলার সঙ্গেও। যুদ্ধশিশুদের উৎস নিহিত থাকে যে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংশোধনে 'অতীত থেকে আলাদা' করাটা হয়ে ওঠে বেশ কঠিন। যারা সমাজ, আইন-কানুন, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং মানবাধিকারের 'সংরক্ষক' হিসেবে গৃহীত, সেসব নতুন পুলিশ এবং সামরিক সদস্যরা যুদ্ধশিশুদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার কনভেনশন ১৯৮৯' বলে যে, শিশুদের মানবাধিকার চারটি সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এগিয়ে নেয়া শ্রেয়। আর্টিকেল ৬ (বেঁচে থাকার অধিকার) এবং আর্টিকেল ২ (বৈষম্যমুক্তির অধিকার) অনুযায়ী

আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাই মুখ্য। অন্য দুটি সূত্র হল আর্টিকেল ৩ (শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ) এবং আর্টিকেল ১২ (শিশুর প্রতিচ্ছবি)। কিন্তু নতুন পুলিশ এবং সামরিক সদস্যরা কীভাবে এসব সংখ্যালঘু শিশুদের সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে, যখন ওইসব শিশুরাই তাদের অতীত অপরাধের স্মৃতি। তারা কি সেসব শিশুদের জন্য বৈষম্য থেকে মুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে সর্বজনীন অধিকার (আর্টিকেল ২)? পুলিশ এবং সামরিক সদস্যরা কি এসব শিশুদের ওপরে খবরদারি করবে; যাদের জন্মদাতা তারাই! জোরপূর্বক মাতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ক্ষমতার পার্থক্যকে কি নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন সামাজিক সম্পর্ক এবং মানবাধিকার সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে? যুদ্ধোত্তর সমাজে পারিবারিক সন্ত্রাস যুদ্ধকালের ধর্ষণের চেয়েও অদৃশ্যতর হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানে যুদ্ধশিশুর জন্য ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি কি শোনা যাবে? যুদ্ধশিশুর লেন্স শুধু ধর্ষণের জন্ম নেয়া শিশুদের অধিকারের কথাই বলে না, সেইসঙ্গে বলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলা সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বসমূহের কথাও।

একই গুরুত্ববহ, শিশু অধিকার কনভেনশটি শিশুদের মৌলিক অধিকার হিসেবে 'সর্বোচ্চ উন্নতি অর্জনের অধিকার' এবং 'পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজিক জীবনে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার'-কে চিহ্নিত করে। যুদ্ধোত্তর সময়ে পুলিশ, সামরিক বাহিনী বা বিচার বিভাগের ভূমিকা এখানে গৌণ। এখানে যুদ্ধশিশুর লেন্সটি নির্দেশ করে, মানবাধিকার সংস্কৃতিকে যুদ্ধোত্তর সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্যই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অগ্রগণ্যতা নিরূপণ করতে হবে; যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু আইন বা রাজনৈতিক সেবাই নয় সেইসঙ্গে প্রদান করবে অর্থনীতি, শিক্ষা, গণস্বাস্থ্য ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করবে যুদ্ধশিশুকে। তবে বিস্ময়করভাবে বিষয়টা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটা সমস্যা হিসেবেও দেখা দিতে পারে! কারণ, যখন যুদ্ধশিশুর লেন্স ব্যবহার করা হয় পরিবার, সংস্কৃতি এবং সমাজকে পরীক্ষা করার কাজে, যুদ্ধ-ধর্ষক শুধু একজন প্রাক্তন সৈনিক হিসেবেই পুনরাবির্ভূত হয়না, একইসঙ্গে আবির্ভূত হয় 'পিতা' হিসেবেও!

ধর্ষকের মানবাধিকার : যুদ্ধশিশুর লেন্স, যুদ্ধে ধর্ষককে মানবীয় করে এবং পরোক্ষভাবে জটিলতরও করে তোলে। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দেয় যে, ধর্ষকেরও মানবাধিকার আছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সময়ে বাস্তব প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন সমস্যাসঙ্কুল। একদিকে যুদ্ধশিশুর লেন্স আমাদেরকে দেখায় আক্রান্ত নারী এবং যুদ্ধশিশুকে, সেসময়ে একইসঙ্গে সেটা দেখায় ধর্ষণের অস্বস্তিকর অন্যপিঠ – আগ্রাসী মানুষটিকে! যুদ্ধ-ধর্ষণের

শিকার ও যুদ্ধশিশু সংশ্লিষ্ট সরকারি নথিপত্র এবং সাহিত্যের পাতায় পাতায় আমাদেরকে পড়তে হয় 'কে ধর্ষক?' তা খোঁজার জন্য। খুঁজে দেখা যাবে যে, ওই ধর্ষকদেরও রয়েছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস এবং সুস্পষ্ট সশস্ত্র যুদ্ধের পথ-পরিক্রমা। প্রিয়পাঠক, পাকিস্তানের একাধিক সশস্ত্র আক্রমণের ইতিহাস থাকলেও, হাজার বছরের বাঙালি কখনোই কাউকে 'আক্রমণ' করেনি – শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে শুধুই আত্মরক্ষা করতে হয়েছে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন আগ্রাসী বাহিনীর আক্রমণ থেকে। যাহোক, যেখানে ধর্ষণ ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে সেখানেই যদি মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই 'মানসিক চাপ' দূর করেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানবীয় সেতুবন্ধন।

বিশ্বে এমন উপমাও রয়েছে যেখানে ধর্ষক একজন শিশু-সৈনিক! যাকে জোর করে, ধর্ষণ অভিযানে নিয়োজিত করার পূর্বে করা হয়েছে সশস্ত্র, ড্রাগ-আসক্ত এবং পশুবৎ (সমকামে নিজেই ধর্ষিত হওয়াসহ!) [সূত্র: জাতিসংঘের আরআইএন - ২০০৪]। নিজস্ব মূল্যবোধ ত্যাগ করে, ধর্ষণ এবং অবৈধ যৌনসম্পর্কে তাদেরকে উৎসাহ জোগানো হয়েছে। পুরুষেরাও ধর্ষণের শিকার হয়! নারী সৈন্য কর্তৃক নারী ও পুরুষকে ধর্ষণেরও তথ্য রয়েছে। তবে পুরুষ কর্তৃক নারী-ধর্ষণের চেয়ে এই দুই ধরনের অনাচারের সংখ্যা খুবই কম। সাহিত্য এবং বিশেষত শিশু সৈন্যদের নিয়ে রচিত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতদের মধ্যকার বিভাজনরেখাটি ঝাপসা। এভাবেই, অত্যাচারীদের জন্য শাস্তিপ্রদান এবং আক্রান্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার সামনে উপস্থিত হয় আরো এক বাধা। এটা সত্যিই এক জটিল পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় কথাটি হল, যুদ্ধের ধর্ষকদের মানবাধিকার আছে এটা যতদিন ধরে তারা শিশু বা শিশু সৈন্য থাকবে, তাই নয়, বরং থাকবে তাদের সারাটা জীবন ধরে। তৃতীয় জটিলতাটি হল, কঠিন বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না অনুশোচনা, অপরাধবোধ এবং চারিত্রিক সংশোধন-রূপান্তর। যুদ্ধশিশুর লেন্সের মাধ্যমে যখন 'ধর্ষকের' ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে নিবদ্ধ হয় 'বাবার' ওপরে, তখন ধর্ষকের মানবীয়তাও 'পুনরুদ্ধার' হয়ে যায় যা শুধুমাত্র একটা বিচার বা পুনর্বাসনের লক্ষ্যকেই সক্রিয় করে না, সেইসঙ্গে এটা বোঝাপড়া বা সমাধানের পথে একটি দায়িত্বও বটে। আক্রমণকারীদের এই মানবিকীকরণের অর্থ এই নয় যে, যুদ্ধের ধর্ষক, বিশেষত যারা এধরনের কাজের আদেশদাতা (যেমন, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান প্রমুখ), তাদেরকে বিচারের বাইরে রেখে রক্ষা করা হবে!

প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা এবং নীরবতা: ধারণা এবং বাস্তবতার উভয়-সঙ্কট

মানবাধিকার সংস্কৃতির স্থপতিদের প্রথম লক্ষ্যই হল আইন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই লক্ষ্যটি, দ্বিতীয় আরেক উদ্দেশ্য - সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের রূপান্তরের প্রেক্ষিতে পতিত হয় চাপের মুখে। সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন বা রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিশুরাই মূল অংশ। কিন্তু, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকালে, আলোচনা-সংলাপে শিশুরা চলে যায় দ্বিতীয় সারিতে এবং তাদের ভূমিকাও হয়ে যায় অদৃশ্য। সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে নারীদের ভূমিকাটি ভালোভাবে স্বীকৃত এবং এর একটা বড় কারণ হল যে তারা যুদ্ধে 'ধর্ষণের লক্ষ্যবস্তু' থাকে। সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে শিশুদের ভূমিকাটি তেমন স্বীকৃত না হলেও, আমাদের আলোচনায় তারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সেনাদল, কর্মীবাহিনী, বাসাবাড়ি, স্কুল এবং অসংখ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে শিশুদের রয়েছে বহুমুখী ভূমিকা। এছাড়া শিশুরা জ্ঞানের পরিবাহক এবং এসব পরিমণ্ডলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বোধ ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকারীও বটে। যুদ্ধকালে পরিকল্পিত ধর্ষণ বা যৌন-নিপীড়নের মাধ্যমে প্রসূত শিশুরা যুদ্ধে আক্রান্ত শিশুদের মাঝে একটা বিশেষ উপদল। সাংস্কৃতিক এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রেক্ষিতে তাদের থাকতে পারে সুস্পষ্ট ভূমিকা ও প্রভাব। কিন্তু কখনোই এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি।

যুদ্ধশিশুদের সামাজিক শক্তি: যুদ্ধশিশুদের কি সামাজিক শক্তি আছে বা থাকতে পারে? থাকলে, কীভাবে সেটা মানবাধিকারকে প্রভাবিত করে? এই শক্তিকে যদি কেউ সামাজিক ফলাফল পরিবর্তন করার সামর্থ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তাহলে ধর্ষণে জন্ম নেয়া শিশুদের একটি বিশেষ রূপের শক্তি রয়েছে যা মানবাধিকার সংস্কৃতির জন্য সুগভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু হিসেবেই যুদ্ধশিশুরা শান্তির উপ-সংস্কৃতি, এবং একইসঙ্গে বেদনাবিধুর স্মৃতিও, ছড়িয়ে দিতে পারে। রুয়ান্ডায় একজন মা তার দুই সন্তানেরই নাম রেখেছেন 'হোপ' বা আশা। "কিছু মানুষের ভিন্ন ধরনের হৃদয় থাকে। কিন্তু অনেকদিন পরে আমি পুরোটা সময় ধরে নিজেকে সুখী অনুভব করছিলাম। আমার ছেলেটার পাশাপাশি আমার ভেতরে আরো একজন! সেভাবেই আমরা একসঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটেছি। তাদের জন্য আমার ভালোবাসা সত্যিই গড়ে উঠেছে। আর আমি রুয়ান্ডায় ফিরে গিয়ে সবার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।" যেখানে অনেক বেঁচে যাওয়া নারীরা জোরপূর্বক মাতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বা দুর্ব্যবহার করে সন্তানদের সঙ্গে, এই গল্পটি কোনো ব্যতিক্রম নয়। ভালোবাসার রূপান্তর এবং সহনশীলতার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংস্কৃতির সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত যা এসব শিশুরা সৃষ্টি করে তাদের মায়ের মনে। গর্ভপাত বা হত্যা করা শিশুদেরও থাকতে পারে এক ধরনের শক্তি, কারণ তারাও টিকে থাকতে পারে স্মৃতি বা অন্য কারো জন্য না হলেও, নিজ নিজ মায়ের জন্য প্রতীকরূপে। জোরপূর্বক মাতৃত্ব স্থানীয় প্রেক্ষিতে শিশুকে উপস্থাপন করতে পারে। ফলে, তাদের মানবিকতাকে অস্বীকার করে আরো নাজুক পরিবেশে দূরে ঠেলে দিয়ে - তাদের পরিচয় হতে পারে 'খুদে হত্যাকারী' বা 'বাজে স্মৃতির সন্তান' এবং 'বদ জিনের' বাহক হিসেবে!

আবার অন্যদিকে, বিভাজিত সমাজের মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টির সামর্থ্যও রাখে যুদ্ধশিশুরা। তাদের অদৃশ্যমানতা এবং বেদনার অন্যপাশে রয়েছে রূপান্তরযোগ্য মিশেল বা মিলে যাওয়ার শক্তি। যুদ্ধশিশুর সামরিকায়ন (তারা যুদ্ধে ধর্ষণের ফসল), তাদের পবিত্রতা (তারা পথিক; শিকার বা ধর্ষণের আগ্রাসী নয়), এবং তাদের মিশেল জাতীয়তা, বর্ণ বা গোত্র, তাদেরকে তাদের নিজেদের ইতিহাস ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জটিল অংশীদার হিসেবে অবস্থিত করে দেয়। যুদ্ধশিশুরা শত্রু নয়, বন্ধু নয়, বরং দুটোই। যখন এমন অবস্থান তাদেরকে আরো বেশি অনিরাপত্তার দিকে ঠেলে দেয়, তখন একইসঙ্গে ধারণ করে সম্প্রদায়, নাগরিকত্ব, এবং অংশীদারিত্বের নতুন সংজ্ঞার সম্ভাবনা। এছাড়াও, এসব শিশুরা যখন তাদের পিতাদের বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন এক ধরনের মানবাধিকারের গল্পবলার মতো দৃশ্যের অবতারণা হয়। ২০০৪ সালে রুয়ান্ডার সরকার স্কুলের জাতীয় পাঠ্যসূচীতে যুদ্ধে ধর্ষণের বাস্তবতা এবং ব্যাখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে যুদ্ধশিশুর সামাজিক শক্তি প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

মানবাধিকার সংস্কৃতির জন্য শিক্ষা : যে মূল্যবোধের ফাঁদে ধর্ষণ, যৌন-সন্ত্রাস এবং লৈঙ্গিক অসাম্য পেয়ে যায় বৈধতা সেইসব বিদ্যমান মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে, স্থানীয় ও বিশ্ব পিতৃতান্ত্রিকতা এবং স্থানীয় ও বিশ্ব সামরিকীকরণের কারণে সংঘাত-উত্তর শিক্ষার সামনে রয়েছে ব্যাপক বাধাবিঘ্ন। মানবাধিকার সংস্কৃতির সমর্থনে সংঘাত-উত্তর শিক্ষায় রয়েছে, যুদ্ধশিশু এবং অন্যান্য শিশুদের স্কুলে যাওয়া এবং সেখানে, বিশেষত মেয়ে-শিশুদের, নিরাপদে থাকা না থাকার মতো বাধা। অনেকক্ষেত্রেই হয়তো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। বিশেষত, প্রাক্তন যোদ্ধা/ধর্ষক যাদের অনেকের বয়স হয়তো কম, তারাও এই সমীকরণের অংশ। 'যুদ্ধশিশুকে' শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করানোর অর্থ শুধু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে এই প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা নয় বরং একই সঙ্গে বড়দের শিক্ষা কার্যক্রমেও লৈঙ্গিক ও সামরিকতন্ত্র আনয়ন করা। সংঘাত-উত্তর শিক্ষা কার্যক্রমে যুদ্ধশিশু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার মতো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার

প্রয়াসটি সার্বিক এবং সম্পূর্ণ উদ্যোগে আরো কার্যকর ফলাফল দিবে। শান্তি শিক্ষার মাধ্যমে সহানুভূতি ও সহ্যক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টার কার্যকারিতা সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ-জনিত তথ্যাদি মনে হয় বাসাবাড়িতে বড় হওয়া যুদ্ধশিশুকে প্রকাশ করার বিরুদ্ধে মতামত দিয়ে থাকে। এসব ফলাফল বিতর্কিত বিষয়ে পরোক্ষ দৃষ্টি দেয়ার লাভ সম্পর্কে পরামর্শ দেয় – যেমন, যুদ্ধশিশুদের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লৈঙ্গিক ও যুদ্ধ-ভিত্তিক রীতিনীতি সম্পর্কে প্রয়োজন হয় সযত্ন দৃষ্টি।

বিদ্যমান সাহিত্যে, 'শিক্ষা' মানবাধিকার সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু। মানবাধিকার সংস্কৃতির তাত্ত্বিকগণ মূল্যবোধের উন্নয়নের ওপরে জোর দিয়ে থাকেন; বিশেষত, শিক্ষার মাধ্যমে, অধিকার-নির্দিষ্ট সমাজ গঠন এবং মানবাধিকার-ভিত্তিক 'অতীত নিয়ে চিন্তাভাবনা'-র প্রয়াসের ওপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যুদ্ধের পরে নতুন জাতীয়-গাথা গঠনের পথে কঠিন ধাপটি হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে সম্প্রতি সংঘটিত 'ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস সম্পর্কিত' বোধ সম্পর্কে সচেতন করা। এই মূল্যবোধ স্থানান্তরের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মানবাধিকার লংঘন বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই বেদনাগাথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্ষকের মানবাধিকার এবং যেসব মা তাদের ধর্ষণ-প্রসূত শিশুকে হত্যা করে ফেলেছে তাদের কথাও এই মানবাধিকার সংস্কৃতির অংশ। একটা বিবরণী যা কাহিনী, গোপনীয়তা এবং যুদ্ধশিশুকে রেখে দেয়া মায়েদেরকে শ্রদ্ধা করে সেটার কথা ভিন্ন। এছাড়া, একটা বিবরণী শুধু যে যুদ্ধশিশুদের বিদ্যমান সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দেয় তাই নয়, বরং সমাজে যুদ্ধশিশুদের মানবাধিকার সম্পর্কিত ইতিবাচক মূল্যবোধ তৈরিতে অবদান রাখার সুযোগও খুলে দেয়। সংঘর্ষ-উত্তর পুনর্গঠনের মাঝ দিয়ে ভয়াবহ অতীত এবং নতুন করে উত্থাপিত বিতর্ক সম্পর্কে ইতিবাচক বিবেচনা করার উত্তম সুযোগ দিতে পারে। আলোচ্য শিক্ষা কার্যক্রমে, কীভাবে সংঘর্ষ বাধে সেই জটিল সংলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কিন্তু এতটা ইতিবাচক দিক থাকার পরেও শান্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষাকে অগ্রগণ্য করা হয়না। সংঘর্ষ উত্তর পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান হলেও, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের তুলনায় শিক্ষা-সংশোধন কার্যক্রম পিছিয়ে আছে। তারমানে, শুরুটা হতে পারে এভাবে – মানবাধিকার সংস্কৃতি গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ধর্ষণে জন্ম নেয়া শিশুকে স্বীকৃতি দেয়া ট্রুথ কমিশনের অনুসন্ধানী তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে শিক্ষা কার্যক্রমে। তবে একটা শক্তিশালী মানবাধিকার সংস্কৃতি হবে সেটাই যেখানে শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নের সংলাপে অংশ নিবে যুদ্ধশিশুরা। এভাবে যুদ্ধশিশুরা নিজেদের ইতিহাস বলার সুযোগ পেয়ে যাবে ইতিবাচক প্রক্রিয়ায়।

নীরবতা ভাঙা! : কোনো কোনো সময়ে যুদ্ধশিশুকে ঘিরে থাকে কৌশলগত এবং ইতিবাচক নীরবতা। যেমন আমাদের বাংলাদেশে। যুদ্ধশিশুর প্রকাশে এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা কার্যক্রমকে ওই নীরবতা ভাঙাকে যুক্তিযুক্ত করতে হবে। যুদ্ধশিশুর লেন্স সংশ্লিষ্ট সংঘর্ষকে প্রকাশিত করে থাকে। এটা সাংস্কৃতিক রূপান্তর সম্পর্কিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে; যেখানে বলা হয় যে যদি প্রান্তিক দলগুলোকে প্রান্ত থেকে তুলে আনা হয়, প্রকাশিত করা হয় এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ থেকে শান্তিতে রূপান্তরের পথে অসামরিকীকরণের যুক্তিটিই, যুদ্ধশিশুদের অদৃশ্যমানতার পেছনে থাকা, একমাত্র কারণ নয়। বাস্তবতার নিরিখে, আক্রান্ত মায়েদের কাছে যুদ্ধশিশুরাই তাৎক্ষণিক সমস্যা নয়। এই নীরবতার একটা কারণ হতে পারে যে, মানবাধিকার কর্মীদের ধারণা হল 'যুদ্ধশিশুদের সুরক্ষায় নীরবতা একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল'।

মানবাধিকার সংস্কৃতি গঠনে নীরবতা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ? যুদ্ধশিশুর লেন্স দেখিয়ে দেয় যে, কৌশলগত বা ইতিবাচক নীরবতা এবং জোরপূর্বক নীরবতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা এবং সুরক্ষায় নীরবতার প্রতিটি রূপের প্রভাবের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। ধর্ষিতাদের পক্ষে তৃণমূল পর্যায়ের নীরবতাকে এক ধরনের প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নীরবতা যখন ভয়ের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া একটি নিয়ন্ত্রণ-মূলক শক্তিশালী কৌশল, তখন এটাও সম্ভব যে, বেঁচে থাকার একটা কৌশল হিসেবেও কাজ করতেও সক্ষম এই নীরবতা। যুদ্ধশিশুদের সামাজিক সামর্থ্য থাকলেও, ছোট হিসেবে তারা নিজেদের জন্য কোনো প্রতিরোধী দেয়াল তৈরি করতে পারে না। তবে যখন একাজটা তাদের মায়েরা এবং সম্প্রদায়েরা করে দেয়, তখন সেই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো শ্রেয়; কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নিজের বাস্তবতা তৈরি করার জন্য ধর্ষিতার অধিকার, গর্ভজাত যুদ্ধশিশুকে বাঁচানোর স্বার্থে উৎস গোপন করা – সবই মানবাধিকার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যদিকে, সব যুদ্ধশিশুই বেদনাহত নয়। যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাদের কিছুসংখ্যক নীরবে মিশে গেছে সমাজে। অতএব নীরবতাও দিতে পারে সুরক্ষা এবং হতে পারে প্রতিরোধের একটা পন্থা। সৃষ্টি হতে পারে নতুন ধরনের পরিবার এবং সম্ভবত 'নতুন সন্তান' গঠনের নিরাপদ অবকাশ। মানবাধিকার সংস্কৃতির ধারণাটি সম্ভবত শরণার্থী শিবির, দারিদ্র-পীড়িত অঞ্চল বা দয়া-দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা ধর্ষিতাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এতসব বাধা-বিপত্তির মুখেও মানবাধিকার সংস্কৃতি টিকে থাকতে পারে। যে

মূল্যবোধ তৈরি করে এবং টিকিয়ে রাখে এসব সম্প্রদায়কে তা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক সহনশীলতা, অধিকার সচেতনতা, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সহায়তা, জীবনের মর্যাদা, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপরে। তবে এসব কিছুই আরো সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, সমবায়-ভিত্তিক অর্থনীতি এবং লৈঙ্গিক ঋজুতা যুক্ত হলে।

অন্যদিকে, যুদ্ধশিশু সম্পর্কে কৌশলগত নীরবতার মাঝে হস্তক্ষেপ করলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য বিপরীত-ফলাফলও হতে পারে। নড়বড়ে হয়ে পড়তে পারে বিদ্যমান সহায়ক ব্যবস্থাগুলো এবং আরো নাজুক হয়ে পড়তে পারে যুদ্ধশিশু ও ধর্ষিতা মায়েদের অবস্থান। সামরিকায়িত সমাজের অক্সিজেন হল সামরিকতন্ত্র – ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। অতএব, যুদ্ধশিশুদের সুরক্ষায় নীরবতার বিভিন্ন রূপকে অবশ্যই সন্দেহের চোখে বিবেচনা করতে হবে। যেখানে গণধর্ষণ সংঘটিত হয়ে থাকে যেখানে সেই ভয়াবহতার সম্মিলিত বিস্মরণ এবং সেসবকে আড়াল করার প্রয়াস কাজ করবে লিঙ্গ-ভিত্তিক সন্ত্রাস নিয়ে সংলাপের বিরুদ্ধে। নীরবতা মানেই ক্ষমা করে দেয়া নয়। দুঃখ-বেদনার কারণে বা সন্তানের জন্য আরো বেশি সম্ভাব্য কষ্ট এড়ানোর জন্য নীরবতা চাপিয়ে দেয়া হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমাজের প্রতিরোধ থেমে থাকবে। চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে পুনর্সংঘাত।

এছাড়া, কৌশলগত, স্থানীয় নীরবতা আন্তর্জাতিক নীরবতার মতো একই বিষয় নয়। আমরা যদি সেসব শিশুকে মানবাধিকারের বাহক, মানবাধিকার লংঘনের শিকার হিসেবে দেখতে চাই এবং, একইভাবে, শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনি ও তত্ত্বীয় উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে আওয়াজ তুলতে চাই তাহলে যুদ্ধশিশুকে 'প্রকাশিত' করতেই হবে। আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধশিশুদের অদৃশ্যমানতার কারণেই মূলত, যুদ্ধোত্তর মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথে স্থানীয় প্রয়াসে তাদের প্রান্তিক অবস্থান প্রায় পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু, এসব শিশুদের অনুকূল অবস্থান নিশ্চিত না করে, তত্ত্বীয় বা বাস্তব-ভিত্তিক, কোনো মানবাধিকার সংস্কৃতি গঠন হতে পারে না। অতএব, যুদ্ধশিশুর লেন্স নির্দেশ করে যে, মানবাধিকার সংস্কৃতি গঠনে প্রয়োজন হয় চাপিয়ে দেয়া নীরবতা বনাম কার্যকর কৌশলগত ও ইতিবাচক নীরবতাকে চিহ্নিত করা। ইতিবাচক-সুরক্ষিত নীরবতা এবং পীড়াদায়ক-প্রতারণামূলক নীরবতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য আরো পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা শ্রেয়; এটা একটা চ্যালেঞ্জ যা যুদ্ধোত্তর শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথে দায়িত্বশীল নীতিমালায় জ্ঞাত থাকতেই হবে।

নবযাত্রা! : নিজস্ব কর্মধারা কীভাবে একজন মানুষকে রাজনৈতিক নাগরিক হিসেবে তৈরি করে? কীভাবে সে সমর্থ হয় চারপাশের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মিলিত হতে, সমস্বরে কাজ করতে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে, এবং অসম সাহসী কোনো উদ্যোগ নিতে যা তার মনেও আসেনি কখনো; হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় নতুন কিছু একটা করতে। দার্শনিক অর্থে বলা যায় যে, জন্মের প্রেক্ষিতে যে কোনো কিছু করাই মানবীয় অভিপ্রায়। যেহেতু আমরা সবাই জন্মের মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে এসে থাকি। নবাগত এবং সূচনাকারী হিসেবে আমরা সবাই নতুন কিছু একটা করার সামর্থ্য রাখি। জন্মের প্রকৃত সত্যটা ছাড়া আমরা কখনোই জানতে পারতাম না যে নতুনত্ব কী? আমাদের সকল কাজই, হয় স্বাভাবিক আচরণ, নাহয় স্বকীয়তা। যুদ্ধশিশুরা আমাদেরকে নতুন কিছু একটা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নয়, অনুপ্রবেশের জন্য নয়, নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কেও নয় – প্রচলিত অর্থে যা উপলব্ধি করা যায়, সেজন্যই। জন্ম এবং মাতৃত্ব মূলত এক আবেগময় মৌলিক দায়িত্ব। তবে মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার এই পুরুষ-উদ্যোগটি শেষ পর্যন্ত জন্মদাত্রী মাকেই করে দেয় অধীনস্থ। একই সময়ে, মানবাধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও সাংঘর্ষিক রূপান্তর এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সদস্য হিসেবে শিশুদের প্রতি আমাদের মনোযোগটি আমাদেরকে নিয়ে যায় এই ধারণায় - নতুন যে কোনো জীবনেই প্রকৃতপক্ষে থাকে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সুপ্ত সম্ভাবনা। আর এই জটিল বিষয়টির সমাধান করাই মানবাধিকার সংস্কৃতির মূলবিন্দু। এই জটিলতার মধ্য দিয়েই গঠিত 'শিশু' বদলে দিতে পারে নারীর অধিকার এবং প্রয়োজনীয় করে তোলে নারী, শৈশব, মাতৃত্ব, পরিবার, লৈঙ্গিক সম্পর্ক, মানবাধিকার এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

এখানে এই বিষয়টি অবতারণা করার উদ্দেশ্য হল, মানবাধিকারের অর্থ সম্পর্কে 'যুদ্ধশিশুরা' আমাদেরকে কি শেখায় – সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করা। বিদ্যমান তত্ত্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার তিনটি দিক চিহ্নিত করে এবং যুদ্ধশিশুর লেন্স তাদের প্রয়োজনীয়তা ও গভীর আন্তঃসম্পর্ককে নিশ্চিত করেছে। প্রথমত, যুদ্ধবাজ ধনবানদের নেতৃত্বে, আইনগত ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনটি বেশ দুর্বল কারণ, এর মাধ্যমে নারী এবং বিশেষত শিশুরা চলে যায় ক্ষমতার বাইরে। মানবাধিকার সংস্কৃতির উন্নয়নে এই নির্বাসনের কারণটিই আমাদেরকে 'নতুন কিছু একটা' শুরু করার জন্য তাড়িত করে।

একই সময়ে, যুদ্ধশিশুদেরকে, সহনীয়তা ও পুনর্মিলনের প্রতীক এবং স্থিতিশীল মানবাধিকার সংস্কৃতির সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে জীবন্ত-মানবরূপে উদিত হওয়ার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে – যুদ্ধশিশুদেরকে পূর্ণ প্রতিভা নিয়ে গঠিত হওয়া এবং কোনোরকমের শিকার হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা দেয়ার

জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যোগে নতুন আইনগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যুদ্ধোত্তর পরিবেশে, যুদ্ধশিশুদেরকে প্রকাশিত না করেও, মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর এটা অর্জিত হতে পারে 'সত্য এবং পুনর্মিলন' বা শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

শান্তি প্রক্রিয়া এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পথে বিশ্ব রাজনীতিতে যুদ্ধশিশু পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট নয়। উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মানবাধিকার সংস্কৃতি গঠনের বিষয়টি লিঙ্গ-নিরপেক্ষও নয় আবার বয়স-নিরপেক্ষও নয়। নতুন কিছু একটা করতে গেলেই প্রয়োজন হয় ক্ষমতার উৎস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ার সুযোগ; যুদ্ধাক্রান্ত এলাকার বেসামরিক নারী, শিশু এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় ভূমিকাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যুদ্ধশিশুর অবস্থানটি আপাত দৃষ্টিতে ক্ষমতাহীন। সাধারণত যুদ্ধোত্তর সমাজে শিশুদের প্রতিনিধিত্ব থাকে না এবং তাদের রাজনৈতিক কণ্ঠও থাকে ক্ষীণ। যুদ্ধশিশুদের অধিকার এবং কল্যাণের পক্ষে কথা বলা মানেই যুদ্ধশিশুর বিষয়টিকে সুকঠিন রাজনৈতিক উদ্যমে রূপান্তর করা; যুদ্ধশিশুদের ক্ষমতার দাবির জন্য আওয়াজ উঠানো অথবা একাজ সফল করার প্রয়াসে যুদ্ধশিশুদের জন সুপরিবেশ সৃষ্টি করা।

মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ার দ্রুত প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকে যুদ্ধশিশুর লেন্স। এই সংস্কৃতির মাঝেই জটিল পন্থায় জন্ম হয়েছে যুদ্ধশিশুদের এবং এর মূল অংশেই এর অবস্থান। আমাদের জানা প্রয়োজন যে যুদ্ধ তাদের ওপরে কি প্রভাব ফেলেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধু শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিই নয়, আমূল বদলে দিয়েছে তাদের সম্পূর্ণ জীবনধারা। যুদ্ধশিশুরা আমাদেরকে নিয়ে যায় অসংখ্য প্রতিযোগী এবং বিপরীতমুখী পথে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় যে, নতুন কিছু একটা করার জন্য ইতোমধ্যেই অনেক সময় কেটে গেছে।

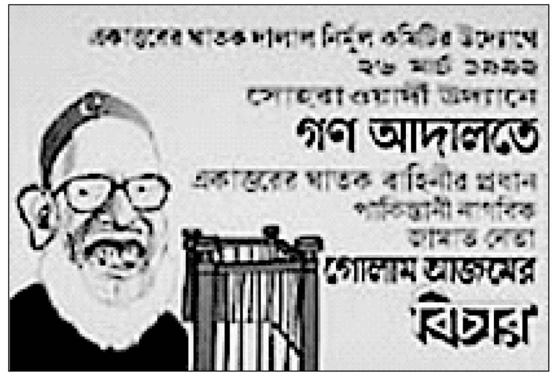

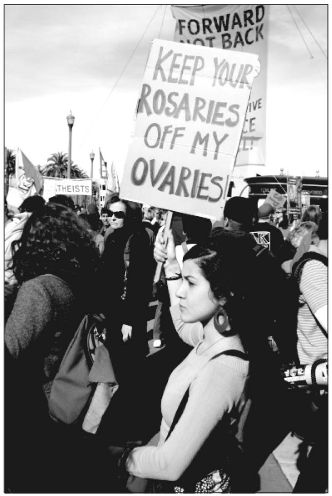

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
সানফ্রান্সিসকো শহরে
ওয়াক ফর লাইফ ক্যাম্পেইন

অধ্যায়-৭

উপসংহার

প্রিয় পাঠক, বেদনাহত কলমে পাতার পর পাতা লিখেও হয়তো শেষ হবে না আমাদের বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাক্রান্ত সময়ে গণধর্ষণে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশু এবং যুদ্ধনারীদের বেদনা বিধুর করুণ গাথার কথা। ক্রম-উন্নয়নশীল মানুষের সভ্যতার বিপরীতে ইতিহাসের এই অদৃশ্যমান দৃশ্যপটের প্রচ্ছায়া বড় বেশি কলঙ্কিত। এখানে ধর্ষিত হয়নি শুধু নারী, বরং হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। হোঁচট খেয়েছে মানুষের নিজের হাতে গড়া মানব-সভ্যতা। পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা পর্বটিকে আলোয় নিয়ে আসার সামর্থ আমার ছোট্ট কলমের নেই। আপাত শান্ত পুকুরে শুধু একটা ঢিল মেরে ঢেউ তোলার প্রয়াসেই আমার এই দুরন্ত প্রকাশ। যুদ্ধশিশুদের অবহেলাভর জন্মের পাশে নিজের জন্মকে মনে হয় যেন রাজকীয় আবির্ভাব! মনে হয়, খুব বেশি পেয়ে গেছি, কোনো কিছু না করেই। জীবন পাওয়ার আগেই পেয়ে গেছি রাজসিক পুরস্কার - সাদর বরণ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের পবিত্র শরীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র! সেই বর্বর শরীর দখলের ফসল-রূপে পবিত্র যুদ্ধশিশুরা এসেছে আমাদের ঘরে। যেখানেই থাকুক, তারা আমাদের অংশ। মুক্তিযুদ্ধের আরেক উত্তরাধিকার। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ‘প্রথম নাগরিক’।

হে পৃথিবী, এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার আবর্তন থামিয়ে প্রকাশ কর নৈসর্গিক প্রতিবাদ। আমরা হাত তুলে অপেক্ষা করছি। হে পৃথিবী, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মহাজাগতিক নিয়ম ভাঙা যদি সম্ভব হতো, এক মুহূর্তের জন্য হলেও তুমি তোমার আবর্তন থামিয়ে পূরণ করতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা গর্বিত তোমার জন্য।

আমরা সবাই এক জাতি এক দেশ – বাঙালি ও বাংলাদেশ। যুদ্ধকালে ধর্ষণ একটি যুদ্ধাপরাধ। আমরা সবাই পাকিস্তানি গণধর্ষকদের বিচার চাই। বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের অপচেষ্টার অপরাধে, পাকি-বাঙালি সংকর জাতিধারা সৃষ্টির অপচেষ্টার অপরাধে এবং বাঙালি নারীর শরীরকে অপবিত্র করার অপরাধের বিরুদ্ধে বিচারের এই দাবী দুর্বিনীত।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের পথ চাই। পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর অপরাধের চিহ্নের সংরক্ষণ চাই। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্বে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্বের উল্লেখ চাই।

আমি একাত্তরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। আমি কোনো দলের নই, গোষ্ঠীর নই বা বর্ণের নই। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও দৃঢ়। দৃষ্টি হালকা হলেও সরাসরি। আকাঙ্ক্ষা একক হলেও সুনির্দিষ্ট। একাত্তরের ঐকতানের আস্থায় নবীন প্রজন্মের কাছে আবেদন জানাই...

- আসুন, সবাই মিলে স্মৃতিসৌধের মতো একটি ‘বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু স্তম্ভ’ নির্মাণ করি।
- স্বাধীনতা দিবসে বিজয়ের পাশাপাশি ‘বীরাঙ্গনা মা দিবস এবং যুদ্ধ শিশুর প্রতীকী জন্ম দিবস’ পালন করি।

জয় বাংলা। চিরঞ্জীব বাংলাদেশ।

কোরিয়ান যুদ্ধশিশুদের স্মৃতিসৌধ
অবস্থান: বিগ রক গার্ডেন পার্ক,
২৯০০ সিলভান সেন্ট বেলিংহ্যাম
ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
উদ্বোধন: ২৭ জুলাই ২০০৩

টেক্সাসের ব্যাসট্রপে অবস্থিত ফেয়ারভিউ সিমেট্রিতে
‘গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল’
অজানা যুদ্ধ শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং সুরক্ষা প্রদান করার জন্য নির্মিত এই প্রতীকী স্থাপত্য ।

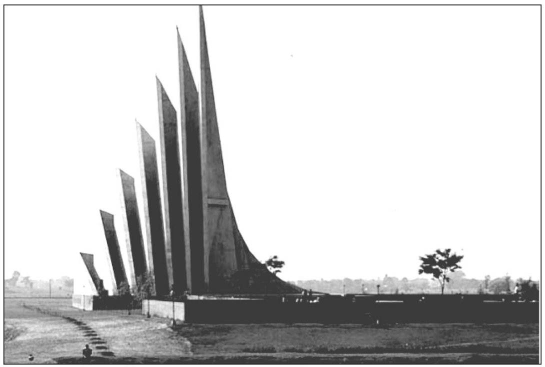

জাতীয় স্মৃতিসৌধের মতোই চাই... **বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু স্মৃতিস্তম্ভ**

পরিশিষ্ট

১. বাংলাদেশ ছেড়ে নতুন নীড়ের পথে যুদ্ধশিশুরা

১৯৭২ সাল। যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে ওঠায় ব্যস্ত নতুন দেশের নতুন সরকার ও সাধারণ জনগণ। দেশ পুনর্গঠনে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবকিছু আপাতদৃষ্টিতে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এক কালো অধ্যায়ের ফসল হিসেবে বীরাঙ্গনাদের গর্ভে আবির্ভূত হতে শুরু করে 'অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু'। অপনাম এড়িয়ে যাদেরকে বলা যায় 'যুদ্ধশিশু'। মুক্তিযুদ্ধকালের সাড়ে নয় মাসে আড়াই থেকে চার লক্ষ শিশু থেকে বৃদ্ধা বাঙালি নারী ধর্ষিত হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দালাল জামাত-রাজাকার গোষ্ঠীর হাতে। সেসব মর্মান্তিক ধর্ষণের ফলে জন্ম নিয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার যুদ্ধশিশু। কি হয়েছে তাদের? কোথায় তারা? এদেশে জন্ম হলেও ওইসব অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম আমরাই! কারণ, ওইসব দূষিত রক্তবাহী শিশুদেরকে বরণ করে নেয়ার মতো উদারতা বা প্রসারিত হৃদয় অথবা সাহস কোনোটাই আমাদের ছিলনা! এমনকি নির্বাসনে প্রেরণের ব্যবস্থাটুকুও না করে আমরা ছিলাম উদাসীন; 'অপবিত্রতা' থেকে নিরাপদ দূরত্বে! বিদেশিরা এসে নিয়ে গেছে আমাদের সেই অপবিত্রতা! প্রিয়পাঠক, চলুন এরকমই এক কাহিনিতে দৃষ্টিপাত করি এখন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করা দি বাংলাদেশ অবজার্ভারের ১৯৭২ সালের ২০শে জুলাই সংখ্যার শীর্ষসংবাদের সূত্রে চলুন ফিরে যাই ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

ডেটলাইনঃ ১৯শে জুলাই ১৯৭২। বুধবার বিকেল। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। অল্পদিন আগে চালু হয়েছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। এখান থেকে আজ কানাডায় নতুন আশ্রয়ের পথে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চেপে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে ১৫ জন যুদ্ধশিশু। বিশেষত মাদার

তেরেসা হোম এবং সহযোগী অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে বিদেশে দত্তকায়িত যুদ্ধশিশুদের মধ্যে এরাই প্রথম দল। বিভিন্ন সাদামাটা আশ্রয়কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছে এসব যুদ্ধশিশু। যুদ্ধশিশুদের এই প্রথম দলটি কানাডীয় মানব-হিতৈষী প্রতিষ্ঠান 'ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের' সৌজন্যে, টরন্টো ও মন্ট্রিয়লের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে যাত্রা করছে। সেখানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যেই নির্বাচিত ১৪টি পরিবারে দত্তক হিসেবে আশ্রয়ণ হবে এসব শিশুর।

ঢাকা বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জের কাচ দিয়ে দেখা যায় বাইরে বিকেলের সোনালি আলোয় ভরে আছে চারদিক। আর ভেতরে? এখানে বিরাজ করছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা অবাক হয়ে দেখছে যে সোফাগুলোর বেশিরভাগ জুড়ে প্লাস্টিকের ক্যারিকটে সিনথেটিক ফোমের ভেতরে বসে আছে একদল খুদে শিশু! তিনজন বিদেশি ভদ্রমহিলা এবং কয়েকজন নান তাদের দেখাশোনা করছে। মুহূর্তের মধ্যেই এসব শিশু তাদের সহযাত্রী, অন্যান্য এয়ারলাইনের গ্রাউন্ড স্টাফ এবং বিশেষত মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়। চেহারায় মাতৃত্বসুলভ আবেগ ফুটিয়ে অনেকেই এসব বাচ্চাকে ঘিরে ধরে আদর করতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মাতৃ-স্নেহবঞ্চিত শিশুরা দ্রুতই সাড়া দিতে থাকে সবার প্রতি। সবশিশুর মুখে ফুটে ওঠে হাসি এবং উল্লাস।

যুদ্ধশিশুদের এই প্রথম দলের ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনের জন্ম হয়েছে ঢাকার মাদার তেরেসার হোমে। বাকি ৩ জনের জন্ম হয়েছে একটা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে। এদের মধ্যে একজন শিশু জরিনাকে পাওয়া যায় ভিন্নভাবে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে সিস্টার মার্গারেট মেরি উদ্ধার করে ৬ মাস বয়সী জরিনাকে।

এখানে সবাই শিশু। সবাই ছোট। তারপরও প্রিয়পাঠক, চলুন বিশেষভাবে দৃষ্টি দিই ক্ষুদ্রতম সদস্যের দিকে! মাদার তেরেসার হোমে ৮ই জুলাইয়ে জন্ম নেয়া আর এমুহূর্তে সোফায় বসে থাকা ছোট্ট একরত্তি সাবিত্রীর বয়স কোনোমতে মাত্র দশ দিন! জন্মসূত্রে সাবিত্রী বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু তাকেও আজ বিমানে চেপে ছেড়ে যেতে হচ্ছে নিজবাসভূম স্বাধীন দেশ থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মাঝে কোনো স্থান নেই তার! কানাডার অন্টারিওর ড. রবার্ট ফেরি এবং মিসেস ফেরীর কাছে দত্তক হিসেবে থাকবে সে। এই দম্পতি, এই দলেরই অরুণ নামের আরো একটা ছেলেকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করবে। মাদার তেরেসার হোমে ২৭শে মে তারিখে জন্ম হয়েছে অরুণের। এমুহূর্তে ফেরি দম্পতি রয়েছেন দিল্লীতে। অপেক্ষা করছেন সাবিত্রী এবং অরুণের জন্য। সেখান থেকে বিমানে ওঠে এই দত্তকগ্রাহী দম্পতি যুদ্ধশিশুদলের সহযাত্রী হবেন।

ঢাকা বিমানবন্দরে এমুহূর্তে উপস্থিত আছেন মন্ট্রিয়লের চৌকস ও তরুণ ভদ্রমহিলা মিসেস এলিজাবেথ মোলিন। তার বয়স ২৫। তিনি নিঃসন্তান। কানাডা থেকে মিসেস মোলিন এসেছেন তার দত্তক নেয়া শিশুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। মি. ফ্রেড ক্যাপুসিনো এবং মিসেস ক্যাপুসিনোর সঙ্গে সব শিশুদের দেখাশোনার কাজেও সাহায্য করছেন মিসেস মোলিন। সেবামূলক সংস্থা 'ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের' প্রতিনিধি হিসেবে কানাডা থেকে আসা ক্যাপুসিনো দম্পতিও ৪ মাস বয়সী শিখাকে দত্তক হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্রথমবারের মতোই ঘটতে চলেছে এমনটা। প্রথমবারের মতো অভিভাবকহীন বা আন-অ্যাকমপ্যানিড খুদে যাত্রীদের এত বিশাল একটা দল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে একটা একক ফ্লাইট। দিল্লী থেকে কানাডার পথে বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদেরকে নিয়ে নিউইয়র্ক রওনা হওয়ার জন্য সুপরিসর জাম্বো জেটে গ্রহণ করা হয়েছে এক বিশাল আয়োজন। ১৪ জন এয়ারহোস্টেস পালা করে দেখাশোনা করবে এসব শিশুদেরকে। আকাশে থাকাকালে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। স্থাপন করা হয়েছে ঝুলন্ত বেবিকট-সমৃদ্ধ বিশেষ কেবিন। বাচ্চাদের উপযোগী বায়ুচাপ নিশ্চিত করা হয়েছে কেবিনের ভেতরে।

২১শে জুলাই শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোর ১.৩০ মিনিটে নিউইয়র্কে অবতরণ করার পরপরই ভাড়া করা এয়ার কানাডার দুটি বিমান এই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাবে মন্ট্রিয়ল ও টরন্টোতে। চিরকালের নির্বাসনে নিজবাসভূম ত্যাগ করে গিয়ে কানাডার নতুন নীড়ে বড় হতে থাকবে এসব যুদ্ধশিশু। কারা ছিল ওইসব অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীরা? কি তাদের নাম-পরিচয়-দত্তকগ্রাহীদের পরিচয়?

	যুদ্ধশিশুর নাম	**বয়স**	**দত্তকগ্রাহী দম্পতি**	**ঠিকানা**
১.	জহির	২ মাস	মি. রবিন ও মিসেস বারবারা মোরাল	সাসকাতুন, কানাডা
২.	অরুণ	২ মাস	ড. রবার্ট ফেরী ও মিসেস ফেরী	অন্টারিও, কানাডা
৩.	সাবিত্রী	১০ দিন	ড. রবার্ট ফেরী ও মিসেস ফেরী	অন্টারিও, কানাডা
৪.	ওমর	৩ মাস	মি. টি বুন্স্টা ও মিসেস বুন্স্টা	অন্টারিও, কানাডা
৫.	রাফিয়া রীতা	৫ মাস	মি. ফিলিপ রশফোর্ট ও মিসেস রশফোর্ট	অন্টারিও, কানাডা
৬.	বাদল*	২ মাস	মি. গুড ও মিসেস গুড	অন্টারিও, কানাডা
৭.	জরিনা	৬ মাস	মি. মরিস ও মিসেস মরিস	অন্টারিও, কানাডা
৮.	আমিনা	৩ মাস	মি. উলসি ও মিসেস উলসি	অন্টারিও, কানাডা
৯.	প্রদীপ	৪ মাস	মি. ও মিসেস ম্যাকলাফ	হ্যালিফ্যাক্স, নোভা স্কোটিয়া
১০.	শিখা	৪ মাস	মি. ও মিসেস ক্যাপুসিনো	কিউবেক, কানাডা
১১.	রাজীব	৬ মাস	মি. ও মিসেস সিম্পসন	কিউবেক, কানাডা
১২.	মলি	২ মাস	মি.ও মিসেস হার্ট	কিউবেক, কানাডা
১৩.	অনিল	২ মাস	মি. ও মিসেস মোলিন	কিউবেক, কানাডা
১৪.	রোজিনা	৬ মাস	মি. ও মিসেস হুয়া	কিউবেক, কানাডা
১৫.	সমর	৩ মাস	মি. ও মিসেস রেবারিও	কিউবেক, কানাডা

*বাদল [রায়ান বাদল গুড] বড় হয়ে দু'বার বাংলাদেশে এসেছে নিজের জন্মদাত্রী মায়ের সন্ধানে (যদিও পায়নি)। কানাডার মিজ রেমন্ড প্রভেনশার নির্মিত তথ্য-চলচ্চিত্র 'ওয়ার বেবিজের' মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে সে।

THE BANGLADESH OBSERVER

REGD. NO. DA. 5 24TH YEAR. NO. 126 DACCA THURSDAY JULY 20, 1972 SRABAN 4, 1379 (B.S.) JAMADI-US-SANI 7, 1392 (H.) PRICE 15 PAISA (IN WEST BE

War babies leave for new homes

By A Staff Correspondent

Fifteen war babies from Bangladesh left for their new homes in Canada on Wednesday afternoon on board an Air India boeing.

The babies mostly born in destitute camps are on their way to New York en route to Montreal and Toronto through the courtesy of a Canadian philanthropic organisation, 'Families for Children'. They will be adopted by fourteen Canadian couples already selected by the organisation.

On Wednesday afternoon it was an unusual scene at the international lounge at the Dacca airport.

The waiting passengers found that the sofas were mostly occupied by a host of tiny passengers carefully placed in plastic carrycots with synthetic foams. Three foreign ladies and several nuns were busy in nursing them.

In no time the tiny passengers drew the attention of their fellow passengers and ground staff of different airlines particularly the ladies. With motherly sentiment apparent in their expressions many of them virtually mobbed the babies and started patting them. The innocent babies who were deprived of the normal and usual affection of their mothers responded sharply. They were cheerful and smiling.

Out of the fifteen babies, 12 were born in Madam Teresa's Home in Dacca while three were brought from another home run by the Government.

Zarina who is about eight months old was recovered from the Mothna by Sister ... member of the group.

Shabitri who was born at Madam Teresa's Home on July 8 was the youngest one. She was hardly 10 days old while boarding the plane.

Shabitri will be adopted by Dr. Robert Ferrie and Mrs. Ferrie of Ontario, Canada.

The couple will also be adopting another baby Arun, a boy who was born on May 27 at Madam Teresa's Home. The foster parents will accompany the babies from New Delhi.

At the airport I met a young and attractive blond from Montreal Mrs. Elizabeth Mowling. She was 25 and childless.

Mrs. Mowling came all the way from Canada to accompany her foster baby.

She was also helping Mr. Fred Cappucino and Mrs. Cappucino in carrying the other babies.

The couple who represent the philanthropic organisation from Canada is also taking one baby Shikha, a girl of about 4 months.

This is possible for the first time that Air India is handling such a large number of 'mini passengers' in a single flight unaccompanied by their parents.

Special arrangements have been made in the huge Jumbo Jet of the airlines which will carry the war babies from Delhi to New York en route to Canada.

Fourteen air hostesses will be looking after the babies by rotation. Special arrangements have been made to feed the babies on board the plane. The special cabin has been fitted with hanging babycots. The cabin has been pressurised suitably for comfortable breathing of the babies.

...s. Cappuccino and Mrs. Mowling both from a Canadian Philan...

A B.B. ground hostess is patting a war baby at the Dacca Airport on Wednesday. —OBSERVER.

ZILLUR RAHMAN URGES PEOPLE

Devote to task of national reconstruction

BHAIRAB, July 19:—Mr. Zillur Rahman, General Secretary of the Bangladesh Awami League, yesterday called upon the people to whole heartedly devote themselves to the task of national reconstruction under the inspiring leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, reports BSS.

He was addressing a big public meeting at Simulkandi, a village five miles from here. The meeting was presided over by Dr. Altafuddin Ahmed, retired Principal of Chittagong Medical College and was also addressed by Mr. Abdur Razzaq, MCA Organising Secretary of the Awami League.

Mr. Zillur Rahman said that Mujibbad was the best political philosophy so far evolved.

He also said that Mujibbad was an improvement over all other 'isms'. And it would bring about the economic emancipation of the toiling masses of Bangladesh.

Recounting the measures taken by the Government under the able and dynamic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League General Secretary, said that despite unprecedented devastation and destruction caused by the surrendering Pakistani army the Bangladesh Government had during the short time at their disposal taken giant strides in putting the economy of the country on an even keel.

Mr. Zillur Rahman said that despite the fact that the country was in ruins, homes and properties destroyed and communication totally disrupted the Government had abolished land revenue upto 25 bighas of land holding per family, had remitted arrear rent and taxes had given pay rises to low-paid employees in the Government and nationalised industries and had given relief to the suffering people. These steps would amount to over one hundred crore Taka, he said.

Abdur Razzaque

Mr. Abdur Razzaque in his speech said that those who were today carrying on a campaign against India and the Soviet Union were in fact trying to make Bangladesh friendless and thus strengthen Pakistan so that if condition favoured they could fulfil their nefarious designs.

He declared that 30 lakh people had laid down their lives

(Continued on page 8 col. 7)

Envoy calls on Mujib

Poland to help Bangladesh enter UN

The newly-appointed Polish Ambassador in Bangladesh, Mr. Zbigniew Byszewski, called on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Ganabhavan on Wednesday evening and stayed with him for sometime.

AL leader stabbed to death in Chaumuhani

CHAUMUHANI, July 19:—Muhammad Shafiullah (47), a local Awami League leader was stabbed to death on Tuesday night by some unknown assailants at his residence at Dugpur under Begumganj police station, according to Mr. Nurul Huq MCA.

Taka 144 crores bank credit for jute trade

The Nationalised and the exchange banks operating in Bangladesh have offered to provide finance to the jute trade and industry to the extent of Taka 144 crores, as compared to Taka 107 crores during the last season, reports ENA.

Of these Taka 116 crores will be provided by the banks from

দি বাংলাদেশ অবজার্ভার
সংখ্যা: ২০শে জুলাই ১৯৭২ সাল

War babies are being taken into Air India Boeing on Wednesday afternoon at the Dacca airport en route to Canada. —OBSERVER.

Gowon says

Simla accord a crowning success

NEW DELHI, July 19:—Nigerian leader General Yakubu Gowon has described the recent Simla accord as "a crowning success" and expressed the hope that it will usher in a sub-continent, reports PTI.

General Gowon made this remark when he met External Affairs Minister, Mr. Swaran Singh at Lagos on Tuesday, the Ministry of External Affairs said here today.

In the course of their talks, Mr. Swaran Singh apprised General Gowon of the initiative taken by the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi for the convening of the summit meeting which enabled India and Pakistan to enter an agreement "which constitutes the first step for reversing the atmosphere of conflict and suspicion between the two neighbouring countries."

The summit, he said, had opened the possibility of working out a framework for a ...iscuss recognition," Mr. Singh ...ub-continent.

Profitable exchange

Reuter adds: India's External Affairs Minister Sardar Swaran Singh had extended talks with the Nigerian leader General Yakubu Gowon on Tuesday on a wide range of international

Kissinger holds talks with Hanoi negotiators

WASHINGTON, July 19:—Presidential adviser Henry Kissinger is holding private talks in Paris today with North Vietnamese negotiators Mr. Le Duc Tho and Mr. Xuan Thuy; the White House announced; reports UPI.

... announcement the White House said that the President's national security affairs adviser is expected to return to Washington today.

He flew to Paris on Tuesday for the private sessions to get the Paris peace talks moving again.

Stranded Bangalis

Particulars of armed forces personnel sought

By A Staff Correspondent

Relations or next of kins of Bangali Army, Navy and Air Force personnel who are now stranded in Pakistan have been requested to furnish particulars about personnel to the Bangladesh Army, Navy and Air Force headquarters, says an ISPR Press release.

The particulars of the ...

War babies

(Continued from page 1)

As the Jumbo Jet will land in New York airport at 1.35 a.m. (B.S.T.) on Friday two chartered planes of Air Canada will carry the babies straight to Montreal and Toronto.

The war babies from Bangladesh who will be brought up in their new homes in Canada and their foster parents: Mr. Rabin and Mrs. Barbara Morrall, Saskatoon Canada; Arun, 2 months and Shabitri, 10 days—Dr. Robert Ferrie and Mrs. Ferrie Ontario, Canada; Omar, 3 months—Mr. T. Boonstra and Mrs. Boonstra, Ontario; Rafia Rita, 5 months—Mr. Philip Roschefort and Mrs. Roschefort, Ontario; Bathol one month—Mr. and Mrs. Good, Ontario. Zarina, 6 months—Mr. and Mrs. Morris Ontario; Amina, 3 months—Mr. and Mrs. Wolsey, Ontario; Pradip 4 months—Mr and Mrs McCullough Halifax Novascotia; Shikha 4 months—Mr. and Mrs. Cappuccino Quebec; Rajib 6 months—Mr. and Mrs. Simpson Quebec; Molly 2 months—Mr. and Mrs. Hartt, Quebec; Anil 2 months—Mr. and Mrs. Mowling Quebec; Rezina 6 months—Mr. and Mrs. Huo Quebec and Semar, 3 months—Mr. and Mrs. Reberio, Quebec.

২. নির্বাসিত একাত্তরের যুদ্ধশিশু!

একাত্তরের যুদ্ধশিশুদের নিয়ে আমার মনের মধ্যে আশৈশব লালিত বেদনা বিধুর অনুভূতি নিয়ে রচিত দৈনিক জনকণ্ঠের ১৬ই মার্চ ২০০৭, শুক্রবারের সাময়িকীর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে নিবন্ধটির ওপরে নীচের মন্তব্য করেছিলেন পত্রিকাটির তৎকালীন সাহিত্য সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ।

“আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদান আর সারা বাংলাদেশে অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর যে করুণ কাহিনী, তার বহু কিছুই আজো অনুদঘাটিত। পাকিস্তানি হানাদার বর্বর বাহিনীর পাশবিক লালসা আর প্রতিহিংসার শিকার কত বাঙালি তরুণী যে অপ্রত্যাশিত মাতৃত্বকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, সে পরিসংখ্যান কখনো হয়তো পাওয়া যাবেনা। অনেকে লজ্জায়-অপমানে আর সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে আত্মহত্যা করেছে। তারপরও কয়েক হাজার যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছে। কিন্তু সেই শিশুরা তাদের মাতৃভূমিতে ঠাঁই পায়নি। যেতে হয়েছে দেশান্তরে। মুক্তিযুদ্ধের তিন যুগ পরেও, তারা কি বিস্মৃত সেই বেদনা? জানা নেই আমাদের। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালের বেদনার একটি অধ্যায় নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করেছেন একাত্তরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা - সাজিদ হোসেন।”

নির্বাসিত যুদ্ধশিশু

সবকটা জানালা খুলে দিলে, সবকটা দরোজা খুলে দিলে, সবকটা আঙিনা খুলে দিলে, সবকটা সীমানা খুলে দিলেও ওরা আর আসবেনা – কোনোদিনও আসবেনা! আমরাই ওদেরকে পাঠিয়েছি দূর নির্বাসনে, প্রথম সুযোগে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর মুখবোঁজা কান্নার বিপরীতে পৃথিবীর ক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরি থেকে উষ্ণ

লাভার মতো তাদের অভিমানী উৎসরণ। একটি জাতির জন্মের জ্বলজ্বলে প্রতিচিত্রে সুন্দর সৃষ্টির বিপরীতে 'অসুন্দর' উপস্থিতি। জন্মে যারা কাঁদতে পারেনি, কান্না শুনে হাসতে পারেনি 'পাড়া-পড়শী', উচ্চারিত হয়নি 'মা', কোল অন্ধকার করে এসেছিল ওই শিশু-যাদুকরেরা, 'চুপিচুপি'। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়ের পথে, মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে, অর্জনের পথে হঠাৎ যেন কোনো যতি, ছেদ, ব্যত্যয়। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তে ভেজা ফুলের বাগানে পুষ্পিত ছিলনা তারা!

স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতি

সমুদ্র শহর চট্টলায় সাগর থেকে একটু দূরে খোলা আকাশের নীচে আমি। স্নিগ্ধশান্ত জলরাশির বুক চিরে এগিয়ে যায় জাহাজ – দেশ ছেড়ে ভিনদেশ পানে। ওই দূর সমুদ্রে কাটিয়েছি জীবনের একটা লম্বা সময়। পুনর্জন্ম হয়েছিল জলধিতে – হয়েছিলাম জলজ। আর এখন মৃত্তিকা-বন্দী! আর কয়েকটা দিন পরেই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। শৈশবে মুক্তিযুদ্ধকালের স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করে মনের গভীরে। যুদ্ধ, আগুন, গুলি, হত্যা, ধর্ষণ, গণকবর... পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ... বাঙালির বিজয়। আর ওই পরিচিত্রে আমার অবস্থান যেন সিন্ধুর মাঝে বিন্দু। সামান্য কিশোর – যে সশস্ত্র হওয়ার অপেক্ষায় ক্যাম্পে কাটিয়েছে অস্থির-অধীর সময়। অনেকক্ষণ আগেই এসেছি ছাদে। স্পষ্ট দেখা যায় দূর সমুদ্রের জাহাজের দ্যুতি। রেলিংয়ের ধারে ভর দিয়ে দেখছি সৃষ্টিকর্তার অপরূপ প্রকৃতি। সাগরের ঢেউয়ের দোলায় বক্ররেখায় ছড়িয়ে যায় ফসফরাসের আলোকধারা। তবে আজ আকাশের ছাদ থেকে ঝুলছে না কোনো তারার ঝালর। প্রকৃতিও কি আমার মতো বিমূঢ়!

শীতল মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যাওয়া বসন্তের রাত। নিজেকে বড় একাকি এবং নাজুক মনে হয়। চারদিক চারপাশ থেকে আসা হালকা এবং অস্পষ্ট আভাই যেন এ মুহূর্তের একমাত্র সুখবোধ। একাকিত্বেই অনুভূত হয় – কোনো তুচ্ছ অস্তিত্বও কত আকাঙ্ক্ষিত। এত অন্ধকার কেন? চাঁদও কি মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। আর আমি ফিরে গেছি সেই যুদ্ধের মাঠে। পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের কাছে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত সীমান্তবর্তী আমাদের মধুপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। সেদিন সেখানে অপেক্ষমান নারীরা আর আমার মতো কিশোরেরা মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেনি। একজন 'অবলা' আর অন্যজন 'কোমল' বলে! আরো তিনজন কিশোরের (গুটিল, সোহেল এবং শরীফ) সঙ্গে বার্তাবাহকের কাজ করেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র 'বড়রাই' [কত আর বড়, আমার চাচাত ভাই

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মান্নান ছিল মাত্র ১৬ বছরের!] নির্বাচিত হয়ে চলে যেত শিলিগুড়িতে। প্রশিক্ষণ শেষে শুরু করতো অপারেশন।

তবে, এই আঁধারের রাতে আকাশ আর মেঘের নীচের শূন্যতায় একাকিত্বের তারল্যে সবকিছু ছাড়িয়ে মনে পড়ে তাদের কথা যারা আমাদের প্রযুক্তির ভাষায় 'ইমপিউরিটিজ ইন দ্য সিস্টেম'! অতএব পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করাই উত্তম এবং আবশ্যক। পূত-পবিত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে কোনো 'ইমপিউরিটিজ' থাকতে পারে না! জয় বাংলা!! আজ ভাবি – ওই অবাঞ্ছিত, অযাচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অনাহুত শিশুরা কি রাজাকারদের চেয়েও 'ইমপিওর' ছিল!

বিস্মৃতির আশঙ্কায় শঙ্কিত!

তাহলে কি আমাদের সমগ্র জাতি বিস্মৃতির জালে আবদ্ধ! কি নির্মম সত্য কথা... বিস্মৃতি শুরু হয় মনে রাখার প্রয়াসেই! বারবার বলি, প্রতিদিন বলি, 'ভুলব না... ভুলব না'। তবু কেন এই নিষ্ঠুর বিস্মৃতি? কোনো কোনো 'দিন' এলে জেগে উঠি কেউ কেউ। কিন্তু এটাও সত্য যে, অন্যদিকে চুপিসারে প্রতিরাতে অশ্রুর প্লাবন বয় কোনো কোনো বাড়িতে। যেমন আমার জেলা শহর পাবনার 'পুষ্পালয়ে'। অপেক্ষার প্রহরতো আর শেষ হতে চায়না! সারা বছর ধরে দিনরাত জেগে থাকে হাতে মোমবাতির বহ্নিশিখা নিয়ে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে কেমন ছিল বাঙালির জীবন?

আমাদের স্বাধীনতায় শুধু গুলি আর গুলি। বিজয়ে শুধু রক্ত আর রক্ত। জাতীয় সঙ্গীতে শুধু কান্না আর কান্না। পতাকায় শুধু মায়ের আর বোনের 'অসম্মান'। মানচিত্র খচিত পতাকায় খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে কি প্রতিভাত হয়ে ওঠেনা লক্ষ লক্ষ রক্তেভেজা শাড়ির প্রতিচ্ছবি? হাজার হাজার যুদ্ধ-শিশুর পবিত্র মুখচ্ছবি? 'যারা নেই' তাদের আত্মার উপস্থিতির অনুভূতি পেতে উদগ্রীব অনেকেই। কিন্তু যারা আছে! সুদূর কানাডায়, সুইডেনে, ফ্রান্সে বা অন্য কোনো ভিনদেশে; অন্য কোনো মায়ের কোলে।

ওরাই 'একাত্তরের শিশু'। একাত্তরের যীশু বললেও অর্থে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনা। বাঙালি জাতির পাপ ধুয়ে-মুছে নিয়ে চলে গেছে সানন্দে! কিন্তু, সেরকম কোনো কিছু আসলেই ছিল কি? থাকলে, কতজন ছিল তারা? কে জানে – পাঁচশ, পাঁচ হাজার নাকি পঞ্চাশ হাজার! রাজাকারের সংখ্যা জানি না। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা জানি না। শহীদের সংখ্যা জানি না। ধর্ষিতার সংখ্যা জানি না। 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' নাটকে রাজা সূর্যকুণ্ডুও কিছু জানতো না। জানার প্রয়োজন পড়তো না। তাহলে আমাদেরইবা জানার প্রয়োজন কি? 'লজ্জার জন্ম' নিয়ে ভেবে ভেবে নিজের সুখ নষ্ট করার প্রয়োজন কি? অতএব আমরাও জানি না! আর বেজন্মাগুলো জন্মেছিল কেন? পাকিস্তানিরা ত্রিশ লাখ মানুষ মেরে ফেলতে পারল আর ওই নষ্টনারীদের বাঁচিয়ে রেখেই করে ফেলল আত্মসমর্পণ। আর তাছাড়া আমাদের বিজয়ে তাদের কি কোনো ভূমিকা ছিল? ওরাতো জন্মেছিল বাহাত্তরে। শুধুই জন্মেছিল। এটাও কি কোনো 'অবদান'!

মহাবিশ্বের সময়ঘড়ির 'সময় বহিয়া যায়'। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বাহাত্তরে সে আজ পরিপূর্ণ তরুণ বা তরুণী। তারা কি সত্যি আছে এই পৃথিবীর কোনো কোণায়? নাকি মুছে গেছে সভ্যতার পবিত্রতা থেকে; যেমন করে মুছে ফেলেছি তাদের – আমাদের স্মৃতি থেকে, চেতনা থেকে। নাকি এখনো মাদার তেরেসার এক্স-ফাইল খুললে পাওয়া যাবে হাজারো বীরাঙ্গনা মায়ের হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস আর সংখ্যা। বিস্মৃতির জাতি, তাই প্রতিদিন বলি, ভুলব না – ভুলব না। একুশ তোমাকে ভুলব না। শহীদ তোমাকে ভুলব না। 'মনে রাখার' প্রতিজ্ঞা করতে পারি না, সদা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত!

এ কেমন জন্ম!

কিন্তু, বিস্মৃতিশীল জাতির কপালে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো জ্বলজ্বল করছে একাত্তরের যীশুদের অস্তিত্ব। পৃথিবী গ্রহেরই এক নির্বাসনে, নাহলে অন্য নির্বাসনে। নিঃশ্বাস নিয়ে চলেছে এই বায়ুমণ্ডলে; আমাদের সঙ্গেই! মুক্তিযুদ্ধের

ফসল ওরা। অথবা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর এদেশীয় রাজাকারদের নষ্টের ফসল তারা। জন্মের পরে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কেঁদে ওঠে সদ্যোজাত শিশু। ওরাও কেঁদেছিল। আলোময় পৃথিবীর আলোর ঝলকানিতে, নাকি কেউ বরণ না করে নেয়ার বেদনায় – সেটা অবশ্য আমরা জানতে চাই না! কাউকে চিনতো না তারা। এমনকি তাদের মায়েদেরকেও না। আর পিতারাতো তখন নিরাপদ পাকভূমি পাকিস্তানে! ওরা জানতো যে তারা কোনো বাবা-মার পবিত্র ভালোবাসার ফসল নয়। ওদের ঔরসদাতা পিতা আর জন্মদাতা মায়ের জন্য উচ্চারিত হয়নি কোনো পবিত্র কলেমা। জন্মের পরে উচ্চারিত হয়নি কোনো আজান বা একামত। তাদের শুধু জানা ছিল – কিছু পাকিস্তানি শকুন তাদের মায়েদের শরীর খুবলে খুবলে খেয়েছে দিনরাত। ওই অসহায় মায়েরাও জানতো না যে কারা এই অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদের পিতা। তারা এও জানতো যে, ওরা একা ছিলনা। ওই পাপের পথে সঙ্গী ছিল এদেশীয় কিছু দালাল, শান্তি কমিটি, জামাত, আল-বদর, আল শামসের কুলাঙ্গারেরা। আর সবকিছুই ছিল জায়েজ – 'তথাকথিত' ইসলামের নামে! প্রকৃত ইসলামের ব্যাখ্যা খোঁজা এখানে অবান্তর। আশি শতাংশ ধর্ষিতার ধর্ম ছিল ইসলাম!

এখন সেসব বড় হওয়া শিশুদের কেমন অনুভূতি? কীভাবে নেয় তারা তাদের অনাহুত অবস্থানকে। হঠাৎ করে সিস্টেমে 'প্রবেশ' করা! তারা কি জানতে চায় যে কারা ছিল তাদের 'মা'! আমরা কি একবারের জন্য, আমাদের ব্যস্ত জীবনের একটা মুহূর্তের জন্য তাদের কথা ভাবতে পারি? আসলে পারি না। কারণ, সিস্টেমে কোনো ইমপিউরিটিজ থাকতে নেই। আমরা সবাই এ সমাজে বসবাস করি। সামাজিক ভারসাম্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওদের সংস্পর্শে আমাদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটা জঞ্জালে ভরে উঠতো। বাঁচা গেছে, দূরদেশে নির্বাসনে দিয়ে!

কোনো কোনো রাত খুব কষ্টের হয়। আমার আজকের রাতটাও কি তাই! কোনো কোনো পথ খুব দীর্ঘ হয়। কোনো কোনো বেদনা খুব ভয়ঙ্কর হয়। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়েও শুধুমাত্র কমবয়সী বা অপরিপক্ক হবার কারণে মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারা আমার কিশোর মনের বেদনাও কি তাই! [প্রকৃতির ওপরে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বেঁচে আছি!] আমাদের সমগ্র চারপাশ চারদিক যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে এমনতর 'অগ্রহণযোগ্য' এবং হয়তোবা 'অযৌক্তিক' ভাবনায়। ওইসব যুদ্ধশিশুরা আমার চেয়ে কতইবা ছোট হবে। একাত্মতাবোধ করি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। আমরা যতই স্বার্থপর হইনা কেন, সবচেয়ে সত্যি কথাটা হল – তারা এখনো বেঁচে আছে। তারা পড়াশোনা করে, গান গায়, নাচে এবং গল্প করে। তবে আমাদের এই দিগন্তে নয়, অন্য কোনো দিগন্তে।

নির্মম সত্য!

যুদ্ধের ঠিক পরের কথা। তখনো চালু হয়নি ইশ্বরদী বিমানবন্দর। তবে রিলিফের মালামাল নিয়ে কার্গো-প্লেন চলাচল শুরু হয়েছে ঢাকা থেকে। আমার মামা (মরহুম) ওসমান গণি তখন পাবনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (পরবর্তীকালে যুগ্ম-সচিব)। সরকারি বাসা না পাওয়ায় আমাদের বাসায় থাকতেন। তিনি একটা রিলিফ প্লেনে ঢাকা যাবেন।

সেইসঙ্গে আমাকে এবং আমার ছোটবোন শানুকেও (ডাঃ শাহীন ফেরদৌস) নিয়ে যাবেন। তখন আমার বয়স বার। শানুর নয়। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও আনন্দ যেন এভাবেই আসে! যে কোনো এয়ারপোর্টের পরিবেশ সবসময়েই উপভোগ্য। কিন্তু আনন্দ মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই। প্লেনের দেরি দেখে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম বিমানবন্দরের বিভিন্ন ঘর। আমাদের সঙ্গে থাকা একজন কর্মকর্তা কয়েকটা ঘর দেখিয়ে মামাকে যা বলল তার অর্থ হল – এসব ঘরগুলো ছিল পাকিস্তানি আর্মিদের টর্চার সেল। এখানেই মেয়েদেরকে ধরে এনে রাখা হতো এবং এর পরের পরিণতি উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। লক্ষ্য করলাম যে প্রতিটি ঘরের জানালার কাচে সাদা কাগজ সাঁটা এবং টেপ দিয়ে ক্রস করা। কান্না আর আর্তনাদ আড়াল করার কি ব্যর্থ প্রয়াস! অত্যাচারের ভয়াবহতা কি আমি পুরোপুরিভাবে বুঝতে পেরেছিলাম? হয়তো। রিলিফ প্লেনে আমার বা শানুর যাওয়া হলনা। প্লেনে কোনো ‘ছোটদেরকে’ নেয়ার নিয়ম ছিল না। [ছোট বলে মুক্তিযোদ্ধাও হতে পারিনি!] সেজন্য প্লেনে আসা বিদেশিরা শুধু মামাকেই নিল। চলে গেল প্লেন। মন খারাপ করে আমরা দু'ভাইবোন ফিরে চললাম পাবনার দিকে। বারবার ওই টেপ সাঁটা জানালার ভয়াবহ দৃশ্য জেগে ওঠে মনে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম সেই চাপা আর্তনাদ-গোঙানী। যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি ‘সশস্ত্র’ হতে পারিনি! ভিজে আসে চোখ। ভূপেন হাজারিকার গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনে জাগে, মানবতার পতন দেখে, শুধু গঙ্গা-পদ্মা কেন, থেমে যায়না কেন – পৃথিবীর আবর্তন!

সবচেয়ে সত্যি কথা – একাত্তরে আমাদের অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীরা অস্তিত্বহীন নয়। পাবনার নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে প্রায় সাতটি শিশুকে পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। কানাডার ফস্টার প্যারেন্টস দত্তক নিয়েছিল ১০০ শিশু। প্রথম পনের জনের তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের ১৭ই জুলাইয়ে প্রথম দলে ছিল ওই ১৫ জন। বড় হয়ে একজন একাত্তরের ভয়াবহ অতীত-জন্মকে সহ্য করতে পারেনি; আত্মহত্যা করেছে। বাকিদের মধ্যে দুজনের মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। এরকম হওয়াইতো ছিল স্বাভাবিক। কারণ, জন্মের পূর্বে গর্ভকালীন সময়ে তাদের মায়েরা যে অসহ্য অপমানকর মুহূর্ত কাটিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা

যায় না। সবগুলো শিশুরই জন্মের সময়ে ওজন ছিল তিন পাউন্ডের চেয়ে কম।

কেমন করে জানব তাদের সব কথা? আমাদের ঘরের বন্ধ দরোজায় টোকা দিয়ে কে বলে যাবে এমনতর কঠিন শব্দাবলী? এতগুলো বছর পরে কে নাড়া দিয়ে বলে যাবে রুদ্ধশ্বাসে শোনার মত সত্যগাথা। এমন কঠিন এবং রুঢ় বাস্তবতা নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং করছেন বিশ্বজুড়ে অনেকেই। এদের তালিকায় আছেন মুস্তাফা চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, নয়নিকা মুখোপাধ্যায়, বীণা ডি'কস্টা, সুসান ব্রাউনমিলার প্রমুখ। আমরা জানি যে একাত্তরে প্রায় দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সুসান ব্রাউনমিলারের মতে এই সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ।

আমিনা লিন উলসি

কানাডায় দত্তক নেয়া সকল যুদ্ধ-শিশুদের সম্পর্কে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়ে আছে “ফ্যামিলি ফর চিলড্রেন” (এনজিও), ইমিগ্রেশন কানাডা, এমপ্লয়মেন্ট কানাডা, কানাডার প্রভিন্সিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অব অন্টারিও এবং কলকাতার মাদার তেরেসা সংস্থায়। অধুনা ইন্টারনেটের কল্যাণে এসকল তথ্য এসেছে মানুষের নাগালে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়টা অন্যখানে। সারা বাংলাদেশ চষে ফেললেও অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীদের সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া যাবে না। যেন এরকম কোনো ‘জন্মই’ হয়নি কোনোদিনও, এদেশে! কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় যে উনিশশ পঁচাত্তর সালের পরে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী পুড়িয়ে দেয়া হয়। সেসময়ে কানাডীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এক দারুণ তথ্য। সেখানকার উলসি পরিবারের ডেল ও ডোনা উলসি আমিনা (বর্তমানের নাম আমিনা লিন উলসি) নামের একটি শিশুকে দত্তক নেয়। এখানেই শেষ নয়। একই পরিবার কোরিয়া থেকে জুলিয়াকে, ভিয়েতনাম থেকে থাইলো, লন্ডন থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ডারিয়েক, সাল ভাদর থেকে জোনাথন এবং ভারত থেকে শেরিনকে দত্তক নেয়। কি মহৎ পরিবার!

ডেল এবং ডোনা যেভাবে ওই বাচ্চাদেরকে বড় করেছে সে কাহিনী অবিশ্বাস্য! বিশ্ব কখনো জানেনি, স্বীকৃত হয়নি এমনতর মানবতার চরম উৎকর্ষ। সবগুলো বাচ্চাকে তারা তাদের নিজ নিজ অতীত সম্পর্কে সবকিছু বিস্তারিত বলেছে; ভারসাম্য বজায় রেখে, ভালোবাসা দিয়ে, আদর দিয়ে। কোনো বাচ্চাই মানসিকভাবে একটুও কষ্ট পায়নি। আমিনা বড় হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। সামাজিক সম্পৃক্ততার প্রয়োজনে আমিনাকে সেখানকার একটি বাংলাদেশি পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয় ডোনা। এমনকি ১৯৮৯ সালে, দুটি

এতিমখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য সে আমিনাকে নিয়ে আসে ঢাকায়। বাংলাদেশের সঙ্গে শেকড়ের সম্পর্ক অনুভব করে আমিনা। অন্তত দু'বছরের জন্য কাজ করতে চায় মাদার তেরেসার সংস্থায়।

আমিনার মা কি আত্মহত্যা করেছিল? নাকি ধর্ষণের লজ্জা আর বেদনা বুকে নিয়ে লুকিয়ে গেছে আমাদের 'সভ্য' সমাজে। তার কি বিয়ে হয়েছিল? নাকি সে হয়েছিল কোনো অস্পৃশ্য বেশ্যা? আমিনার বাবা কি বেঁচে আছে? একজন বাঙালি মেয়ের প্রতি তার বর্বর অপরাধ কি তার মনকে নাড়া দেয়? নাকি সে কোনো মুক্তিযোদ্ধার হাতে নিহত হয়েছে? আমিনা কি পাকিস্তানি! আমরা কি কখনো অনুভব করতে পারব একটি নিষ্পাপ মনকে, যে জানে যে সে এক বর্বরতার ফসল। তার মা ভালোবাসাহীন এক অমানবিক নিপীড়নের শিকার। তার বাবা এক বিকৃত রুচিসম্পন্ন বিকারগ্রস্ত মানুষ।

আমার রায়ান, আমার বাদল কই...

রায়ান বি. গুড একজন কানাডীয় নাগরিক। বাস করেন অন্টারিওর ওয়াটারলুতে। একটি কবিতায় তিনি তার জীবনের কথা লিখেছেন। সেটায় বিবৃত করেছেন, 'আমার নাম রায়ান বাদল। আমার দু'জন মা। একজন ডাকে রায়ান আর আরেকজন ডাকে বাদল বলে। রায়ান বলে ডাকা মাকে আমি আমার জীবন ধরে চিনি-জানি। বাদল বলে যে ডাকে তাকে আমি কখনোই দেখিনি। বাংলাদেশে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বাদল বলে ডাকা মায়ের গর্ভে। তিন সপ্তাহ পরে কানাডায় আমার আবার জন্ম হয় রায়ান বলে ডাকা মায়ের কাছে!' ১৯৭১ সালে একজন পাকিস্তানি সৈন্য আমার বাদল বলে ডাকা মাকে ধর্ষণ করেছিল। আমি একজন যুদ্ধ-শিশু। [সূত্রঃ কানাডার রেমন প্রভেনশারের 'ওয়ার বেবিজ' তথ্যচিত্র।]

স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি সেনাবাহিনী কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল এক থেকে দুই লক্ষ নারী, যাদের বেশিরভাগই কোরিয়ান। এদের সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'কমফোর্ট উইমেন' হিসেবে! যুদ্ধকালে ধর্ষণ কি শুধুই নারীকে অপমান? এটাতো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। বসনিয়া, রুয়ান্ডা, দারফুর, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, সোমালিয়া এবং আমাদের বাংলাদেশে- নারীকে অপমানিত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কারণে নয় বরং একই কারণে! যুদ্ধজয়ের কৌশলরূপে অন্যতম অস্ত্র (!) হিসেবে আগ্রাসী সেনাবাহিনী প্রয়োগ করে 'যৌন-সন্ত্রাস'!

শৃঙ্খল বাহিনীর পরিকল্পিত বিশৃঙ্খল উল্লাস! সাবাস সভ্যতা! সাবাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনী! আমাদের মাতৃভূমির মা-বোনের জন্য জঘন্য এই অপমান ছিল 'স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি'! বাংলাদেশে ঊনিশশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে নয় মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে আড়াই থেকে চার লক্ষ বাঙালি নারী। ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুডের সূত্রমতে জন্ম নিয়েছিল পঁচিশ হাজার যুদ্ধ-শিশু!

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান এমনিতেই নাজুক। 'নষ্ট' হয়ে গেলে তার ততোধিক শোচনীয় অবস্থান সহজেই অনুমেয়। সদ্য স্বাধীন দেশে সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম বিবেচনায় বাঙালি দৃষ্টিকোণে 'পবিত্রতা' ছিল দূষিত পাকিস্তানি রক্ত থেকে মুক্তি। একাত্তরের যুদ্ধশিশুদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এখান থেকেই। জন্মের পরে কি হবে শিশুদের পরিচয়? কেমন হবে পাঞ্জাবি-বাঙালি রূপ? আঁচল-আবৃত রক্ষণশীল বাঙালি সংস্কৃতি-সমাজ কীভাবে নেবে তাদেরকে? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বীরাঙ্গনা বলে, কন্যা বলে বুকে টেনে নিলেও, সবাইকে যার যার পরিবারে ফিরিয়ে নিতে বললেও, একথা স্পষ্ট যে স্বাধীন দেশের নতুন নাগরিকরা সেই উদারতার পথে এগিয়েছে সামান্যই। ঊনিশশ বাহাত্তরে নগরবাড়ি ঘাটের কাছে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আমিও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় একথা শুনে দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। একই সময়ে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানি রক্তধারী ওইসব শিশুদেরকে বাংলাদেশে রাখা হবে না।

বীরাঙ্গনার অশ্রুধারায় যুদ্ধশিশু

নতুন দেশের সামনে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো দাঁড়ায় যুদ্ধ-শিশুরা। সরকারের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে সমাজে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য আসে। তবে, জাতীয়তা এবং বংশধারার সীমাবদ্ধতায় যুদ্ধ-শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক দত্তকায়নের বিকল্প ছিলনা। সদ্য-স্বাধীন দেশে ওই যুদ্ধ-শিশুরা হয়তো ছিল জাতীয় কলঙ্ক এবং অবমাননা। বাঙালি নারী এবং তার শরীর দখল করেছিল দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। লুণ্ঠিত জড় বস্তু নয়, বরং জৈব জীবন্ত মানুষ বলেই দুর্ভাগাদের মনে থেকে যায় নির্মম অত্যাচারের দুঃসহ স্মৃতি। নতুন শব্দ না হলেও 'বীরাঙ্গনা' ডাকটি আসে এক অনন্য পবিত্র পর্দারূপে। কিন্তু ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি, পরিচয়, ইতিহাস বা স্মৃতি – সবই এসে আপাত বাধা হয়ে দাঁড়ায় অশ্রুসিক্ত মানবীদের সামনে। জাতি গঠনে এমন নারী ও নারীদের 'অপসৃষ্টি'-কে ইতিহাসের পাতা থেকে সরিয়ে দেয়াই উত্তম! ওদের আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল; অন্যান্য শিশুদের মতোই। সরকারের কাছে

ছিল দুটি পথ। প্রথমটা গর্ভপাত এবং পরেরটা দত্তকায়ন। সবটাতেই বিপত্তি। গর্ভপাত অস্বাভাবিক। হাজার হাজার বীরাঙ্গনা নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন করে তাদের গর্ভপাত। অন্যদিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি ওঠে – সব মুসলিম শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে বিধর্মীরা! এমনও ঘটেছে, হয়তো জন্মের পূর্বে সন্তান দত্তক দেয়ার কথা বলেছে কোনো বীরাঙ্গনা। কিন্তু পরমুহূর্তে সদ্যোজাত শিশুর নিষ্পাপ চেহারা দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে...! হ্যাঁ বা না বলার শক্তি হারিয়ে বিমূঢ় বিপর্যস্ত বীরাঙ্গনা মা। কিন্তু কেউ এসে বলেনি, আমি তোমার এবং তোমার শিশুর যত্ন নেব!

একটা বিষয় অনুভব করতাম, সবার কাছেই বীরাঙ্গনারা ছিল নিরপরাধ তবে লজ্জার নারী! সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান হিসেবে সামনে আসে আত্মহত্যা, গর্ভপাত, সদ্যোজাত সন্তান হত্যা বা বিক্রী করে দেয়া। আর এমনটাই ঘটছিল বাংলাদেশের শহরে শহরে। পাবনাতে তো বটেই। কোনো কোনো পরিবার তাদের কন্যাদেরকে কলকাতায় পাঠিয়ে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু, কে তার শরীর নিসৃত শরীরেরই অংশকে দিয়ে দিতে চায়? চৌদ্দ বছরের কিশোরীকেও অবুঝ মনে বুঝতে হয়েছে যে সদ্য স্বাধীন দেশে কোনো ভবিষ্যৎ নেই তার সদ্যোজাত শিশুর; তা সে যতই নিরপরাধ আর পবিত্র হোক না কেন! রাষ্ট্রের পবিত্রতাই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

দত্তকায়ন

১৯৭২ সালে যুদ্ধশিশুদের আশ্রয় নিশ্চিত করার জন্য অনুভূত হয়েছিল একটা আইন প্রণয়ন করার। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যুদ্ধ-শিশুদের অভিভাবকত্ব এবং আন্ত-দেশীয় দত্তকায়নের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ১২৪ নম্বর আদেশে প্রণীত হয় 'বাংলাদেশ অ্যাবানডান চিলড্রেন (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডার'। যদিও পরবর্তীকালে, বিদেশে প্রেরণ করা সেসব শিশুদের নিয়ে নানাবিধ আপত্তিকর বিষয়ের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, কোনোরকমের তদন্ত ছাড়াই আইনটি স্থগিত করে দেয়া হয়। যাহোক, কয়েকটি এনজিও, চার্চ বা স্বেচ্ছা-অভিভাবকত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছিল সুকঠিন গুরুদায়িত্ব পালনে।

মাদার তেরেসার মাধ্যমে এসব শিশুদের বেশিরভাগই প্রেরিত হয়েছিল কানাডার বিভিন্ন পরিবারে। এদের একটি অংশকে পাঠানো হয়েছিল সুইডেন, ফ্রান্স এবং সম্ভবত অস্ট্রেলিয়াতেও। দত্তকায়নে আগ্রহী বিদেশি সংস্থাগুলো থেকে নার্সিং হোমগুলোর প্রতি অনুরোধ ছিল, জন্মের পরে যেন কোনো বাচ্চাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া না হয় বা অন্য কোনোভাবে বিক্রী করে দেয়া না হয়!

তারপরেও অবহেলা ছিল। সবারই দৃষ্টি থাকতো মায়েদের দিকে। বাচ্চাগুলো যাক আবর্জনাগারে!

যুদ্ধ-শিশুদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইন, সনদ, পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট – কতকিছুরই প্রয়োজন হয়েছে। যাহোক, বাংলাদেশের ভেতরে কোনো মানুষই দত্তকায়নে এগিয়ে আসেনি। সরকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন সেবা সংস্থাগুলোকে অনুমতি দেয় এবং পাসপোর্টও প্রদান করে। এমনকি কানাডাতে নেয়া হয়েছে মাত্র দশ দিনের বাচ্চাকেও! আমাদের যুদ্ধ-শিশুদের জন্য এতসব ডকুমেন্টের চেয়েও সবচেয়ে বেশি করে প্রয়োজনীয় যা ছিল তা হল - একটি গন্তব্য! একটি ভিন দেশ! বিস্ময়কর হলেও সত্য যে পৌঁছার পরপরই তাদের প্রথম গন্তব্য ছিল হাসপাতাল এবং কারো কোরো ক্ষেত্রে ইনকিউবেটর!

পাকিস্তানি সেনাদের ঔরসজাত সন্তানদেরকে বিভিন্ন ক্লিনিকে গর্ভপাত করানো হয়েছিল। জানা যায় যে, দেড় লাখেরও বেশি বীরাঙ্গনা গর্ভপাত করিয়েছিল। নাহলে ওইসব হতভাগা নারীদের বাবা-মারা কীভাবে ঘরে ফিরিয়ে নিবে তাদের আদরের নিষ্পাপ অথচ লজ্জার কন্যাকে! সে যে ধর্ষিতা হয়েছে তাওতো বলার নয়... বলার নয়! কন্যার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা ছাড়া কিইবা উপায় ছিল। সবকিছু সমাপ্ত হয়েছে গোপনে। রাজধানী হওয়ার কারণে, ঢাকাতেই যুদ্ধ শিশুর সংখ্যা বেশি ছিল। সেইসঙ্গে ছিল গর্ভপাতের সংখ্যাও। নিতান্ত বাধ্য হয়েই সরকারকে গর্ভপাতের অনুমতিও দিতে হয়; নাহলে নির্বাসন! অপরিপক্ক শিশুদের জন্য ইনকিউবেটরও ছিল সেবা সংস্থাগুলোর কাছে।

স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়তো যুদ্ধকালীন অযাচিত গর্ভধারণকে আইনের সঠিক বিবেচনাতেই নিয়েছিল। নারীর সত্তা ও মাতৃত্বকে গর্ভপাত এবং দত্তকায়নের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিল রাষ্ট্র। জাতিগত পরিচয় গঠনের প্রেক্ষিতে হয়তো কিছু নারীর একান্ত প্রয়োজনটা ছিল গৌণ। ধর্মীয় সংস্থা, আন্তর্জাতিক দত্তকায়ন সংস্থা এবং ক্লিনিকগুলো রাষ্ট্র গঠনের একটি অবিচ্ছেদ্য স্তর হিসেবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাও কাজ করেছে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়বারের মতো আবার 'শিকার' হয়েছে বীরাঙ্গনারা।

যুদ্ধশিশুরা কি খুবই অসহায়? যুদ্ধশিশু সম্পর্কে পার্ল এস বাক লিখেছেন: "গড়ে নেয়ার জন্য তার একটা নিজস্ব পৃথিবী হবে। প্রকৃতপক্ষে সেটা পূর্ব বা পশ্চিম কোনোটাই হবেনা। এসবের প্রতিটাকেই বর্জন করবে সে। কারণ কোনোটাই তাকে বুঝবে না। তবে আমি মনে করি, যদি তার দুই জন্মদাতারই শক্তি-সামর্থ্য থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে দুই পৃথিবীকেই এবং অতিক্রম করবে সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা।" ইস্ট উইন্ড: ওয়েস্ট উইন্ড (১৯৩০)

নির্মম বাস্তবতা

বীরাঙ্গনা আর পবিত্র শিশুদের নিয়ে রাতের আকাশের নীচে পাইপ খেতে খেতে কী ভাবতেন মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু? কী ভাবতেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ তাজুদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি ওসমানী বা অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়া? অথবা মননশীল মানুষেরা? গ্রহণ-বর্জনের দোলাচলে দোদুল্যমান অন্য সবাই? সংগ্রামে-যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার চেয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ততা সামাল দেয়ার নেতৃত্ব দেয়া অনেক অনেক বেশি কঠিন। ইতিহাস বলে, যুদ্ধে পরাজিত হলে, যুদ্ধ শেষে ভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পরাজিত বাহিনী পেছনে রেখে যায় 'যে কোনো ধরনের চিহ্ন'। অতএব চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন না করে উপায় ছিলনা - পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন জাতির সম্মান রক্ষায় 'পাকিস্তানি অপবিত্র রক্ত' ধুয়েমুছে ফেলাই ছিল সম্ভবত সঠিক। আমি বুঝি, আমার বা আমাদের বায়বীয় আবেগ এখানে মূল্যহীন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দুর্ভাগা নারীদের শক্ত সামাজিক আড়াল দিতে। যুদ্ধশিশুদের একটা নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে। যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার 'বীরাঙ্গনা পর্দার' আড়ালে জাতির দুঃসহ লজ্জা-অপমানকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল স্বাধীন বাঙালির জীবনধারার স্রোতে। অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীরা গেছে নির্বাসনে, তবে নিরাপদ আশ্রয়ে। সেখানেই বঙ্গবন্ধুর সাফল্য। সেজন্যই বঙ্গবন্ধু সরকার চিরকালের জন্য ধন্যবাদার্হ।

শেষ কথা

একাত্তরে 'ধর্ষণ' শব্দের অর্থ বুঝিনি পুরোপুরি। এখন বুঝি এবং উপলব্ধি করি সমগ্র অনুভূতিতে। যদিও বলতেই হয় যে, নারীর এই অপমান অনুভব করতে হলে নারী হয়ে জন্মাতে হবে! আর কত প্রশ্ন আমাদের সামনে? লজ্জায়, বেদনায়, ঘৃণায়, সংকোচে নুইয়ে আসে মাথা। একাত্তরের যুদ্ধ-শিশুরা থাকুক শান্তিতে, এই পৃথিবীতেই। অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে শুধু আকাশছোঁয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী, হাজার হাজার অগ্নিদগ্ধ বাড়ি, নিহত ভাই, ধর্ষিতা বোন আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবন। যাই হোক না কেন, একাত্তরের শয়তান, হায়েনা আর সাপের দলের তীব্র চিৎকার আর হিসহিসানি শব্দের কথা এখন গৌণ। মুখ্য – আগামীর বাংলাদেশ গড়া। তবে সবচেয়ে বড় কথাটা হল – যত দূরেই নির্বাসন দেয়া হোক না কেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ওই যুদ্ধ-শিশুদের জন্যই একদিন হয়ে উঠবে 'একটি জাতির জন্মের' সমার্থক।

[পুনশ্চঃ লিখতে লিখতে বারবার চোখ ভিজে গেছে। এমন ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে, কোনো সভ্যতায়। তথ্যগত ভুল থাকলে, ক্ষমাপ্রার্থী।]

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা :

ব্যক্তিবর্গ: বীণা ডি'কস্টা (অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি), কেভিন জেরার্ড নীল, নয়নিকা মুখোপাধ্যায়,

নিলীমা ইব্রাহিম, সুরাইয়া খান (দেশী জার্নাল), মুস্তাফা চৌধুরী এবং ফতে মোল্লা।

ওয়েবসাইট: জাতিসংঘ, ইউএনডিপি, দৃষ্টিপাত, ফিল্মঅপশন, ম্যাকুমবা ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার অ্যান্ড চিলড্রেন, উইকিপেডিয়া ও মুক্ত-মনা।

সম্পাদক সমীপে

সাজিদ হোসেনের একাত্তরের যুদ্ধ শিশু প্রসঙ্গে

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের ছাত্রী, অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মেয়ে, জীবনের সাধারণ চিন্তার বাইরে অন্য কোন চিন্তা করা হয় না। এই প্রাত্যহিকতার মাঝে মনে নাড়া দেয়ার মতো একটি লেখা পড়লাম গত ১৬.৩.০৭ তারিখে জনকণ্ঠে সাজিদ হোসেনের লেখা 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু'। এ লেখা বিষয়ে আমার মনে যে অনুভূতি সে বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। তা বর্ণনা করা যায় না। সেই এইট/নাইনে পড়বার সময় পত্রিকায় পড়েছি যুদ্ধশিশু 'রায়ানের' কথা। জানতাম '৭১-এর বর্বরতার কথা, কিন্তু মনে ছিল না সাজিদ হোসেনের ভাষায়, 'আমাদের পবিত্র জীবনের অপাঙক্তেয় প্রাণগুলোর'' কথা, ওরা এখন বড় হয়েছে, কত বড়। রায়ানকে দেখে সেদিন বুঝেছিলাম। আজ যখন মনে পড়ল তখন রাষ্ট্রের, সমাজের বড় বড় হর্তাকর্তাদের বিষয়ে কিছু বলব না। এইটুকু বলব, এই যে আমরা, ব্যক্তিগতভাবে কেন বেমালুম ভুলে গেলাম মুক্তিযুদ্ধের কথা, যুদ্ধশিশু বা তাদের মায়েদের কথা। এটা আমার কাছে পরম আশ্চর্য। যাঁরা সে সময় অসহনীয় কষ্ট করেছেন, সাধারণ বাঙালী হিসেবে, তাঁরা কেন জানাননি নিজেদের উত্তর প্রজন্মকে, যে আমাদের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি বুঝি না আমাদের কারও সামান্য ব্যাগ ছিনতাইকারী নিয়ে গেলে সেই ঘটনাও তো আমরা আমাদের সন্তান, নাতি-নাতনির কাছে কয়েকবার করে বর্ণনা করি। তবে '৭১-এর জ্বলজ্বলে গৌরবময় সত্যের কথা কেন বলি না? আজ তাই এ প্রজন্ম শুধু যে জানে না, তা নয়, তারা আজ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলাকে আঁতলামী বলে, হাসাহাসি করে। রাজাকার, জামাতীদের বিচার চাওয়া আজ বাড়াবাড়ি। একটা প্রশ্ন, যুদ্ধশিশুদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন? আন্তর্জাতিকভাবে এরকম কোন আইনকি করা যায় না যে, যে কোন দেশের যুদ্ধের ফলাফল যে পবিত্র যুদ্ধশিশু তাদের রক্ত, জন্মসূত্র কিছুই বিবেচ্য হবে না, তারা অবলীলায় সে দেশের নাগরিক হবে, যীশুকে যেমনই উপহার দিয়েছিলেন ঈশ্বর। আমরা ভেবে নেব সৃষ্টিকর্তা আমাদের জাতিকে এই পবিত্র শিশুদের উপহার দিয়েছেন। আমরা আধুনিক হচ্ছি কেন? এইটুকু করতে পারব না? যুদ্ধ শিশুদের প্রতি আর তাদের মায়েদের প্রতি হাজার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রইল। সাজিদ হোসেনকে ধন্যবাদ। শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ রইল লেখা চালিয়ে যাবার।

ফাহমিদা

শামছুন নাহার হল, ঢা.বি.।

একজন মুক্তিযোদ্ধার আবেদন

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। বয়স নব্বইয়ের ওপর। ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে সেনাবাহিনী থেকে সম্মানিত ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় অবসর নেই। বর্তমানে অবসর ভাতা (মেডিক্যাল ভাতা-৫০০/-সহ) সর্বসাকল্যে ২১২২ দশমিক ৭১ টাকা পাচ্ছি। ২৫ শতাংশ বর্ধিত ভাতায় গত পে-স্কেল আমার মতো বয়স্ক পেনশনারদের জন্য কাগজের ফাঁকি মাত্র। এসব ভাতাদি দিয়ে কোনভাবেই বর্তমান বাজারের সঙ্গে

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

দৈনিক জনকণ্ঠে

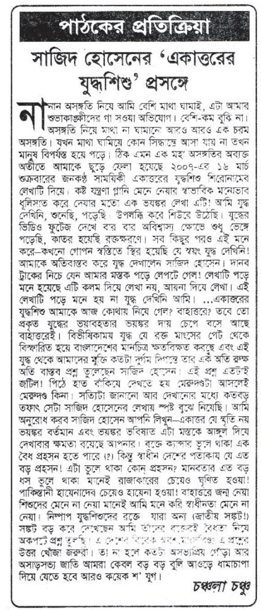

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

সাজিদ হোসেনের 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' প্রসঙ্গে

নানান অসঙ্গতি নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাই, এটা আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের গা সওয়া অভিযোগ। বেশি-কম বুঝি না। অসঙ্গতি নিয়ে মাথা না ঘামানো আরও আরও এক চরম অসঙ্গতি। যখন মাথা ঘামিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না তখন মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক এমন এক মহা অসঙ্গতির অব্যক্ত অতীতে আমাকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে ২০০৭-এর ১৬ মার্চ শুক্রবারের জনকণ্ঠ সাময়িকী একাত্তরের যুদ্ধশিশু শিরোনামের লেখাটি দিয়ে। কষ্ট যন্ত্রণা গ্লানি মেনে নেয়ার স্বাভাবিক মনোভাব ধূলিসাত করে দেবার মতো এক ভয়ঙ্কর লেখা এটি! আমি যুদ্ধ দেখিনি, শুনেছি, পড়েছি। উপলব্ধি করে শিউরে উঠেছি। যুদ্ধের ভিডিও ফুটেজ দেখে বার বার অবিশ্বাস্য ক্ষোভে শুধু ভেঙ্গে পড়েছি, কাতর হয়েছি রক্তক্ষরণে। সব কিছুর পরও এই মনে করে—কখনো গোপন স্বস্তিতে স্থির হয়েছি যে স্বয়ং যুদ্ধ দেখিনি! আমাকে অতিবাস্তব করে যুদ্ধ দেখালেন সাজিদ হোসেন। দানব ট্রাকের নিচে যেন আমার মস্তক পড়ে লেপটে গেল! লেখাটি পড়ে মনে হয়েছে এটি কলম দিয়ে লেখা নয়, আয়না দিয়ে লেখা। এই লেখাটি পড়ে মনে হয় না যুদ্ধ দেখিনি আমি। ...একাত্তরের যুদ্ধশিশু আমাকে আজ কোথায় নিয়ে গেল? বাহাত্তরে? তবে তো প্রকৃত যুদ্ধের ভয়াবহতার ভয়ঙ্কর দায় চেপে বসে আছে বাহাত্তরেই। বিভীষিকাময় যুদ্ধ যে রক্ত মাংসের পেট থেকে বিস্ফারিত হয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ক্ষতবিক্ষত করছে এবং এই যুদ্ধ থেকে আমাদের মুক্তি কতটা দুর্গম দিগন্তে তার এক অতি রুক্ষ অতি বাস্তব প্রশ্ন তুলেছেন সাজিদ হোসেন। এই প্রশ্ন এতটাই জটিল! পিঠে হাত বাঁকিয়ে দেখতে হয় মেরুদণ্ডটা আসলেই মেরুদণ্ড কিনা। সত্যিটা জানানো আর দেখানোর মধ্যে কতবড় তফাৎ সেটা সাজিদ হোসেনের লেখায় স্পষ্ট বুঝে নিয়েছি। আমি অনুরোধ করব সাজিদ হোসেন আপনি লিখুন—একাত্তর যে স্মৃতি নয় ভয়ঙ্কর বর্তমান এবং ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত এটা মস্তকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার ক্ষমতা রয়েছে আপনার। রক্তে ক্যান্সার ভুলে থাকা এক বৈধ প্রহসন হতে পারে (?) কিন্তু স্বাধীন দেশের পতাকায় যে এত বড় প্রহসন! এটা ভুলে থাকা কোন্ প্রহসন? মানবতার এত বড় ধস ভুলে থাকা মানেই রাজাকারের চেয়েও ঘৃণিত হওয়া! পাকিস্তানী হায়েনাদের চেয়েও হায়েনা হওয়া! বাহাত্তরে জন্ম নেয়া শিশুদের মেনে না নেয়া মানেই আমি মনে করি স্বাধীনতা মেনে না নেয়া। নিষ্পাপ যুদ্ধশিশুদের রক্তে যারা অন্য (জাতীয় সঙ্কট!) সঙ্কট বড় করে দেখছেন আমি তাঁদের রক্তেরই বৈধতা নিয়ে অকপটে প্রশ্ন তুলছি। এ দেশের বিবেক [illegible] এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী। তা না হলে কতটা অসভ্যপ্রিয় গোঁড়া আর অসাড়সভ্য জাতি আমরা কেবল বড় বড় বুলি আওড়ে ধামাচাপা দিয়ে যেতে হবে আরও কয়েক শ' যুগ।

চঞ্চলা চঞ্চু

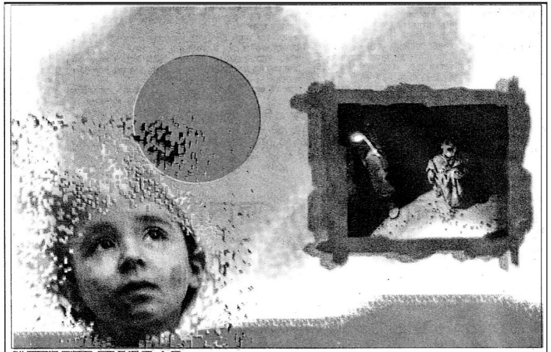

একাত্তরের যুদ্ধ শিশু

সুমিমা ইয়াসমিন

শুধু আবেগের অশ্রুজলে ভেসে যাওয়া নয়, এ এক অন্যরকম অনুভূতি বয়ে গেল আমার সমস্ত উপলব্ধি জুড়ে! পড়ছিলাম একাত্তরের যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে অসাধারণ একটি লেখা। প্রতিদিনের মতই অফিসে কাজের ফাঁকে দৈনিক পত্রিকার ফাইলগুলোয় চোখ বুলাচ্ছিলাম। গত ১৬ মার্চ দৈনিক জনকণ্ঠে সাজিদ হোসেনের 'একাত্তরের যুদ্ধ শিশু' লেখাটায় চোখ আটকে গেল। পুরো লেখাটা না পড়ে পত্রিকা হাত থেকে রাখতে পারিনি। লেখাটা পড়ে অশ্রু সংবরণ করা সত্যিই কঠিন! যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে এতো আবেগপূর্ণ ও তথ্যবহুল লেখা এর আগে আমার চোখে পড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের ৩৬ বছর পর যুদ্ধ শিশুদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। কারণ সেই সময়ে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধ শিশুদের জন্মের অনেক তথ্য পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল সামাজিক সম্মানের দোহাই দিয়ে। তথ্যগুলো পুড়িয়ে কি তাদের জীবনে সম্মান এনে দিতে পেরেছিল কেউ? পারেনি। তাহলে কেন এভাবে একটি জাতির জন্ম ইতিহাসের তথ্যগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করা হলো? জানি, এ প্রশ্নের কোনো জবাব মিলবে না কোথাও। এ প্রজন্ম জানতে পারবে না ২৫ হাজার যুদ্ধ শিশুর বিষাদময় জন্মকথা! প্রচলিত তথ্যমতে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় দুই লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছিল। এই সংখ্যা দ্বিগুণও হতে পারে। স্বাধীনতার পর প্রায় দেড় লাখ বীরাঙ্গনা গর্ভপাত করেছিল। এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ২৫ হাজার শিশু। এইসব শিশুদের মায়েরা নির্যাতিত হয়েছিল পাকিস্তানী ও এদেশীয় রাজাকার আলবদর বাহিনী দ্বারা। একজন বীরাঙ্গনা এবং যুদ্ধশিশুর মর্মবেদনার এতোটুকুও কী অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব? সামাজিকভাবেও তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হোক, পঙ্গু হোক স্বাধীন দেশে মর্যাদা পেয়েছে। একজন বীরাঙ্গনা ও তার শিশু কী মর্যাদা পেয়েছে এদেশে। ওইসব শিশুদের জন্মটা আকাঙ্ক্ষিত ছিল না বলে জন্মের পর পরই তাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দত্তক দিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানী রক্তধারী ওইসব শিশুকে স্বাধীন বাংলাদেশে রাখা যাবে না! কিন্তু শিশুটির মা যে নারী, তার কী কোনো অধিকার থাকতে পারে না সন্তানটির প্রতি! সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশু সন্তানটিকে দূরে ঠেলে দিতে গিয়ে সেইসব মায়েদের হৃদয়ে যে ঝড় উঠেছিল, কে তার খবর নিয়েছে? সেই শিশুরা কি কখনো গাইতে পেরেছে- জন্ম আমার ধন্য হল মাগো/ এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো ...।

কারণ তাদের জন্ম ধন্য হয় না। মা তাদের আকুল হয়ে ডাকতে পারেন না। মা জানেন পাকিস্তানী সেনাদের যৌন সন্ত্রাসের সৃষ্টি এই শিশুর কোনো-ভবিষ্যৎ নেই এ দেশে। তাই ওরা দূরে গিয়ে বাঁচুক। একজন বীরাঙ্গনা একজন নিষ্পাপ নারী ও তার গর্ভজাত নিষ্পাপ শিশু জীবনভর দুঃখ বয়ে বেড়ায়, আমরা তার খবর রাখি না। যুদ্ধ তাদের সব সুখ কেড়ে নেয়। এ যে জীবন বিসর্জনের চেয়েও বড় বিসর্জন, এ কথা কেউ বলে না! স্বাধীনতার পর বিভিন্ন নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে যেসব বীরাঙ্গনা নারী অবস্থান করছিল, তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অনেকের পরিবার। এসব কেন্দ্রে জন্ম নেয়া সদ্যজাত শিশুদের দায়িত্ব নিতে পারেনি এদেশ। অথচ এই দেশটি স্বাধীন হবার পেছনে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুর দুঃখভোগের কথা আমরা কী করে অস্বীকার করি! সারাজীবনই যে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধ শিশুকে বুকের ভিতর দুঃখের পাহাড় পুষে জীবন কাটাতে হবে। পাবনার নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে যেসব শিশুদের অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হয়েছিল তাদের একজন বড় হয়ে আত্মহত্যা করেছিল, নিজের ভয়াবহ জন্ম অতীতকে সহ্য করতে না পেরে। দু'জনের মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। যারা সুস্থভাবে বেঁচে রইল তাদের সারাটা জীবন শুধু অসহনীয় দুঃখ বয়ে বেড়ানো।

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক দত্তকায়ন সংস্থার মাধ্যমে যুদ্ধ শিশুদের পাঠিয়ে দেয়া হয়। যুদ্ধ শিশু সম্পর্কে এরকম অনেক তথ্য সাজিদ হোসেন জড়ো করেছেন তাঁর লেখাটিতে। ধন্যবাদ লেখককে। লেখাটি পড়ে বোঝা যায়, অনেক পরিশ্রম করে তাঁকে এসব তথ্য জোগাড় করতে হয়েছে। হয়তো যতগুলো তথ্য জোগাড় করেছেন, সবগুলো এখানে বিবৃত করা হয়নি। লেখকের প্রতি আমার প্রত্যাশা থাকবে তিনি তাঁর শ্রম ও মেধা দিয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করে সবমিলিয়ে যেন একটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি ইতিহাসের অন্যতম দলিল হয়ে উঠতে পারে। যুদ্ধ শিশুদের অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসে অবশ্যই যুদ্ধ শিশুদের স্থান থাকতে হবে। যুদ্ধ শিশুরা বেঁচে আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কেউ কেউ আছে দেশের ভেতরেই, পর্দার আড়ালে, নিজের জন্ম পরিচয় ভুলে থাকার মিথ্যে চেষ্টায়।

সাজিদ হোসেনের ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং আবেগপূর্ণ উপস্থাপনায় 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' লেখাটি হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। লেখক নিজেই একাত্তরে ছিলেন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সেই সময়ের আবেগটা তাঁর এখনো অক্ষয়। 'একাত্তরের যুদ্ধ শিশু' লেখাটির শুরুর কিছু অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না।

"নির্বাসনে গেছে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতোই! সব ক'টা জানালা খুলে দিলে, সব ক'টা দরজা খুলে দিলে, সব ক'টা আঙিনা খুলে দিলে, সব ক'টা সীমানা খুলে দিলেও ওরা আর আসবে না, কোনদিনও আসবে না! আমরাই ওদেরকে পাঠিয়েছি দূর নির্বাসনে, প্রথম সুযোগে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর মুখবোজা কান্নার বিপরীতে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে উষ্ণ লাভার মতো তাদের অভিমানী উৎসারণ। একটি জাতির জন্মের জ্বলজ্বলে প্রতিচিত্রে সুন্দর সৃষ্টির বিপরীতে অবাঞ্ছিত উপস্থিতি। জন্মে যারা কাঁদতে পারেনি, কান্না শুনে হাসতে পারেনি 'পাড়া-পড়শী', উচ্চারিত হয়নি 'মা', কোল অন্ধকার করে এসেছিল ওই শিশু জাদুকরেরা, 'চুপিচুপি'। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়ের পথে, মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে, মহত্তম অর্জনের পথে হঠাৎ যেন কোনো যতি, ছেদ, ব্যত্যয়। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তে ভেজা ফুলের বাগানে পুষ্পিত ছিল না ওরা।"

দৈনিক আজাদী [চট্টগ্রাম]

৩. বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু

দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় বসবাস করছেন মুস্তাফা চৌধুরী। প্রবাস জীবনে কাজের পাশাপাশি তার কলম ব্যস্ত হয়ে থাকে দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সবকিছুতেই তার উৎসাহ উল্লেখজনক। যুদ্ধশিশু নিয়ে তার রচনার বেশিরভাগ গবেষণাকর্মই ইংরেজি ভাষায় রচিত। সেখান থেকে দুটি নিবন্ধের ভাবানুবাদ এখানে আবারো প্রকাশ করা হল। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছে বইমেলা ডট কম ওয়েবসাইটে এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছে অনলাইন পত্রিকা দি এডিটরে এবং এরপরে আবারো দৈনিক জনকণ্ঠে [৫ ডিসেম্বর ২০০৭]। তার এই তথ্যভিত্তিক নিবন্ধ দুটোতে ফুটে উঠেছে, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিশেষত বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা সহায়তা এবং যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের নানাদিক।

প্রথম নিবন্ধ

এখানে যুদ্ধশিশু বলতে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের সহযোগী কর্তৃক ধর্ষিত বাঙালি মেয়েদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদেরকেই বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে অভিহিত করা হয় অবাঞ্ছিত শিশু, শত্রু শিশু, অবৈধ শিশু, এবং আরো অবজ্ঞাভরে জারজ শিশু বলে। তাদের মায়েদেরকে বলা হয় অপবিত্র নারী, কলঙ্কিত নারী, দুর্দশাগ্রস্ত নারী, ধর্ষণ শিকার, সামরিক আগ্রাসনের শিকার, ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং দুর্ভাগা নারী। অনেক অন্তঃসত্ত্বা নারীই তখন ভারতে চলে যায় হয় গর্ভপাত করানোর জন্য নাহয় প্রসবের জন্য। অনেক শিশুর জন্ম হয় দেশেই। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই দুর্ভাগা শ্রেণির মানুষদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। অবস্থার প্রেক্ষিতেই আমাদেরকে সংখ্যা এবং সেসব যুদ্ধশিশুর

ভাগ্য সম্পর্কে অনুমান এবং ধারণার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিছু সীমিত প্রমাণ পাওয়া যায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশী মিশন ও মিশনারি সংস্থার দলিলে।

একটি ইটালীয় চিকিৎসা জরিপে ধর্ষিতার সংখ্যা ৪০,০০০। লন্ডন ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড্ প্যারেন্টহুড ফেডারেশন [আইপিপিএফ] নিরূপণ করেছিল ২,০০,০০০। যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একজন সমাজ-কর্মী ড. জিওফ্রে ডেভিস দাবি করেছিলেন যে এই সংখ্যা আরো বেশি। কতজন ধর্ষিত নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল এবং বাচ্চা প্রসব করেছিল তা অনির্দিষ্ট। সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ৩,০০,০০০। তবে এই সংখ্যা নিরূপণের পন্থাটি খুব বেশি সরল ছিল না। ড. ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল তার ধারণা, কোনো গবেষণালব্ধ উপাত্ত নয়।

সেসময়ের সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বিচারপতি কে এম সোবহান [চেয়ারপারসন, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র], সিস্টার মার্গারেট মেরি [সুপেরিয়র, মিশনারিজ অব চ্যারিটি], ড. জেফরি ডেভিস, আইপিপিএফ ব্যক্তিবর্গ যেমন ওডার্ট ভন শুলজ প্রমুখ প্রকাশ করেছিলেন যে তেইশ হাজার গর্ভপাত করা হয়েছিল ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে। সেসব ক্লিনিকের পরিচালনায় ছিল বৃটিশ, মার্কিন এবং অস্ট্রেলীয় চিকিৎসকগণ। সহযোগিতায় ছিল বাঙালি চিকিৎসকগণ। গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এটাই ছিল ১৯৭২ সালের গোড়াতে পাওয়া গর্ভপাত সম্পর্কিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য। সেসময়েই ঢাকায় বিদেশি চিকিৎসকেরা স্থাপন করে বেশ কয়েকটা গর্ভপাত/প্রসব কেন্দ্র যা সেবা সদন নামে পরিচিতি পায়।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বাইশটি সেবা সদনে তিনশ থেকে চারশ শিশুর জন্ম হয়েছিল। কানাডীয় ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সেসময়ে অধিকৃত এবং মুক্ত বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে এসে আলোচনা করেছিলেন লীগ অব রেড ক্রস সোসাইটি এবং ইউনিসেফ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। পরে অটোয়ায় ফিরে গিয়ে সদর দপ্তরে অবহিত করেন যে যুদ্ধশিশুর নিরূপিত সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। পুরোপুরি সঠিক সংখ্যা পাওয়া যখন ছিল দুরূহ, তখন সম্ভবত সংখ্যাটির ভয়াবহভাবে বেশি ছিল এরকম ধারণা করাই নিরাপদ। ১৯৭২ সালে জন্মানো যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রণিধানকৃত সংখ্যা হিসেবে 'দশ হাজার'-ই সর্বোচ্চ।

সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগ : সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি উদ্যোগটি ছিল ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির প্রশিক্ষণ,

গবেষণা, মূল্যায়ন ও যোগাযোগ [TREC] অধিদপ্তর, নারী পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় সংস্থা, সমাজ কল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডের ছিল দুটি লক্ষ: [১] তিন থেকে চার মাস ব্যাপী সীমিত সময়ে ধর্ষিতাদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সব স্থানে ক্লিনিক্যাল সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। [২] হাজার হাজার অসহায় নারীকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রদান করে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত ভকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিকল্পনা, গঠন এবং প্রতিষ্ঠা করা। অসহায় নারী মাত্রেই অপবিত্র নারী ছিল না, বরং ছিল যুদ্ধে-ক্ষতিগ্রস্ত নারী। এই শ্রেণির নারীদের মধ্যে, পাকিস্তানি সেনার আক্রমণে, কেউ হারিয়েছিল স্বামীকে, কেউ বাবা বা সংসারে উপার্জনক্ষম কাউকে অথবা হারিয়েছিল সম্পদ।

এসব অসহায় নারীদেরকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে, সরকার, তাদের আত্মসম্মান বাড়ানোতে নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করেছিল। মহৎ অবদানকারী হিসেবে জাতির সামনে তাদের সুষ্ঠু ও সম্মানিত অবস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। অমহিমান্বিত বীর নারীদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সরকার ঘোষণা করে যে মুক্তিযুদ্ধে তাদের [পরোক্ষ] দুঃসাহসী ভূমিকা জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এসব নারীদের মাঝে ইতিবাচক আওয়াজ অনুসন্ধান এবং জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে; অপমান এবং অত্যাচারের প্রতীক নয়, বরং সম্মান ও সাহসের প্রতীক রূপে। এভাবে সম্মান প্রদর্শন করে, বিশ্বাস করা হয় যে তাদেরকে যা কিছু নির্মল, সাহসিক এবং মহৎ তারই প্রতীক হিসেবে। আরোও বিশ্বাস করা হয় যে ত্যাগের বিপরীতে ওই স্বীকৃতির ফলে সেসব বীরাঙ্গনাদের সমাজে গ্রহণ করা হবে বিষাদময় তবে বিজয়ীরূপে। একইসঙ্গে সরকার, পরিত্যক্ত যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে নীতি প্রণয়ন করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে থাকে।

যুদ্ধশিশুদের আন্তঃদেশীয় দত্তকায়ন : রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অনুরোধে, জেনেভা-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের [আইএসএস] মার্কিন শাখাই ছিল প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা যা যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানে এগিয়ে আসে। ঢাকা-ভিত্তিক বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনা সমিতি নামের দুটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওই পরামর্শ ও বাস্তবায়নকালের পুরোটা সময়ে কাজ করে আইএসএসের সঙ্গে।

যুদ্ধশিশুদের দত্তকায়নে কানাডীয় উদ্যোগ : বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের দত্তকায়নে আগ্রহ প্রকাশকারী দেশসমূহের মধ্যে কানাডার অবস্থান একেবারে প্রথম সারিতে। মাদার তেরেসা এবং তার সেবা সদনের সহকর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুটি কানাডীয় সংস্থা দত্তকায়নে সংশ্লিষ্ট ছিল। কানাডীয় সংস্থা দুটোর একটি ছিল মন্ট্রিল-ভিত্তিক ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন [আন্তঃদেশীয় দত্তকায়নে নিয়োজিত একটি অলাভজনক সংস্থা] এবং অন্যটি ছিল টরন্টো-ভিত্তিক কুয়ান-ইন ফাউন্ডেশন [বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের সাহায্যদাতা সংস্থা]। অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও ছিল একাধিক সংস্থা; যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক হল্ট অ্যাডোপশন প্রোগ্রাম ইনকর্পোরেটেড এবং টেরে ডেস হোমস।

বিদেশী নাগরিক কর্তৃক যুদ্ধশিশুদের দত্তকায়নের পথ সুগম করতে সরকার জারি করেন, বাংলাদেশ অ্যাবাডান্ড চিলড্রেন [স্পেশাল প্রভিশন] অর্ডার ১৯৭২ শীর্ষক রাষ্ট্রপতির আদেশ। ১৯শে জুলাই যখন ১৫টি যুদ্ধশিশুর প্রথম দলটি কানাডায় পৌঁছে, কয়েকদিন ধরে সেটা থাকে প্রচার মাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রচার বার্তাসমূহের মূলকথাটি ছিল যে ইন্টার-রেসিয়াল অ্যাডোপশন প্রোগ্রাম একটি ইতিবাচক উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির কানাডীয়দের এরকম উদ্যোগকে স্বাগত জানানোই শ্রেয়।

যুদ্ধশিশু প্রশ্নের সমাপ্তি : যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটা বিতর্কিত দিকও ছিল। পশ্চিমা দত্তকায়ন সংস্থাসমূহ যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে; কিন্তু জন্মদাত্রী মায়েদের বিষয়ে নয়। বেশিরভাগ যুদ্ধশিশুই ছিল মুসলিম নারীর গর্ভজাত এবং তাদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবে দত্তকায়িত দেশে লালন-পালন করা হয়েছে। দত্তকায়নের এই প্রেক্ষিতটির কারণে বাংলাদেশে আন্তঃদেশীয় দত্তকায়নের প্রতি একটি স্থবির মনোভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল। যুদ্ধশিশুদেরকে বিদেশে দত্তক হিসেবে প্রেরণ করা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালি হিসেবে লালন-পালন করার মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ সালে সমাপ্তি আসে যুদ্ধশিশুদের প্রশ্নে।

দ্বিতীয় নিবন্ধ

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ইতিহাস কমবেশি সবার জানা। তখনকার বাঙালি মাত্রই তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফের গ্রামেগঞ্জে ও শহরে পাকসেনা কর্তৃক অগণিত নারী হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদর্শী।

বিগত বছরগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ওপরে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। তাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে শুরু করে বাঙালির কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন ও বিজয় উল্লাসের কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যায়না যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও সেসময়ের নারী ধর্ষণ নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। আমার জানামতে এ পর্যন্ত দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে নারী নির্যাতনের ওপরে: আশরাফুজ্জামানের 'বাংলার নারী নির্যাতনের ইতিহাস' ও আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'নারী নির্যাতন কাহিনী'।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নারী ধর্ষণের ইতিহাসও এসে যায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যুদ্ধশিশু নিয়ে গবেষণা এখনও অনেক জটিল এবং কাজটিতে রয়েছে অনেক বাধা। তাছাড়া বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। অনেকেরই আলোচ্য বিষয়ে আহত/ক্ষুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভুলে গেলে চলবেনা যে, বাংলাদেশের ধর্ষিত নারী আপনার আমার মা, বোন বা সহধর্মিণী। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একাত্তরের যুদ্ধশিশু '৭২ সালে জন্ম নিয়ে এখন ৩৬ বছরে পদার্পণ করলেও তাদেরকে নিয়ে কোনো আলোচনা বা বিশদ গবেষণা হয়নি। আজ তাদের অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে।

আমার মতে, '৭১-এর যুদ্ধশিশুদের সত্যতা যাচাই করা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে ইতিহাসবিদ বলে দাবি করি না। তবে কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করার সময় থেকেই যুদ্ধশিশুর সত্যাসত্য নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গবেষণা করেছি।

এ লেখার মূল নথিপত্র হলো কানাডীয় অভিভাবক উলসি দম্পতির পক্ষ থেকে কানাডীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চিঠিপত্র। তখনকার কানাডীয় এমপ্লয়মেন্ট ও ইমিগ্রেশন বিভাগের দলিলপত্র ঢাকার অনাথ আশ্রম শিশু ভবনের নথি, যেখানে অবাঞ্ছিত শিশুদের মাদার তেরেসা তালিকাভুক্ত করেছিলেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী মো. শরাফতউল্লাহ স্বাক্ষরিত দলিল (যে দলিলে ১৫টি যুদ্ধশিশুর নাম, বয়স, লিঙ্গ-চিহ্ন ও কানাডীয় অভিভাবকদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে)। এ দলিলটি কানাডীয় এমপ্লয়মেন্ট ও ইমিগ্রেশন বিভাগেও প্রেরণ করা হয় ১৭ জুলাই ১৯৭২ সালে। উলসি দম্পতি সযত্নে এসব দলিলপত্র সংগ্রহ করে রেখেছেন তাঁদের পারিবারিক আর্কাইভে। এগুলো প্রামাণিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ লেখার দ্বিতীয় উৎস হল যুদ্ধশিশু আমেনার নিজস্ব বিবৃতি। তার মৌখিক বিবৃতিটি আপাত পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ও আশ্রমের দলিলপত্র, কানাডীয় ইমিগ্রেশন বিভাগ ও অন্টারিও প্রাদেশিক সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের নথিপত্র মিলিয়ে পরীক্ষা করলেই এসব তথ্য সত্যায়ন করা যাবে। ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার খাতিরে যে দুটো জিনিসের স্বাতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা উচিত, সেগুলো হল প্রকৃত ঘটনা এবং নিজস্ব অভিমত। গবেষণা যত তথ্যমূলক হবে বস্তুনিষ্ঠতা তত কম গবেষণার বিষয়বস্তুকে বিঘ্নিত করবে এবং সেই সঙ্গে অশুদ্ধ/অতিরঞ্জিত ঐতিহাসিক বিবরণ নিবেদন থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে।

এ লেখার বিষয়বস্তু যাকে নিয়ে, তার নাম আমিনা লিন উলসি। আমিনার জন্মস্থান ও তারিখ: ঢাকা, ৩ এপ্রিল ১৯৭২। আমিনারা ৩ বোন ও ৩ ভাই। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই উলসি দম্পতি দত্তক হিসেবে কোলে তুলে নিয়েছেন। আমিনাই তাদের প্রথম সন্তান। ২য় সন্তান জুলিয়াকে এনেছেন কোরিয়া থেকে। ৩য় সন্তান থাইলোকে এনেছেন ভিয়েতনাম থেকে। ৪র্থ সন্তান (মিশ্রবর্ণের শেতাঙ্গ/কৃষ্ণাঙ্গ) ডারিয়েককে লন্ডন থেকে। ৫ম সন্তান জোনাথনকে এনেছেন এল স্যালভাদর থেকে। ৬ষ্ঠ সন্তান শারিনকে ভারত থেকে। সবাই বড় হয়েছে অন্টারিও প্রদেশের কমোকা শহরে। তাদের কথাবার্তা চালচলন স্থানীয় কানাডীয়দের মতো। আমিনা লন্ডন শহরের ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কিংস কলেজ থেকে ইতিহাসে সম্মান ডিগ্রি নেয় ১৯৯৬ সালে। তারপর ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজ থেকে শিক্ষকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে টরন্টো শহরের একটি পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করছে।

সাপ্তাহিক দেশ-বিদেশের সম্পাদক নজরুল ইসলাম মিন্টু ও আমি গিয়েছিলাম আমিনা লিন উলসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার নিতে। টরন্টো শহরের একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকে সে। নির্ধারিত দিনে আমরা তার অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হই। নীচে নেমে এসে কথা শুরু করতেই তার প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়নের পরিচয় পেলাম। প্রথমেই বলল তার স্কুলের কনসার্টের মহড়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তবু আমাদের কথা দিয়েছে বলে বাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নিমিষেই হাই-হ্যালো বলে আপন করে ফেলল। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্ট। আসবাবপত্রে বেশ প্রাচীনতার ছাপ। সব মিলিয়ে মার্জিত রুচির পরিচয় পেলাম।

আমিনা বলল যে তার ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি জানে। শুধু তার জন্মের ইতিহাস নয়, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাদের বীভৎস নারী ধর্ষণের

ইতিহাসও শুনেছে। কবে, কখনবা কোথায়/কীভাবে এসব শুনেছে বলতে পারে না। তবে অকপটে বলে গেল সে সব সময়ে জানত তার কানাডীয় বাবা-মা তার জন্মদাতা বাবা-মা নয়। আমিনার স্পষ্ট মনে আছে তার মা ডেনা উলসি খুব সহজভাবে তাদের জন্মদাতা বাবা-মায়ের গল্প করতেন। তাদেরকে দত্তক গ্রহণের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা ও তাদেরকে লালন পালনের দৃঢ় সংকল্পের কথা বলতেন। সেজন্য আমিনা নিজেও কখনও উপলব্ধি করতে পারেনি যে, সে ভিন্ন বা তার জন্মদাতা বাবা-মা উলসি দম্পতি নয়। সে যখন বড় হতে লাগল আস্তে আস্তে অনেক প্রশ্ন তার মনে জাগতে লাগল। কিন্তু কখনও কোনো মানসিক যন্ত্রণা কোনো রকম সংকটের সম্মুখীন হয়নি।

ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যে ফটো দেখাল তাতে তার দাদিমা তাকে কোলে নিয়ে আছে। অনেক ফটো তার কোরিয়ান বোন জুলিয়ার সঙ্গে। তারপর অন্যান্য ভাইবোন মম-ড্যাডের সঙ্গে। গভীর আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলো দেখলাম।

বলল, তার গ্র্যান্ডমাম তাদের ম্যাকডোনাল্ডসে নিয়ে যেতেন। অনেকে তার গ্র্যান্ডমার সঙ্গে কথা বলত। তিনি গর্ব করে বলতেন তাদেরকে দত্তক গ্রহণের কথা। ফটো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা গরমিল আছে। বর্ণের দিক থেকে প্রতিটি ভাইবোন ভিন্ন, আত্মীয়-স্বজন শ্বেতাঙ্গ, কেমন একটা অসমঞ্জস। আমিনা আরও বলল, তার বাবা-মা ধর্মপরায়ণ খ্রিষ্টান। তার বয়স যখন চার মাস তখন তার বাবা-মা কমোকার একটি স্থানীয় গির্জায় নিয়ে যান সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্য। সেখানে তার কাছে আমিনার জন্য সুখ প্রার্থনা করা হয়। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডোনা উলসি বলেন, Our litle Amina was blesed that day... । তারপরে আট বছর বয়সে ১৯৮০ সালে লন্ডন অন্টারিওর একটি চার্চে আমিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

সেদিন উলসি পরিবারের নিকট আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিল। তারপর থেকে বাবা-মার সঙ্গে আমিনা নিয়মিত গির্জায় যাওয়া-আসা শুরু করে। টরন্টোতে এসে নানা ব্যস্ততার সম্মুখীন হওয়ায় সে নিয়মিত গির্জায় যেতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করল। ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমিনা বলল কমোকা শহরে কোনো বাংলাদেশি ছিল না। ছিল না বলে সে বাংলাদেশি কারও সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়নি। কমোকায় কোনও বাংলাদেশি না থাকায় তার মা নিকটতম বড় শহর লন্ডনে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর ফরেন স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সে সূত্র ধরে ফারুখ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝিতে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি

বিভাগের ছাত্র। ফারুখ দম্পতির সঙ্গে উলসি পরিবারের বেশ গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমিনাকে বাংলাদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই তার বাবা-মা ফারুখ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে আমিনা বলল এখনও তাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব অটুট আছে।

বাংলাদেশে ক'বার গিয়েছে, প্রশ্ন করতেই আক্ষেপ করে বলল মাত্র ১ বার, ১৯৮৮ সালে। ১৬ বছর বয়সে। কানাডীয় ফ্যামিলি ফর চিলড্রেন নামের যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কানাডা নিয়ে এসে এর উদ্যোগে যুদ্ধশিশুদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২টি অনাথ আশ্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। যেখানে এসব যুদ্ধশিশুকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশিদের সঙ্গে। আমিনা বলল সে সময়ে তার মা সঙ্গে ছিল। মাদার তেরেসার আশ্রম থেকে আমিনা বেরিয়ে এসে কানাডীয় নাগরিক হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিত হয়ে এক নতুন সার্থক জীবন শুরু করে, সেই অনাথ আশ্রমেই তার সমবয়সী অনেক অনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আমিনা বলল তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর সে নিজেও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল অনেকবার।

আমিনা তার ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যক্ত করল তার ব্যক্তিগত অভিমতঃ নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক স্বাধিকার ছাড়া দেশ ও জাতির কল্যাণ কখনও সম্ভব নয়। সে ব্রত নিয়েছে মাদার তেরেসার আশ্রমে ২ বছর সময় দেবে। শুধু আত্মতুষ্টির জন্য নয়, বাংলাদেশের সরলা ও অবলা নারী ও শিশুদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব আত্মনিয়োগ করবে। তার স্বজন বলতে শ্বেতাঙ্গ কানাডীয় আত্মীয়স্বজনদের কথাই বলছিল বারবার। বর্ণের দিক দিয়ে দৃশ্যমান সংখ্যালঘু হলেও কানাডীয় ইংরেজী উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির মধ্যে প্রতিবারই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে। আমি যতবারই তাকে ভাবতে চেয়েছি ততবারই তার সঙ্গে আমিনার ভিন্নতা অনুভব করি।

মনে রাখতে হবে আমিনা ধর্মের দিক থেকে খ্রিষ্টান। বর্ণের দিক দিয়ে প্রতীয়মান সংখ্যালঘু। ভাষাগতভাবে ইংরেজি এবং সংস্কৃতিতে কানাডীয় মূলস্রোতের অনুসারী। তারপরে তার মা বংশে স্কটল্যান্ডীয় ও বাবা বংশে ইংরেজ। ভাইবোনদের জন্মস্থান ও বংশ পরিচয় বহুজাতিক হলেও তারা প্রত্যেকেই কানাডীয় মূলস্রোতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশেই লালিত পালিত। সে বলল, কানাডাই তার দেশ। সে কানাডীয় সত্তার সঙ্গেই একাত্মতা বোধ করে।

আমিনার জন্মদাতা মা কি আজো বেঁচে আছে? না কি সম্ভ্রম হারানোর ব্যথায় স্মৃতিভ্রংশা নাকি আত্মহত্যা করে জীবনের ইতি টেনেছে? যদি তাই হয়, কেউ কি তার শব শনাক্ত করেছিল? আমিনার জন্মদাতা পিতা কি কি আজো বেঁচে আছে? আমিনার পরিচয় কী? আমিনা কি বাংলাদেশি না পাকিস্তানি? যার জন্মদাতা লাম্পট্য ও বিকার মানসিকতার মূর্তমান প্রতীক, তার অন্তর্জ্বালা আমরা কি উপলব্ধি করতে পারব? এ সব প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। যখনই নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করা হবে তখনই আমিনা বা অন্যান্য যুদ্ধশিশুর অনুভূতিকে পীড়া দেয়া হবে।

৪. বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু ‘অস্ট্রেলীয় গীতা’!

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামাত-রাজাকারদের যৌন-নির্যাতনে সম্ভ্রম হারিয়েছে আড়াই থেকে চার লক্ষ বাঙালি নারী। ১৯৭২ সালের বিভিন্ন মাসে সেইসব যুদ্ধনারী বা বীরাঙ্গনাদের গর্ভে জন্ম নেয় অন্তত ২৫ হাজার যুদ্ধশিশু। আন্তর্জাতিক দত্তকায়নে আগ্রহী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সুইডেনসহ কয়েকটি দেশে দত্তক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল সেসব যুদ্ধশিশুকে। বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, মাদার তেরেসা ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতো সংস্থাসমূহ এগিয়ে এসেছিল এই মহান উদ্যোগে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু গীতাকে নিয়ে এই প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করেছি ডেবরা ইয়পসন রচিত এবং ফেডারেশন প্রেস থেকে প্রকাশিত ‘দি কালার অব ডিফারেন্স - জার্নিজ ইন ট্রান্সরেসিয়াল অ্যাডপশন’ শীর্ষক গ্রন্থ থেকে।

আন্তর্জাতিক দত্তকায়নের প্রথম প্রবাহে ১৯৭০-এর দশকে বেশ কিছু শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। তারা আজ বড় হয়েছে। একটা ‘হঠাৎ অনাহুত দেশে’ আগন্তুক হিসেবে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছে তাদের ভরাট কণ্ঠ। আয়না বলে, গীতা বাওয়ার্স দেখতে ভারতীয়দের মতো। কিন্তু যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে ‘একেবারে শ্বেতাঙ্গ’; সামনে ফুটে ওঠা হাত থেকে পা পর্যন্ত সবটাই। ‘এটা আমাকে দেখায় যে আমি কতটা পশ্চিমী হয়ে উঠেছি। কীভাবে কতটা সাদা সংস্কৃতির মাঝে মিশে গেছি।’ এমনটাই অনুভূতি, বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬ সালে অস্ট্রেলিয়াতে দত্তক শিশু হিসেবে নিয়ে আসা গীতার মনে।

ঢাকার রাস্তায় পাওয়া গিয়েছিল তাকে। ক্ষুধার্ত, শারীরিক প্রহারে জর্জরিত এবং মৃত্যুমুখে পতিত গীতাকে নেয়া হয়েছিল মাদার তেরেসার হোমে। বড় হয়ে এখনো সে তার শরীরে রহস্যময় ক্ষতচিহ্ন দেখে শিউরে ওঠে। সে জানে না যে কে তার জন্মদাতা বাবা-মা। তার জন্মদিন ২৮শে মার্চ। না, দিনটি সঠিকভাবে

তার জন্মের দিন নয়। সেটা ছিল তাকে এক পুষ্টি কেন্দ্রে নেয়ার দিন; যেখানে তার স্বাস্থ্য ফিরে আসে। যদিও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তার বয়স ২৭ (২০০১ সালে), অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে আসার পরে তার ওজনের ওপরে ভিত্তি করে বয়স নিরূপন করা হয়। গীতা মনে করে যে সে আরো একটু বড়। স্কুলে সে সহপাঠীদের চেয়ে শারীরিকভাবেও বড়। সম্ভবত তার বয়স ২৯।

গীতার বেশ স্পষ্ট স্মৃতিতে ভাসে শৈশবের একটি দৃশ্য। কেউ একজন তার মাথাটা ধরে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে পানিতে। “আমি এখনো মনে করতে পারি সেই পচা পানির স্বাদ; যেন বন্ধ হয়ে আসে আমার গলা। পানির নীচে যে আমাকে (ওপরের দিকে ঠেলার জন্য) ধরেছিল সে আমার মা। কারও আমাকে এই কথাটা থেকে নড়চড় করানোর কোনো পথ নেই।” আগামীকাল (২৪.১০.২০০১) প্রকাশিতব্য *‘দি কালার অব ডিফারেন্স - জার্নিজ ইন ট্রান্সরেসিয়াল অ্যাডপশন’* শীর্ষক যে বইটি প্রকাশিত হবে তার একটা অধ্যায়ে গীতা লিখেছে এমন কথা।

বইটির ২৭টি ব্যক্তিগত কাহিনীর মধ্যে টুকরো এই স্মৃতি বা কল্পনা গীতার গল্পটি সবচেয়ে বেদনাময় গাথাগুলোর একটি। অন্যান্য দেশের ১৮ জন দত্তক ছেলেমেয়ের সকল প্রদায়কদের মধ্যে দত্তকায়নের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্নদের মধ্যের একজন গীতা। “আন্ত-জাতি দত্তকায়ন, একই জাতির মধ্যেকার দত্তকায়নের চেয়ে, উন্নততর পন্থা; কারণ এটা আরো মহৎ। এটা শিশু এবং পিতামাতাকে মহৎ হতে বাধ্য করে,” গীতা বলে।

গীতা বড় হয়েছে সিডনিতে এবং তার চারপাশে ছিল ভারতীয় জিনিসপত্র। প্রাচীন দুস্প্রাপ্য নিদর্শন ব্যবসায়ী তার মা সেই দেশটা (ভারত) সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। সারা বাড়ি সাজিয়েছেন ভারতীয় বিভিন্ন চারু ও কারুপণ্য দিয়ে। পরিধান করেন ভারতীয় পোশাক এবং রান্নাও করেন ভারতীয় খাবার-দাবার। কিন্তু, উত্তর সিডনির এক সংবাদ সংস্থার সংবাদ-সংগ্রাহক গীতা বাংলাদেশেসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন একটা আগ্রহী নয়। ‘ভারতে আমি ভ্রমণ করেছি এবং অনুভব করেছি যে আমার জন্ম হওয়া উচিত ছিল ইউরোপে আর আমার মায়ের জন্ম হওয়া উচিত ছিল ভারতে।’

বইটিতে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার ১৮টি দেশের দত্তকায়িত শিশুদের প্রথম প্রবাহের আবেগময় জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। দেখানো হয়েছে যে জন্ম-প্রত্যাখ্যানের এই সংস্কৃতির অস্বাভাবিকতা। প্রকৃতপক্ষে, নতুন এবং সম্ভাব্য বাবা-মায়ের এক সুরের আর্তি হল, ‘শুধু শিশুটিকেই দত্তক নেবেন না, দত্তক নেবেন তাদের সংস্কৃতিকেও।’ গীতা বলতে পারেনা যে, বাংলাদেশের অন্যান্য দত্তক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা ভারত-কেন্দ্রিক বাড়িতে বড় হওয়ার

কারণেই কি সে তার জন্ম-ঐতিহ্যকে শক্তভাবে এড়িয়ে চলে কিনা।

বইটির অন্যান্য প্রদায়কদের কথা পড়ে মনে হয় যেন তারা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে চরমভাবে। পরিচয়ের ক্ষেত্রে তারা দ্বীপবাসী হয়েছে এক শ্বেতাঙ্গ-সমুদ্রে। প্রায়শ এসব দত্তক শিশুরা আয়না এবং পারিবারিক ছবিগুলোতে ঘৃণা করে থাকে। কারণ এদুটোতেই ফুটে ওঠে যে তারা কতটা ভিন্নতর। এমনটা বলেন, ইন্টার-কান্ট্রি অ্যাডপটী সাপোর্ট নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক লিনেলি বেভেরিজ। দত্তকায়নের পরের অবস্থা সম্পর্কে এসব তথ্য ফুটে উঠেছে, বেনিভোলেন্ট সোসাইটির 'পোস্ট অ্যাডপশন রিসোর্স সেন্টারের (পিএআরসি বা পার্ক)' জন্য প্রকাশিত এই বইটির সম্পাদক সারাহ আর্মস্ট্রং এবং পেটরিনা স্লেটরের সম্পাদনার মাঝ দিয়ে। অসম্পূর্ণ সংখ্যার মাধ্যমে দেখা যায় যে, ১৯৭০-এর দশক থেকে ১৮টিরও বেশি দেশ থেকে অন্তত ৪,৭০০ শিশুকে অস্ট্রেলিয়ায় দত্তক নেয়া হয়েছে।

বিগত দশক ধরে, দত্তকায়ন সম্পর্কে, পার্ক কর্মীরা কথা বলেছে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের সঙ্গে। তারা লক্ষ্য করে যে, আন্ত-জাতি দত্তকায়িত শিশুদের কাউন্সেলিং সেশনে নতুন এবং জটিল বিষয়াবলী উদ্ভূত হয়ে চলেছে; অথচ এসব সমাধানে বা সহায়তা দেয়ার মতো সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। 'এটা পুরোপুরিভাবে একটি গণ-দত্তকায়ন। অপরিচিত আগন্তুকরা আপনাকে দেখে সহজেই বুঝতে পারে যে আপনি আপনার বাবা-মার জন্ম দেয়া কেউ নন,' বলেন আর্মস্ট্রং। 'সাদা পরিবারগুলোর মধ্যে পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম এটা। এর ওপরে যুক্ত হয় বর্ণ-জাতিগত পরিচয় এবং সেই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে গৌরবান্বিত হওয়া সম্পর্কে শেখানোরও কেউ নেই।'

বইটিতে বর্ণিত ২৭টি দত্তক শিশুর ১১ জন উল্লেখ করেছে যে তাদের দত্তকায়ন ছিল জটিল। ক্ষেত্রবিশেষে অবহেলার বিষয় পাওয়া যায়। বেশিরভাগের জীবনধারা সাধারণভাবে স্বাভাবিক হলেও সাদাদের মাঝে আটকে পড়ে সংশয়গ্রস্ত অনুভূতির মুখোমুখি হতে হয় বা 'উদ্ধারকৃত' হওয়ার কারণে সবসময়েই কৃতজ্ঞ-প্রকাশভঙ্গী নিয়ে থাকতে হয়। অনেকেই বলেছে যে, সম্পাদক দুজন "দত্তক ছেলেমেয়েদের বাহ্যিক অবয়বকে 'ছেড়েমুছে, রঙ জ্বালিয়ে এবং ছিলে' বাদামী ত্বক দূর করে নীচের শুভ্র ত্বক প্রকাশের ইচ্ছাপূরণ করার বা সত্যিকারের প্রয়াস চালিয়েছে।

দত্তক নেয়া ৩০০টি পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতি অস্ট্রেলিয়ান সোসাইটি ফর ইন্টার-কান্ট্রি এইড টু চিলড্রেনের প্রেসিডেন্ট 'ব্রনউইন ট্যাভার্ন' বলেছেন যে, কোরিয়া এবং থাইল্যান্ড থেকে তিনটা বাচ্চাকে দত্তক নেয়াটা তার

এবং তার স্বামী ফিলিপের কাছে 'জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ'। তাদের সন্তানদের নিজ নিজ সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের তৃপ্তি তাদের রয়েছে। তাদেরকে তারা নিয়ে গেছে তাদের জন্মদেশে। সবার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তরুণ বয়সে যোগ দিয়েছে কোরীয় উৎসবে। আয়নার দিকে তাকানোর মাধ্যমে যে পরিচয়ের প্রশ্নটি ফুটে ওঠে সে সম্পর্কে ট্যাভার্ন বেশ সচেতন। 'তারা তিন জন হওয়ায় বিষয়টা তাদের জন্য ভাল হয়েছে। তারা খুবই আপন এবং একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে পারে। এ বিষয়ে আমি সচেতন। তাদের নিজ জাতির মানুষদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এর মাধ্যমে একটা ইতিবাচক আত্ম-প্রতিচ্ছবি গড়ে ওঠে।'

তার টিনএজ মেয়েটি থাই এবং কোরীয়দের সঙ্গে জামাকাপড় ও মেকআপ ভাগাভাগি করে থাকে। বেভেরিজ বলেন যে, বড় হয়ে ওঠা দত্তকদের নতুন কণ্ঠ, শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক ভিন্ন জাতির শিশুদেরকে দত্তক নেয়ার বিরুদ্ধে দোষারোপ করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা করেন কোনো কোনো পিতামাতা। দত্তক শিশুদের ওয়েবসাইটে (www.geocities.com/icasn1/) তারা তাদের নিজেদের কাহিনী বলতে পারে। বেভেরিজ এবং অন্যান্যরা দত্তক নেয়া পিতামাতাদের সঙ্গে সংলাপ করে থাকেন। বড় দত্তক শিশুদের নিয়ে শিবির পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। ছোট ছোট টিনএজ দত্তক শিশুদের যখন তাদের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করার মতো বয়স আসে তখন তাদেরকে এসব শিবিরে মানসিক সহায়তা দেয়া হবে।

আইটি সংস্থা আইবিএম জিএসএ-র ২৮ বছর বয়সী তরুণী বেভেরিজকে ভিয়েতনাম থেকে অস্ট্রেলিয়ার মতো এক ভিক্টোরীয় দেশে দত্তক নেয়া হয়েছিল। প্রাথমিক ধারণা ছিল 'আদর-ভালবাসা সব কিছু জয় করতে পারে।' বেভেরিজ অনুভব করে যে তার পিতামাতা কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই যথেষ্ট কষ্ট করেছে (তার জন্য)। "আমি খুবই একাকি অনুভব করতাম এবং বিচ্ছিন্নতাবোধে ভুগতাম। এমনকি আমার পরিবারেও।" একজন যুদ্ধশিশু হিসেবে তার '(ভালোবাসার জন্য) ক্ষুধার্ত মানসিকতা' ছিল তার। তাকে বলা হয়েছিল যে তার মা ছিল এক পতিতা; একথায় সে খুবই কষ্ট পায়। এক আবিষ্কারের যাত্রায় (ভয়েজ টু ডিসকভারি) ভিয়েতনামে গিয়ে সে দেখতে পায় যে, বাঁচানোর জন্য, অনেক নারীই তাদের নিজেদের সন্তনদেরকে (দত্তক) দিয়ে দেয়। এখন সে বিভিন্ন পিতামাতাকে তাদের দত্তক নেয়া সন্তানদের সামনে কথাবার্তা বলার সময়ে যত্নশীল হওয়ার অনুরোধ করে থাকে।

আফ্রো-মার্কিন পিতা এবং ভিয়েতনামি মায়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশু দামিয়ান ওবাতাইয়ে-কে 'ওয়াগা অ্যান্ড ব্রোকেন হিলে' বসবাসরত এক শ্বেতাঙ্গ পরিবার দত্তক নিয়েছে। শৈশব কেটেছে অপবাদ আর কটাক্ষ শুনে শুনে। আশপাশের বন্ধুদেরকে তাদের নিজ নিজ বাবা-মারা দামিয়ানের সঙ্গে তাদেরকে খেলতে দিতো না। সেও বেভেরিজের মতো বহু-সংস্কৃতির সিডনিকে এক বিরাট স্বস্তির স্থান বলে মনে করে। ব্রোকেন হিলে কাটানো তার শৈশব ছিল একাকিত্বের।

আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে সে প্রথম বুঝলো যে, কালো মানুষের সম্প্রদায় তাকে গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সেখানে সে অনুভব করে একাত্মতা। এখন তার অনেক আফ্রো-বন্ধু হয়েছে। 'যখন আমি ভিয়েতনামি কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি, আমার মনে হয় আমি যেন এক ভূত। কারণ চারপাশের সবাই দেখতে ভিয়েতনামি; শুধু আমি ছাড়া। সারাটা জীবন ধরে এটাই আমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-একটা পরিচয় চাই।' গত বছরে সে তার নামের শেষাংশ পরিবর্তন করে রেখেছে 'ওবাইতাইয়ে'। এটা একটা নাইজেরীয় শব্দ। খুঁজে পেয়েছে ইন্টারনেটে যার অর্থ 'এক যমজের রাজা'। 'আমার সারাটা জীবন ধরে আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সংগ্রাম করে ফিরেছে। আমি ভেবেছি যে আমি নিজেকে এমন একটা নাম দিব যা সত্যিই শক্তিশালী।'

শরীরচর্চার প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য তার আর একটা মাত্র পরীক্ষা বাকি রয়েছে। জানে যে নিজের বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা 'শূন্য থেকে ঋণাত্মক ১০০'। এক সময়ে তার জন্মদাতা মার ওপরে খুব রাগ হতো। কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সায়গনের চার্চের বাইরে তাকে ফেলে রেখে সে তার পক্ষে সম্ভাব্য সবচেয়ে উত্তম কাজটিই করছে। প্রথম দুটি বছর তাকে লালন-পালন করেছে একজন কানাডীয় ধর্মযাজক। দু'বছর আগে ভিয়েতনামে গিয়েছিল সে। এক বৃদ্ধা তাকে বলেছে যে, সে তার বাবা-মাকে চিনলেও এমন কিছু যায় আসেনা। 'তুমি শুধু আয়নার দিকে তাকাও এবং দেখ তাদেরকে।' আর দামিয়ান ঠিক তাই করে।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

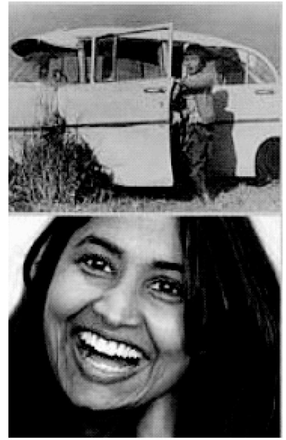

অস্ট্রেলিয়ায় দত্তকায়িত
বাঙালি যুদ্ধশিশু
গীতা
[ওপরে: ১৯৭৬ সালে ৪ বছর বয়সে
নীচে: ২০০১ সালে ২৯ বছর বয়সে]

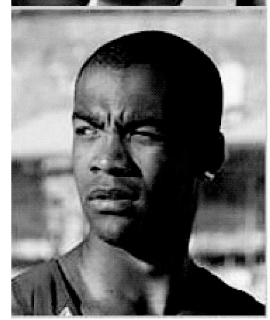

অস্ট্রেলিয়ায় দত্তকায়িত
ভিনদেশী যুদ্ধশিশু

৫. পূর্ব তিমুরের যুদ্ধশিশু রাই

২০০১ সালের ১০ মার্চ শনিবারে 'দি উইকএন্ড অস্ট্রেলিয়ান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সিয়ান পাওয়েল রচিত এই প্রতিবেদনটি। এখানে বিশ্ব প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে রাই নামে পূর্ব তিমুরের এক যুদ্ধশিশু এবং তার মায়ের কথা। পাশাপাশি জানা যায় সেখানকার অন্যান্য অসহায় নারীদের বেদনাগাথা; তাদের ওপরে সংঘটিত গণধর্ষণ, যৌনসন্ত্রাস এবং যৌনদাসত্বের পরিচিত্র।

পাঁচ মাস বয়সের রাই। পূর্ব তিমুরের নতুন জাতির একটি শিশু। তার মা তাকে ভালোবাসে অনেক অনেক বেশি! মুক্তভাবে জন্ম নেয়া প্রথম প্রজন্মের একজন সে। কিন্তু তার অতীত তাকে বন্দি করে রাখবে চিরকাল! তার মা লরেনকা মার্টিন্সের বয়স এখন (২০০১ সালে) ২৩ বছর। সে এক বিষাদগ্রস্ত পূর্ব তিমুরীয় নারী যার দু'চোখ ভরা শুধু তার শিশুটি! শিশুটির পিতা ম্যাক্সিমু একজন সামরিক গুণ্ডা এবং ধর্ষক। পশ্চিম তিমুরের সীমান্ত এলাকায় ছয় মাসের জন্য নির্বাসনে গিয়েছিল মার্টিন্স। আশ্রয় পেয়েছিল আটাম্বুয়ার কাছে এক শরণার্থী শিবিরে। সেখানেই ম্যাক্সিমু ধর্ষণ করে মার্টিন্সকে। কুখ্যাত বেসি মিরাহ পুটিহ (রেড অ্যান্ড হোয়াইট আয়রন) দলের সদস্য ম্যাক্সিমু ১৯৯৯ সালের ৮ই ডিসেম্বরে প্রথমে মার্টিন্সকে দিনের আলোয় জঙ্গলে নিয়ে অপবিত্র করে। "(ক্যাম্পের) অনেক মেয়েকেই এমনটা করা হয়েছে," মার্টিন্স বলে, "সুন্দর চেহারার কাউকে চোখে পড়লেই তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত।" ঘাড় ঝাঁকিয়ে অস্থিরভাবে সে ব্যাখ্যা করে সে বলে, পরে দিলির দক্ষিণাঞ্চলের এক পাহাড়ি শহর এরমেরার শহরতলীতে, সে বসবাস করেছে তার এক আত্মীয়-ভাই ও ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে।

শত্রুর ঔরসজাত সন্তান হলেও, রাইকে পরিত্যাগ করার কথা সে কখনোই ভাবেনি। "বাচ্চাটাকে আমার মেনে নিতেই হবে," সে বলে। "যুদ্ধের জন্যই এমনটা ঘটেছে। আর ঈশ্বরই তাকে আমার কাছে এটাকে দিয়েছে।" নিজের জন্য তার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিলনা। "আমি বিয়ে করতে চাইনা। আমি শুধু আমার বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করতে চাই। একটা বাজে জীবন ছিল আমার। আমি যদি বিয়ে করি তাহলে সেই বাজে বিষয়টা আমাকে অনুসরণ করতে থাকবে।" অনেক পূর্ব তিমুরীয়দের চোখে মার্টিন্স কলঙ্কিত, ব্যবহৃত এবং মোচন-অযোগ্য এক নারী।

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীনতার জন্য নির্বাচনের পরে পূর্ব তিমুর জুড়ে বয়ে যায় পরিকল্পিত ও ভয়াবহ ধর্ষণলীলা। হাজার হাজার শিকারের একজন ছিল সেই মার্টিন্স। পূর্ব তিমুরের আরো অনেক ধর্ষিতা নারীর মতো মার্টিন্স, ধর্ষণের তীব্র মানসিক যন্ত্রণা-প্রসূত পিতৃত্ব থেকে তার বাচ্চাটিকে বিচ্ছিন্ন (ডিভোর্স) করতে পেরেছে। পূর্ব তিমুরে ধর্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে কাজ করা কোনো মানুষই এমন উদাহরণ দেখতে পায়নি যেখানে শুধুমাত্র ধর্ষণের ফসল বলেই কোনো বাচ্চাকে তার মা পরিত্যাগ করেছে। বরং, তারা তাদের নিজ নিজ বাচ্চাকে আরো বেশি করে বুকে আগলে নিয়েছে। সম্ভাব্য কোনো স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

স্থানীয় একটি সাহায্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো ঘটনাটা ছিল ইন্দোনেশীয় এবং আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক "পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং দীর্ঘস্থায়ী"। অত্যাচার-অপরাধের শিকার তবে স্বভাবে লাজুক পূর্ব তিমুরীয় নারীরা এসব বিষয়ে সম্পর্কে বলতে অনিচ্ছুক; ফলে সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। যাহোক, অস্ট্রেলীয় ফেডারেল পুলিশের প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে জাতিসংঘের প্রধান যৌন-অপরাধ তদন্তকারী ডেভিড সিনিয়র বলেন, চূড়ান্ত সংখ্যা সম্ভবত কয়েক হাজার হবে। পূর্ব তিমুরে যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

"ধর্ষণের শিকার মেয়েরা ছিল স্বাধীনতা সমর্থক এবং ফালিনটিল গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তান," বলেন ডেভিড। [Falintil: এটা একটা পর্তুগীজ শব্দ যার পূর্ণরূপ হল: ফোর্সাস আরমাদাস দা লিবারটাসাও ন্যাশনাল ডি তিমোর লেসতে; ইংরেজিতে: দি আর্মড ফোর্সেস ফর দ্য ন্যাশনাল লিবারেশন অব তিমোর লেসতে।] "স্বাধীনতাকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে এটা ছিল শাস্তি এবং অত্যাচার।" বিশ্বকে কলঙ্কিত করা নোংরা যুদ্ধবিগ্রহে, যৌন হয়রানি এবং দাসত্ব হয়ে উঠেছে সামরিক নির্দেশিকার অংশ। পূর্ব তিমুরে ধর্ষণের মাত্রা এবং যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহারের ব্যাপ্তি এখন মাত্র (২০০১ সাল) প্রকাশিত হচ্ছে।

অনেক নির্যাতিত নারী তাদের নিজ নিজ স্বামী, পরিবার ও প্রতিবেশী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হলেও নীরব। ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের বিভিন্ন বইয়ে বিবৃত হয়েছে শত শত নমুনা (কেস স্টাডি)। ধর্ষণের প্রেক্ষিতে, রুয়ান্ডা এবং পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার পাশাপাশি, বিশ্বের সবচেয়ে বাজে এলাকাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে পূর্ব তিমুর।

নারী বিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী জাতিসংঘের একজন মানবাধিকার কর্মী গালুহ ওয়ানদিতা বলেন, যে সমস্ত ঘটনা এ পর্যন্ত ধারণ করা হয়েছে তা উৎসাহব্যঞ্জক সূচনা। "কিন্তু এটা, নিশ্চিতভাবে, বিশাল হিমবাহের চূড়া-মাত্র।" ইতোমধ্যে, পশ্চিম তিমুরের শরণার্থী শিবিরগুলোতে নির্যাতন চলছে অবাধে। ধর্ষণ এবং যৌনদাসত্বের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যায় আতঙ্কিত নারীরা ফিরে আসছে পূর্ব তিমুরে। সম্প্রতি পশ্চিম তিমুরের সীমান্তে ফিরে আসা দু'জন নারী তাদের নিজেদের যৌন-দাসত্বের কথা জানিয়েছে। পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের প্রধান বার্নার্ড কারব্লাট, পক্ষকালেরও কম সময় আগে পশ্চিম তিমুর থেকে উদ্ধার করা ১৩ বছর বয়সী একজনের কথা জানান। যৌন দাসত্বের আটক মেয়েটিকে প্রহার করা হয়েছে, অজ্ঞান করা হয়েছে এবং পূর্ব তিমুরে তার পরিবারের কাছে ফিরে আসার আগের দিন পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়েছে।

"যৌন হয়রানি বেড়েই চলেছে," কারব্লাট বলেন। "কিন্তু মানুষেরা নিজেরা এসব সম্পর্কে বলবে না।" মিলিশিয়া বাহিনী কর্তৃক তিন জন কর্মী হত হওয়ার পরে পশ্চিম তিমুর থেকে ইউএনএইচসিআর [UN High Commissioner for Refugees] প্রত্যাহার করার পরে ক্যাম্পগুলো থেকে তথ্য পাওয়া হয়ে উঠেছে কঠিন। যা জানা গেছে তা হল, এক লাখেরও বেশি পূর্ব তিমুরীয় এখনো নির্বাসিত রয়ে গেছে পশ্চিম তিমুরে; বেশিরভাগই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘের ট্রানজিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান প্যাট্রিক বার্জেস বলেন, মানবাধিকার লংঘনের মাত্রা ব্যাপক। "সেখানে চলছে ধর্ষণ, ব্যাপক মাত্রায় ভীতি প্রদর্শন, চলাফেরায় বিধিনিষেধ, বাকস্বাধীনতা হরণ বা বাড়ি ফেরায় বাধাদান। পূর্ব তিমুর সম্পর্কে সঠিক তথ্য তারা পায় না। তাদেরকে বলা হয়েছে যে সেখানে চলছে যুদ্ধ এবং শান্তিরক্ষী বাহিনী ধর্ষণ করছে পূর্ব তিমুরীয়দেরকে।

তদন্তকারী এবং নারী সংগঠনগুলো একমত যে পূর্ব ও পশ্চিম দুই তিমুরেই স্বাধীনতার প্রশ্নে নির্বাচনের পরে ছড়িয়ে পড়ে ধর্ষণ। আর বহুস্থানে সংঘটিত হয় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। "অসংখ্য ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে বিশৃঙ্খলার মধ্যে," ওয়ানদিতা বলেন। আরো বলেন যে, পরিবার থেকে আলাদা করা মেয়েদেরকে লুটেরা শ্রেণির পুরুষেরা আটক করে। কিন্তু, তিনি বলেন,

এসবের বাইরেও সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে অসংখ্য ধর্ষণ ঘটেছে পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে। "অবশ্যই এসবের মধ্যে ছিল ষড়যন্ত্র।"

পূর্ব তিমুরে ইন্দোনেশীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পূর্বতন সামরিক বাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টোনো সুরাটম্যান এবং ওই অঞ্চলের প্রাক্তন গভর্নর ও জেলা প্রধানগণ, ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী (টিএনআই - Tentara National Indonesia) এবং আধা-সামরিক বাহিনীর 'সমন্বয়' সম্পর্কে স্বীকৃতিও প্রদান করেন। ইউএনটিএইটি-র [United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)] প্রধান যৌনাপরাধ তদন্তকারী ও প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পুলিশ কর্মকর্তা ডেভ সিনিয়র বলেন, তিনজন মানুষকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে; যদিও তাদের দুজন পশ্চিম তিমুরের ইউএনটিএইটি-র আইনগত আওতার বাইরে থেকে গেছে। তিনি বলেন, "সংঘটিত ঘটনার কারণে পুরো পূর্ব তিমুরই অপরাধের দৃশ্যপট।" "আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত সন্ত্রাস করেছে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। আর সেটা হল স্বাধীনতাকামীদেরকে দমন করা। ওই সন্ত্রাসের একটি অংশ ধর্ষণ।"

বিশ্ব এখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে যে, কীভাবে ধর্ষণকে যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষত বিগত ৫০ বছর ধরে সংঘটিত বিভিন্ন জাতি-উপজাতীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিলক্ষিত হয়েছে এটা। এ ধরনের ছোট ছোট বাজে রকমের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের হতাহতের সংখ্যা সামরিক মৃত্যুকে ছাড়িয়ে গেছে। গত মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০০১) হেগে পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল প্রথমবারের মতো গণধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ধর্ষণের দায়ে তিনজন বসনীয় সার্বকে ১২ থেকে ২৮ বছর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রুয়ান্ডাতেও ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল একজন প্রাক্তন মেয়র জোঁ-পল আকেসু-কে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জেনোসাইডের (জাতিসত্তা-ধ্বংস) অপরাধে অপরাধী হিসেবে শনাক্ত করে। কোনো সম্প্রদায় বা উপজাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জেনোসাইড বা জাতিসত্তা-ধ্বংসের অন্যতম কৌশল হিসেবে ধর্ষণকে চিহ্নিত করার বিষয়টি মানুষের ইতিহাসে এটাই প্রথম। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে, যৌনাপরাধের বিষয়াবলী সমাধানের জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠনের জন্য একটি চুক্তি গৃহীত হয়। এখনো পর্যন্ত (২০০১ সাল) পূর্ব তিমুরের জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

ডেভ সিনিয়র বলেন যে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ধর্ষণের প্রমাণ রয়েছে এবং পূর্ব তিমুরে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে। অপরাধের ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। "মাসের পর মাস প্রতিদিন ধর্ষণ করা হয়েছে এমন মেয়েও আছে। তাদের কোনো উপায় ছিলনা। মৃত্যু ঝুঁকির কারণে তারা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে," তিনি বলেন। "আরো কিছু মেয়ে আছে যাদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আধা ডজন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এজন্য যে পরদিন আবার তাদেরকে একই ভাগ্য বরণ করতে হবে!"

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পূর্ব তিমুরে যৌনাপরাধ তদন্তে প্রয়োজন হয়েছে অনেক লম্বা সময়। বিগত ২০০০ সালের আগস্টে একটি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের প্রতিবেদনে ধর্ষণ সম্পর্কিত বিবেচনাগুলো ছিল এরকম, "প্রাথমিকভাবে (যেন) কোনো কিছু ঘটেনি... ২০০০ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ধর্ষণ বিষয়ে গভীর তদন্ত। এর আগে ১৯৯৯ সালে মাত্র দুটি ধর্ষণের ঘটনা ছিল সক্রিয় বিবেচনা।" নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ জনসংযোগ কর্মকর্তা রাধিকা কুমারাস্বামীও শনাক্ত করে যে যৌন-সন্ত্রাস ছিল সুসংগঠিত এবং এতে আধা-সামরিক ও ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী জড়িত ছিল। রাধিকা তার সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, "এটা স্পষ্ট যে পূর্ব তিমুরের সামরিক কমান্ডের উচ্চতম স্তর এটা সম্পর্কে জানতো, বা জানার মতো কারণও ছিল যে, পূর্ব তিমুরে নারীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিস্তৃত সন্ত্রাস ঘটেছে।

কুমারাস্বামী আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৮ সালের পূর্বে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা অত্যাচার এবং ভয় দেখানোর জন্য ধর্ষণকে ব্যবহার করেছে একটি অস্ত্র হিসেবে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আত্মীয়-স্বজনরা সামরিক বাহিনীর সদস্য কর্তৃক প্রতিশোধ স্বরূপ ধর্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, পালিয়ে থাকা আত্মীয়দেরকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করার জন্যও তাদেরকে ধর্ষিত হতে হয়েছে। নির্বাচনের পরেও একই ধারা চলতে থাকে। কিন্তু তবুও, অপরাধের ব্যাপকতা এবং কষ্টের গভীরতা সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত হতে পারেনি; কারণ, পূর্ব তিমুরীয় অধিকাংশ মেয়েই মুখ বন্ধ করে রাখতে চায় (লজ্জায়)। ফলে তাদের মনের ক্ষত, পরিবার ও সম্প্রদায়ের ঝুঁকির চেয়ে, আরো বেশি করে গভীরতর হতে থাকে।

পূর্ব তিমুরীয় নারীদের সাহায্য সংস্থা ফোকুপার্সের মুখপাত্র সমন্বয়ক উবালদা আলভেস বলেন, এই সংস্থার পরামর্শদাতারা (কাউন্সেলর) গ্রামে গিয়ে ধর্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং যারা এ পর্যন্ত লজ্জায় নীরব থেকেছে এরকম মেয়েদের

সঙ্গে কথা বলায় সচেষ্ট হয়েছে। আলভেস বলেন, "কোনো কোনো সময়ে সেসব মেয়েদের পরিবার তাদেরকেই অপমান করে থাকে; কারণ, স্থানীয় সংস্কৃতিতে সমাজ কাঠামোটি খুব বেশি করে পুরুষ-প্রধান এবং তাদের বিবেচনায় বিষয়টা পরিবারের জন্য খুবই লজ্জাস্কর। তাদের নিজ নিজ স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চায় না।" ওয়ানদিতা অবশ্য বলেন যে, তিনি এমন মেয়েদের কথা জানেন যারা পশ্চিম তিমুরের শরণার্থী শিবিরে যৌন-দাসত্বে নিয়োজিত থাকার পরেও, পূর্ব তিমুরে ফিরে আসার পরে, নিজ নিজ স্বামী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়েছে। তারা বলে, "এটা যুদ্ধের ফলাফল এবং আমরা এটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার এরকম অবস্থারও কথাও জানি যেখানে মেয়েরা ফিরে আসার পরে সমাজ তাদেরকে সেনাদের মেয়ে-বন্ধু হওয়ার জন্য তিরস্কার করেছে।"

ওয়ানদিতার পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিজেদের ওপরে হওয়া নির্যাতনের কথা স্বীকার করা ধর্ষিত নারীদের অর্ধেককেই নিন্দিত এবং অভিযুক্ত হতে হয়েছে। তিনি কিছু মেয়েদের কথা জানিয়েছেন যাদেরকে পশ্চিম তিমুরের সীমান্ত এলাকার বোবোনারো শহর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম তিমুরে এবং আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা যখন তাদের নিজ নিজ ধর্ষণজাত শিশুকে নিয়ে ফিরে আসে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়নি; প্রতিবেশীরা ছিল নির্বাক। ওয়ানদিতা বলেন, "এটা থেকে ধর্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধির ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটা এখানকার বিদ্যমান সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুমারীত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যৌনতা হতে পারে শুধুমাত্র বৈবাহিক সম্পর্কে।" ওয়ানদিতা বলেন যে, এমনকি অসহায় মেয়েদের উচ্চারিত বর্ণনাতে শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহৃত মেয়েরা নিজেদেরকে 'ইসতেরি সিমপানান' বা রক্ষিতা স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। বিষয়টা যেন নিষ্ঠুর এক অমানবিক অভিজ্ঞতাকে মিথ্যা মর্যাদার আড়াল দেয়ার প্রয়াস। ধর্ষক কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা পূর্ব তিমুরীয় মেয়েদের পক্ষে তাদের বেদনার কথা প্রকাশ করার সুযোগ ছিল সামান্য। আলভেস বলেন যে, ধর্ষিতা মেয়েদের মধ্যে যারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে গ্রহণ করতে চাইতোনা। "আমাদের সমাজ ভাবে যে এটা খুবই লজ্জাস্কর। তারা ভাবে, কেন তুমি তোমার শরীরকে এভাবে দিয়ে দিবে? তারা ভাবে যে এটা নারীরই অপরাধ।"

প্রায়শ, 'শত্রুতা' আরোপিত হয় যুদ্ধশিশুটির ওপরেই; অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির চেয়ে পরিবার কর্তৃক আরো বেশি করে। "কিন্তু আমরা গিয়ে পরামর্শ দিই এবং শেষ পর্যন্ত মা তাকে গ্রহণ করে," ওয়ানদিতা বলেন। নারীদের সহ্যশক্তি এবং শত্রুর ঔরসজাত বাচ্চাদের জন্য ভালোবাসা লক্ষ্য করে সাহায্য-কর্মীরা বিস্মিত হয়েছে।

ওয়ানদিতা বলেন যে, মনে হয়েছে যে নারীরা তাদের মনের বেদনা এবং বাচ্চাদেরকে আলাদা বাক্সে রাখতে পেরেছে। "আমি দেখেছি যে মায়েরা তাদের সামনে আসা সকল বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে কিভাবে তাদের যত্ন নিয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জটিল পরিস্থিতির মুখেও 'একাকি মা' হয়ে টিকে আছে।" ইউএনএইচসিআরের কারব্লাট বলেন যে, তার অভিজ্ঞতায় পূর্ব তিমুরীয় মায়েরা তাদের বাচ্চাদের প্রতি সবচেয়ে কম শীতল মনোভাবাপন্ন। "রুয়ান্ডা এবং যুগোস্লাভিয়ায় আমি যা দেখেছি তার তুলনায় এখানে বাচ্চা পরিত্যাগের সংখ্যা কম।" ভয়াবহ অপরাধ এবং তছনছ করে দেয়া ধর্ষণের ব্যাপকতা পূর্ব তিমুরের সমাজকে আমূল দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

১৯৯৯ সালে, অনেক স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং ফালিনটিল প্রতিরোধী যোদ্ধাদের গোপন সমর্থক গোষ্ঠীগুলো আধা-সামরিক মিলিশিয়া বাহিনীর হাত থেকে এড়িয়ে থাকার জন্য নিজ নিজ স্ত্রী ও কন্যাদেরকে মিলিশিয়ার মুখে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় পাহাড়ে। পূর্ব তিমুরের অপেক্ষমাণ রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট-ইন-ওয়েটিং) জানানা গুসমাওের স্ত্রী কারস্তি সোর্ড গুসমাও কয়েক মাস ধরে ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। বিশেষত ১৬ বছর বয়সী জুলিয়ানা ডোস স্যান্তস-কে এখনো (২০০১) পশ্চিম তিমুরে মিলিশিয়া বাহিনী যৌন-দাসী করে রেখেছে ; তারা জুলিয়ান ভাইকে তার চোখের সামনে হত্যাও করেছে।

সোর্ড গুসমাও বলে যে, অনেক পূর্ব তিমুরীয় মানুষের পক্ষে আগ্রাসীদেরকে ক্ষমা করতে অনেক সময় লাগবে। "স্বামী/বাবারা বিরুদ্ধ পক্ষে থাকার কারণে অসংখ্য নারীদেরকে ব্যাপক অত্যাচারেরা মুখোমুখি হতে হয়েছে।" নিষ্ঠুর নীতিটি ছিল এরকম: বিংশ শতাব্দির শেষভাগে যুদ্ধের অস্ত্রভাণ্ডারে 'গণধর্ষণ' হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জাতীয়তা বা উপজাতিগত ভক্তির নামে শত শত হাজার হাজার নারীকে নির্যাতন করা হয়েছে।

একটি ইউরোপিয়ান কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধকালে প্রায় ২০,০০০ মহিলা ও কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এদের বেশিরভাগই মুসলিম। রুয়ান্ডাতে, জাতীয় উইমেন অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সূত্রমতে, ১৯90 দশকের আপদকালে ১২ থেকে ৬৫ বছর বয়সী ১৫,৭০০ নারী ও কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ নারী [বেশিরভাগই কোরীয়] জাপানি সেনা কর্তৃক নির্যাতিত হতে হয়েছে। এদের বেশিরভাগই ছিল কোরীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এদেরকে অভিহিত করা হতো 'কমফোর্ট উইমেন' নামে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ৯ মাস ব্যাপী

মুক্তিযুদ্ধকালে ২,৫০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়। ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুডের মতে জন্ম নেয় ২৫,০০০ যুদ্ধশিশু।

৮০-র দশকের গোড়াতে উগান্ডায় অজ্ঞাত সংখ্যক নারীকে সেনাবাহিনীর হাতে ধর্ষিত হতে হয়েছে। ৮০-র দশকে প্রতি ১০ জন ভিয়েতনামী নৌকা-চালক নারীদের ৪ জনকেই ধর্ষণের শিকার হতে হয়। আর সিয়েরা লিওনে-তে গৃহযুদ্ধকালে সন্ত্রাসের অস্ত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ধর্ষণ। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে গণভোটের পরে ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মাঝে ধর্ষকদের 'কলিং কার্ড' ছিল গ্রেনেড!

ফ্রান্সিসকা সোয়ারেসকে ধর্ষণ করা হয়েছে তার পাঁচ সন্তান এবং রাস্তার পথিকদের সামনে। সারা বিশ্বে কৌশলটি ব্যবহৃত হয় শিকারকে যথাসম্ভব অপমান করা এবং পরিবারের সামনে লজ্জা আর কলঙ্কিত করা। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুর যখন জ্বলছিল, তখন সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে, সোয়ারেস তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে দিলির দক্ষিণে এরমারা শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। তার স্বামী, স্বাধীনতাকামীদের সমর্থক হিসেবে পরিচিত, জুলিও বাতিস্তা তাদের বড় তিন সন্তানকে নিয়ে, মিলিশিয়াদের হাত থেকে বাঁচার জন্য, পালিয়ে যায় পাহাড়ে।

আতঙ্কিত কণ্ঠে সোয়ারেস স্মরণ করে যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর এক পূর্ব তিমুরীয় কর্মকর্তা হিলারিও এবং স্থানীয় ডারাহ মেরাহ (রেড ব্লাড) মিলিশিয়া বাহিনীর এক কমান্ডার এরমেরায় তার বাড়িতে এসেছিল এবং সেসময়ে মাত্র ৮ বছরের ফ্র্যাংকির পায়ে গুলি করেছিল। সেই রাতে সে এক ভাইঝিসহ পরিবারের সবাইকে একত্রিত করেছিল এবং সরে গিয়েছিল পাশের শহর গ্লেনোতে। সোয়ারেসের স্বামী এখন মাত্র ধীরে ধীরে মানসিক ধাক্কা বা শক থেকে সেরে উঠছে।

পূর্ব তিমুরীয় নারীদের সংস্থা ইটিওয়েভ সোয়ারেসকে কাউন্সেলিং দিচ্ছে। তার বাড়ির সামনে ইটওয়েভ বানিয়ে দিয়েছে একটা তরিতরকারির দোকান। এতকিছু কেন ঘটেছিল সেসব নিয়ে হিসাব-নিকাশ করার চেষ্টা করে সোয়ারেস। "মিলিশিয়া বাহিনী সন্দেহ করেছিল কারণ আমার স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল। তারা তাকে খুঁজে পায়নি বলেই আমাকে ধর্ষণ করেছিল।" বছরব্যাপী যন্ত্রণার বিচার তার জীবনে হয়ে দাঁড়িয়েছে যাবজ্জীবন কারা-যন্ত্রণা।

ইসাবেলা সালসিনহা পেরেইরার মুখে শুকনো হাসি। তার কোলে ২ বছরের লাইবেনিয়া। বারবার ধর্ষিতা হওয়ার ফসল! পেরেইরার কথায় ফুটে ওঠে পূর্ব তিমুরীয় নারীদের ধর্ষণের মুখোমুখি হওয়ার যন্ত্রণা। বিশেষ করে যখন আগ্রাসী ধর্ষক মানুষটির ইন্দোনেশীয় বা সরকারি যোগাযোগ থাকে। মাঝেমধ্যেই পালা

করে এক বছর ধরে তাকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। তবুও সে মনে করে যে তার কোনো বিকল্প ছিল না। সেসময়ে সে দিলির দক্ষিণে গ্লেনোতে অবস্থিত এক স্কুলে পড়াশোনা করতো। এক পার্টিতে সে নজরে পড়ে যায় সরকারি পরিকল্পনা অফিসের জনৈক জোস মারিয়ার চোখে। পেরেইরার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে জোস। সে জানতোনা যে জোস কি মিলিশিয়া ছিল নাকি পরে মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তবে অন্যান্য পূর্ব তিমুরীয়রা মনে করে যে সে তাই করেছিল। কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছিল। "সে এসে যখন দরোজায় টোকা দেয়, পরিবারের অন্যরা খুলে দেয় কারণ তারা ভয় পেয়েছিল।" সে বলে, "আমি তাকে অসম্মতি জানাই, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।" সে আমাকে ধর্ষণ করার জন্য বারবার ফিরে আসে। "যখন পেরেইরার গর্ভধারণ প্রায় অবশ্যম্ভাবী, তার ভাই পুলিশের কাছে ধর্ষণের বিষয়টি অবহিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জোস তখন শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। পেরেইরা ফিরে আসে তার গ্রামে। সেখানে কোনোমতে একটা ছোট আকারের গবাদি পশুর ফার্ম গড়ে তোলে। নিজের, তার মার এবং তার মেয়ের খাওয়া-পড়ার জন্য। তার প্রতিবেশীরা তার প্রতি বন্ধুবৎসল ছিলনা। "তারা এসবকে গ্রহণ করতে পারেনি। আমার সম্পর্কে তারা খুব বাজে শব্দ উচ্চারণ করেছে।" একসময়ে সে ভাবতো বিয়ে করে পরিবার গড়ার। এসব আকাঙ্ক্ষার কোনোকিছুই আর নেই তার মনে। এখন সে কোনো অভিযোগ জ্ঞাপন করতে চায় কিনা, জিজ্ঞেস করলে সে শুধু তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে - নিরুত্তর কণ্ঠে!

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

৬. সঙ্গীতজ্ঞ যুদ্ধশিশু এরিক ক্ল্যাপটন

আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের পক্ষে বিশ্বব্যাপী বিদেশী এবং প্রবাসী অসংখ্য কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে, জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে, ১৯৭১ সালের ১লা আগস্টে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। উচ্চকিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন অনেকেই - জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর, বব ডিলান, বিলি প্রেস্টন, ব্যাডফিঙ্গার, লিয়ন রাসেল, রিঙ্গো স্টার প্রমুখ। তবে সেদিন একজন 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে 'বাংলাদেশের' পক্ষে সুরেলা সোচ্চার কণ্ঠ ছিল একটিই – এরিক ক্ল্যাপটন! প্রিয়পাঠক, আমাদের প্রিয় এবং বিশ্বনন্দিত ক্ল্যাপটন সারাটা জীবন ধরে খুঁজে ফিরেছেন তার জন্মদাতা পিতাকে; যিনি ছিলেন একজন কানাডীয় সৈন্য - এডওয়ার্ড ফ্রায়ার। শেষ পর্যন্ত পিতার সন্ধান পেয়েছিলেন, তবে সেই পিতার মৃত্যুর অনেক পরে। এই প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে ক্ল্যাপটনের অভিমানী গায়ক জীবনের কথা।

ইংল্যান্ডে লন্ডনের দক্ষিণে সারে অঞ্চলের রিপলীতে ১৯৪৫ সালের ৩০শে মার্চে এক অবিবাহিত দম্পতির ঔরসে জন্ম হয় এরিক ক্ল্যাপটনের। মা ছিলেন ১৬ বছর বয়সী প্যাট্রিসিয়া মলি ক্ল্যাপটন এবং বাবা ছিলেন কানাডার মন্ট্রিয়ল নিবাসী ২৪ বছর বয়সী এক সৈন্য এডওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্রায়ার। ক্ল্যাপটনের জন্মের আগে ফ্রায়ারকে জাহাজে করে যুদ্ধে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) প্রেরণ করা হয়েছিল এবং পরে তাকে কানাডায় ফিরিয়ে নেয়া হয়। নানী রোজ এবং নানা (রোজের দ্বিতীয় স্বামী) জ্যাকের কাছে বড় হয় ক্ল্যাপটন। ক্ল্যাপটন জানতো যে ওই নানা-নানীই তার বাবা-মা এবং তার আসল মা তার 'বড়বোন'। তাদের নামের শেষাংশ ক্ল্যাপ। সেজন্য বহুল প্রচারিত এবং গৃহীত ধারণা যে এরিকের প্রকৃত নাম ক্ল্যাপ। কয়েক বছর পরে তার মা আরেক কানাডীয় সেনাকে বিয়ে করে। এরিককে তার নানা-নানীর কাছে রেখে চলে যায় কানাডায়। এরিকের যখন ৯ বছর বয়স তখন তার মা এবং সৎভাই ব্রায়ান ইংল্যান্ডে বেড়াতে আসার পরে সে পারিবারিক এসব গোপন তথ্য জানতে পারে। ওই অভিজ্ঞতা তার

জীবনে একটা বাঁকের মতো আবির্ভূত হয়। স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে শুরু করে এরিক। বেশ আবেগপ্রবণ বা মুডি হয়ে ওঠে এবং পরিবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা শুরু করে। পরে ১৯৭৪ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ব্রায়ান। তবে একই সম্পর্কের সূত্রে ক্ল্যাপটনের আরো দুজন সৎবোন ছিল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে জন্ম নেয়া শেরিল এবং ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম নেয়া হীদার।

ক্ল্যাপটন বড় হতে থাকে নীরবে - কুণ্ঠিত, একাকী এবং তার নিজের ভাষায় 'বাজে ছেলে' [অযাচিত যুদ্ধশিশু!] হিসেবে! তবে সঙ্গীতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিষয়ে সে ছিল খুবই আন্তরিক। একদিকে এরকম হলেও, অন্যদিকে তার রসবোধ ছিল বেশ উঁচুমানের।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সে অধ্যয়ন করেছে সারবাইটনের হলিফিল্ড স্কুলে। তার প্রথম চাকরী ছিল পোস্টম্যানের। ১৩ বছর বয়সের জন্মদিনে ক্ল্যাপটন উপহার হিসেবে পায় একটা অ্যাকুস্টিক স্প্যানিশ গীটার এবং সেইসঙ্গে মারিম্বা [আফ্রিকার আদিবাসীদের ব্যবহৃত জাইলোফোন]। তবে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখাটা বেশ কঠিন মনে হওয়ার কারণে প্রায় ছেড়েই দেয় এসব। সেকালের ব্লুজের প্রভাবে সে শিখতে শুরু করে কর্ড। তার গ্রুনডিগ কাব টেপ রেকর্ডারে বিগ বিল ব্রুনজির মতো গায়কদের কণ্ঠস্বরের অবিকল রূপে গাওয়ায় সচেষ্ট হয় ক্ল্যাপটন।

স্কুলের পাঠ শেষ করে ১৯৬২ সালে কিংসটন কলেজ অব আর্টসে এক বছরের একটা ফাউন্ডেশন আর্ট কোর্স সমাপ্ত করে। কিন্তু এরপরের পর্ব আর্ট ডিগ্রি কোর্সে আর ভর্তি হয়নি সে। এ সময়ে কিংসটন, রিচমন্ড এবং লন্ডনের পশ্চিম এলাকার বিভিন্ন স্থানে পথসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে ক্ল্যাপটন। ১৭ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো যোগ দেয় ব্যান্ডদলে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত থেকে যায় আদি বৃটিশ ঢংয়ের 'দি রুস্টার্সে'।

প্রতিষ্ঠিত ক্ল্যাপটন

এরিক ক্ল্যাপটন সিবিই (কমান্ডার অব বৃটিশ এম্পায়ার) একজন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী ইংলিশ রক গীটারিস্ট, গায়ক, গীতিকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তার ডাকনাম 'স্লোহ্যান্ড'। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দির সবচেয়ে সফল সঙ্গীতজ্ঞদের একজন তিনি। রক অ্যান্ড রোলে তার অভূতপূর্ব সাফল্য তাকে প্রদান করে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান। সমালোচক এবং ভক্ত দুই পক্ষই মনে করে যে সে সকল

সময়ের জন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ গীটারিস্ট। রোলিং স্টোন পত্রিকার 'দি গীটারিস্টস অব অল টাইম' তালিকায় ৪র্থ এবং তাদের 'দি ইমমোরালসঃ ১০০ গ্রেটেস্ট আর্টিস্টিস অব অল টাইম' তালিকায় ৫৪ নম্বর।

যদিও ক্ল্যাপটনের সঙ্গীতের ঢং তার পেশাগত জীবন ধরে বৈচিত্র্যে ভরপুর; এর মূলসুরটি থেকে গেছে ব্লুজের পটভূমিতে। ক্ল্যাপটনকে তার সঙ্গীত-জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে জন মেঅল ও ব্লুজব্রেকার্স এবং ইয়ার্ডবার্ডসের সঙ্গে মিলে ব্লুজ-রক, ক্রীমের সঙ্গে মিলে সাইকেডেলিক-রক ইত্যাদি। চার্ট তালিকাতেও তার সাফল্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ডেল্টা-ব্লুজ (মি অ্যান্ড মিস্টার জনসন) থেকে পপ (চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড) এবং রেগে (বব মার্লের 'আই শট দ্য শেরিফ')। ডেরেক অ্যান্ড ডোমিনোজের সঙ্গে মিলে 'লায়লা' গানের মাধ্যমেও পেয়েছে উল্লেখজনক খ্যাতি।

বিতর্কিত ক্ল্যাপটন

১৯৭৬ সালের ৫ই আগস্টে বার্মিংহামের কনসার্টে, বৃটেনে ক্রমবর্ধমান অভিবাসী সম্পর্কে, তার একটি মন্তব্য তাকে ঠেলে দেয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন 'ইংল্যান্ড ক্রমেই ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে' এবং 'বৃটেনকে কৃষ্ণাঙ্গদের উপনিবেশ হওয়া থেকে বাঁচান'। তিনি বলেন, 'আগে আমি ছিলাম মাদকতায়, আর এখন আমি বর্ণবাদে।' বিতর্কিত ও 'তথাকথিত বর্ণবাদী' রাজনৈতিক প্রার্থী ইনোক পাওয়েলের প্রতি সমর্থনের কথাও প্রকাশ করেন ক্ল্যাপটন। 'আমার মনে হয় ইনোক-ই সঠিক। আমাদের উচিত যে তাদের সবাইকে বিদায় করে দেয়া। অশ্বেতাঙ্গদের বের করে দাও! বৃটেনকে সাদা রাখো!' অল্পদিনের মধ্যেই এসব বিরূপ মন্তব্যের পথ ধরেই যুক্তরাজ্যে সৃষ্টি হয় 'রক এগেইনস্ট রেসিজম' আন্দোলন।

পরে ক্ল্যাপটন ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন মূলত এক আরব ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর প্রতি আপত্তিকর আচরণ (শারীরিক স্পর্শ ইত্যাদি) করার কারণে। তিনি বলেন, বিষয়টা শুরু হল এভাবে। লন্ডনে আরব-অর্থ ব্যয়ের বিশালতা এবং অন্যান্য মানুষের (সীমিত) অর্থের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি। যেমন, হঠাৎ করেই একজন আরব বলে বসে, 'হাইড পার্কের দাম কত?' এরকম অনেক কিছু মিলে সেই রাতে আমাকে ক্ষুব্ধ করে দিয়েছিল। 'আনকাট ম্যাগাজিনের' সঙ্গে ২০০৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে ক্ল্যাপটন ইনোক পাওয়েলকে 'দুর্ধর্ষ সাহসী' বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, এসব বিষয়ে আমার

অনুভূতি একটুও বদলায়নি। আমাদের দেশে আমরা সবসময়েই কিছু হাস্যকর কাজকর্ম করে থাকি। সস্তা শ্রমিক হিসেবে অনেককে ডেকে আনি এবং পরে তাদের ঠেলে দিই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-ভিত্তিক এলাকায়।

ক্ল্যাপটন আরো মন্তব্য করেন যে, 'আমার পক্ষে বর্ণবাদী হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এর কোনো মানেই হয় না।' তার আত্মজীবনীতে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে এর প্রতি অসচেতন' এবং 'আমি কখনোই এটা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারিনি বা সরাসরিভাবে বর্ণবাদী সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি।' কোথা থেকে শিল্পীরা এসেছে বা তাদের শরীরের রঙ কি - এসব বিষয়ে আমার কোনো আকর্ষণ বা চিন্তা-ভাবনা ছিল না।

১৯৮০র দশকের শেষদিকে ক্ল্যাপটন তার দলে নেন চারজন কৃষ্ণাঙ্গ– বেজিস্ট নাথান ইস্ট, কীবোর্ডিস্ট গ্রেগ ফিলিংগেনস, ড্রামার স্টিভ ফিরোন এবং ব্যাকিং সিঙ্গার ক্যাটি কিসোন। এটাই ছিল প্রথমবারের মতো তার কোনো একটা সঙ্গীত দল গঠন যেখানে 'সবাই সাদা' ছিলনা। তবে এর আগে, ক্ল্যাপটন অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে গান গেয়েছেন; যেমন, বাডি গাই, চাক বেরী, বিবি কিং এবং রবার্ট ক্রে। যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বহুবর্ণের সমন্বয়ে পরিচালিত অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশে' অংশগ্রহণ। ক্ল্যাপটনের পক্ষের মানুষেরা দাবি করে যে তিনি বর্ণবাদী ছিলেন না। এমনকি আফ্রো-ক্যারিবীয় সুপারমডেল নাওমি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ডেটও করেছেন। এছাড়াও ক্যারিবীয় দ্বীপ অ্যান্টিগুয়াতে তার নিজের একটা বাড়িও ছিল বেশ কয়েক বছরের জন্য।

২০০৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে, দি সাউথ ব্যাংক শোতে মেলভিন ব্র্যাগের মুখোমুখি এক সাক্ষাৎকারে ক্ল্যাপটন ইনোক পাওয়েলের প্রতি সমর্থনের পুনরুল্লেখ করেন এবং পাওয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণবাদী ছিলনা বলে দাবি করেন।

পিতার অন্বেষণে

তার নানা-নানী, তার বাবা-মা সম্পর্কে সব সত্যই তাকে খুলে বলেছিল। যেমন, সে এক কানাডীয় সেনার ঔরসজাত সন্তান। অনেক বছর ধরে তার পিতার সঠিক পরিচয়টি ছিল রহস্যাবৃত। ক্ল্যাপটন জানতো যে তার পিতার নাম ছিল এডওয়ার্ড ফ্রায়ার, তবে সে তার সম্পর্কে আর কিছুই জানতোনা। এসবই ছিল তার দুশ্চিন্তার সূত্র। এর প্রতিফলন দেখা যায় তার ১৯৯৮ সালের 'মাই ফাদারস আইজ' গানে। এটার কথায় রয়েছে, 'হাউ ডিড আই গেট দেয়ার? হোয়াট হ্যাভ আই ডান? হোয়েন উইল অল মাই হোপস অ্যারাইজ? হোয়েন আই লুক ইন মাই

ফাদারস আইজ...'। অবশ্য ক্ল্যাপটন একবার মন্তব্য করেছিলেন যে এই গানটি তার মৃত পুত্র কনোরকে নিয়ে রচিত [সম্ভবত নিজ পিতার বিষয়ে কুণ্ঠা বা সংশয়গ্রস্ত হয়ে এমনটা বলেছিলেন]।

মিকাইল ওলোশাক নামের টরন্টোর এক সাংবাদিক এই রহস্য উন্মোচনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কানাডীয় সেনাবাহিনীর সার্ভিস রেকর্ড অনুসরণ করে তিনি পৌঁছে যান ফ্রায়ারদের পরিবারের সদস্যদের কাছে। টুকরো টুকরো তথ্য জোড়া দিয়ে সে কাহিনী উদ্ধার করেন তার মাধ্যমে স্থির করতে সক্ষম হন যে ক্ল্যাপটনের পিতা ছিলেন এডওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্রায়ার। মন্ট্রিয়লে জন্মেছিলেন ১৯২০ সালের ২১শে মার্চে এবং অন্টারিওর নিউমার্কেটে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৫ সালের ১৫ই মে তারিখে। ফ্রায়ার ছিলেন একজন বাদক। বাজাতেন পিয়ানো এবং স্যাক্সোফোন। সারাটা জীবন ছিলেন লক্ষ্যহীন। বিয়ে করেছিলেন বহুবার। অনেক ছেলেমেয়ে থাকলেও কখনোই জানতেন না যে বা জানা হয়ে ওঠেনি যে এরিক ক্ল্যাপটন নামে তার কোনো পুত্র ছিল! কানাডার অটোয়ার ম্যাকডোনাল্ড কার্টিয়ের বিমানবন্দরে মুখোমুখি দেখা হওয়ার পরে ব্যক্তিগতভাবে ক্ল্যাপটন সন্তুষ্ট চিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ওলোশাককে।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

সঙ্গীতরত এরিক ক্ল্যাপটন

৭. যুদ্ধশিশু বিষয়ক কয়েকটি চলচ্চিত্র

মূলত সংবেদনশীল হওয়ার কারণেই সম্ভবত এমন একটি বিষয় নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা উল্লেখজনক নয়। বাণিজ্যিকভাবে সফল হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকেনা এসব সত্যকাহিনী-চিত্রে। তার পরেও কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র একটিই। সেটা হল কানাডীয় নির্মাতা রেমন্ড প্রভেনশার পরিচালিত এবং কানাডায় নির্মিত 'ওয়ার বেবীজ'। এর মূল চরিত্রটি রূপায়ণ করেছে কানাডায় দত্তকায়িত বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু রায়ান বাদল।

ওয়ার বেবিজ (নির্মাতা: ম্যাকুম্বা ইন্টারন্যাশনাল। পরিচালক: রেমন্ড প্রভেনশার। ৯০ মিনিট)
বিংশ শতাব্দির পুরোটা সময় জুড়ে নিকারাগুয়া থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, রুয়ান্ডা থেকে বাংলাদেশ এবং বসনিয়া পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে একই অপরাধ। বারবার সংঘটিত হয়েছে হাজার হাজার নারীর ওপরে। যুদ্ধকালের ধর্ষণ সহ্য করে বেঁচে যাওয়া নারীদের প্রতিদিনের জীবনধারায় বারবার ফিরে ফিরে আসে তাদের গ্রহণকালের বেদনা। এসব ঘৃণ্য অপরাধের ফলে জন্ম হয়েছে শত্রুর ঔরসজাত শিশুর। সেসব 'পবিত্র' শিশুর নাম রায়ান, হেয়লিং বা আকিমুনা। তাদের ত্বকের রঙ কালো, সাদা বা বাদামী। পৃথিবী গ্রহের ওপরে সংঘটিত যুদ্ধের চিত্রের ওপরে তাদের কাহিনী যেন চড়ায় ভয়াবহ রঙ! তবে এপর্যন্ত যুদ্ধে আক্রান্ত এসব নারীদের ওপরে যথেষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করা হলেও, ওই সন্ত্রাসের ফলে উদ্ভূত শিশুদের ওপরে দৃষ্টিপাতের বিষয়টি এই প্রথমবারের মতো এসেছে চলচ্চিত্রে।

কেমন ধরনের জীবন আশা করতে পারে এসব যুদ্ধশিশু? তারা কি কখনো প্রকৃত অর্থে পরিবারের সদস্য হয়ে উঠতে পারবে? কীভাবে তারা তাদের বেদনার ভার সহ্য করে নেবে? কীভাবে একজন মা তার ধর্ষকের সন্তানকে ভালোবাসবে? যুদ্ধাপরাধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশু এবং তাদের মায়েদের 'সম্পর্কে' অনুসন্ধান করেছে ওয়ার বেবিজ।

এ চাইল্ডস সেঞ্চুরি অব ওয়ার (পরিচালক : শেলী সেওয়েল। ৯০ মিনিট)
বিগত বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে যুদ্ধে নিহত হওয়া প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনই ছিল সেনাসদস্য। আর বর্তমান শতাব্দির শুরুতে এখন যুদ্ধে নিহত হওয়া প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনই সাধারণ বা অসামরিক মানুষ। বেশিরভাগই শিশু। 'এ চাইল্ড'স সেঞ্চুরি অব ওয়ার' শিশুদের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দর্শককে নিয়ে যায় এক পরিভ্রমণে। আধুনিক যুদ্ধকৌশল কিভাবে বদলে গেছে এবং কিভাবে ক্রমবর্ধমান হারে শিশুদেরকে শিকার করছে তারই এক পরীক্ষা এই চলচ্চিত্র। তিনটি সমসাময়িক যুদ্ধ এই কাহিনীর মূল উপজীব্য। দুটি চেচেন যুদ্ধের অনাথ শিশুর দল, পশ্চিম তীরে বেড়ে ওঠা শিশুর দল এবং সিয়েরা লিওনে-র বিদ্রোহী সৈন্য কর্তৃক অপহৃত শিশুরা তাদের নিজেদের বেদনার কথা বলে।

ক্রাইমস অব অনার (৫৩ মিনিট)
ইসলামী বিশ্বে প্রতি বছরে নিহত হয় শত শত নারী। গুলি, চাকুর আঘাত, শ্বাসরোধ বা পুড়িয়ে মারে আত্মীয়-স্বজনেরা। কারণ তারা মনে করে যে, এসব নারীরা তাদের পরিবারের জন্য 'অসম্মান'। এসব নারীরা হয় তাদের কুমারীত্ব হারিয়েছে, নাহয় একটা পরিবার-নির্ধারিত বিয়েতে অমত প্রকাশ করেছে অথবা কোনো অত্যাচারী স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে। এমনকি কোনো নারী যদি ধর্ষিত হয় বা কোনো আড্ডাবাজীর শিকার হয়, তাকে দিতে হয় চরম মূল্য। 'ক্রাইমস অব অনার' ভয়াবহ নারীত্ব-অবমাননার বাস্তব বর্ণনা। মেয়েদের শরীরটি পরিবারের সম্পত্তি এবং অসংগত যৌনাচরণকে অবশ্যই মেয়েটির রক্তের বিনিময়ে পবিত্র করতে হবে।

সেক্স স্লেভ (৮৮ মিনিট)
পূর্বতন সোভিয়েত দেশসমূহ থেকে নারীপাচারের মাধ্যমে বিশ্ব-যৌন বাণিজ্যের একটা জমাটবদ্ধ প্রকাশ এই সেক্স স্লেভ চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটির কিছু অংশ সত্য-কথন আর কিছু অংশ অনুসন্ধান। মালটি-বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিশ্ব পতিতা

পাচারের যৌন-ব্যবসায় ধূসর জগতের নারীদের পথ অনুসরণ করে যৌনদাসীরা। মলডোভা এবং ইউক্রেনের গ্রাম থেকে তুরস্কের অন্ধকার ব্রথেল বা পতিতালয় পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি যৌনদাসত্বের নিষ্ঠুর সম্মুখচিত্র। নির্মিত হয়েছে নারীদের আশ্রয়স্থল 'এফসিজে রিফিউজি সেন্টারের' সহযোগিতায়।

লেটস টক অ্যাবাউট ইট (৪৭ মিনিট)
আমাদের বাসাবাড়িতে নির্যাতনের শিকার হওয়া নিষ্পাপ এবং বিস্মরিত শিশুরা পারিবারিক অত্যাচারের নীরবতা এবং গোপনীয়তা ভেঙেছে প্রথমবারের মতো। দীপা মেহতার পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে এই তথ্য-চলচ্চিত্র।

হাইওয়ে অফ টিয়ার্স (পরিচালক: শারমিন ওবায়েদ-চিনয়: ২১ মিনিট)
প্রিন্স রুপার্ট থেকে প্রিন্স জর্জ পর্যন্ত প্রলম্বিত ৪২৫ মাইল দীর্ঘ কানাডার হাইওয়ে ১৬ ধরে পরিভ্রমণ করে পরিচালক শারমিন। পাইন বন, নদী এবং বৃটিশ কলম্বিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দূরদূরান্তে অবস্থিত আদিবাসী গ্রামগুলোর মাঝ দিয়ে চলে গেছে ওই রাজপথ। আশপাশের পরিবারগুলো এই পথে প্রতিদিন খুঁজে ফেরে নিজেদের প্রিয়জনদেরকে। পথটিকে তারা বলে 'হাইওয়ে অব টিয়ার্স'। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিরূপণ করেছে যে বিগত তিন দশকে এই হাইওয়েতে হারিয়ে গেছে ৩২ জন আদিবাসী কানাডীয় নারী।

উগান্ডা রাইজিং (৮২ মিনিট)
দুই দশক ধরে উত্তর উগান্ডার আচোলি জনগোষ্ঠী একটি বিদ্রোহী দলের বিবাদের কারণে জড়িয়ে রয়েছে গৃহযুদ্ধে। দলটির মূল উদ্দেশ্য হল অমানবিক অত্যাচার এবং একটি সরকার যার সামরিক আগ্রাসনের মাত্রা প্রায়শ ছাড়িয়ে যায় অবর্ণনীয় কষ্টে-বেদনায়। পনের লক্ষাধিক মানুষকে বিতাড়িত করে নেয়া হয়েছে ক্যাম্পে। ২৫,০০০ শিশুকে অপহরণ করে হয় সেনা নাহয় যৌনদাস/দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিদিন আচোলি-রাজ্যে ঘটে উল্লেখজনক ঘটনা-উপঘটনা। বিশ্ব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু উগান্ডার একটি অংশের শিশুরা যারা কখনো শান্তির অভিজ্ঞতা পায়নি, তারা এখনো অপেক্ষা করে শান্তিময় আগামীর! এসব শিশুই আশা এবং আনন্দের বিমূর্ত প্রতিরূপ। এই চলচ্চিত্রটি উগান্ডা, উগান্ডার অপহৃত শিশুসন্তান এবং মুক্তিকামী যুদ্ধ-সম্পর্কিত।

দারফুর ডায়েরি (৫৬ মিনিট)
২০০৪ সালের ১৯শে অক্টোবরে তিনজন চলচ্চিত্র-নির্মাতা রওনা হয় দারফুর, সুদান এবং চাদের উদ্দেশ্যে। কয়েকমাস ধরে সমস্যা সম্পর্কে আশানুরূপ সাড়া লক্ষ্য না করতে পেরে হতাশ তারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দারফুরে নিজ বাসস্থান থেকে ভিন্নস্থানে প্রতিস্থাপিত এবং চাদে বিতাড়িত মানুষদেরকে একটা অভয়-মঞ্চ প্রদান করা; যেখানে তারা বর্ণনা করবে তাদের নিজ নিজ তিক্ত অভিজ্ঞতা, ভয় এবং ভবিষ্যতের কথা। যে কোনো যুদ্ধ-বিবাদকারে শিশুরাই থাকে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে। এরাই চলচ্চিত্রটির মূল আকর্ষণবিন্দু। পূর্ণ জীবনধারা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানুষ ভর্তি ঘরবাড়িসহ পরিপূর্ণ দারফুরবাসীরা নিজেদের বাড়িতে ফেরার জন্য মরিয়া। মানুষেরা প্রতিনিয়ত পার করছে বেদনার মুহূর্ত; কিন্তু তবুও তারাই প্রদর্শন করে উৎসাহব্যঞ্জক শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা। তাদের প্রয়োজন জীবন, বাড়ি, নিরাপত্তা এবং অধিকারের সংরক্ষণ।

এ মুমেন্ট ইন টাইম – দি ইউনাইটেড কালার্স অব ব্রোন্সটেইন (জুডি ফিল্মস ইনকর্পোরেটেড – ৫৫ মিনিট)
কানাডীয় শিশু অধিকার মুখপাত্র নাওমী ব্রোন্সটেইনের সাড়া জাগানো জীবনীর পরে এই চলচ্চিত্রটি উপস্থাপন করেছে ক্যাম্বোডিয়া, গুয়েতেমালা এবং ভিয়েতনামের শিশুদের কাহিনী। এতে আরো রয়েছে সায়গন থেকে ১৪০টি শিশুকে আকাশপথে সরিয়ে নেয়ার সময়ে মর্মান্তিক বিমান ক্র্যাশে তাদের সকলের মৃত্যুর কথা। কয়েকজন যুদ্ধশিশুর পুনর্মিলনীর বিষয়টিও রয়েছে। এসব শিশুকে পুনর্জীবন দিয়েছে নাওমী নিজে।

ইনোসেন্স আন্ডার সীজ (ল্যাংব বীচ প্রোডাকশন – ৬০ মিনিট)
যুদ্ধের ভয়াবহতায় শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতের গভীরে অনুসন্ধান করেছে এই চলচ্চিত্র। রুয়ান্ডা এবং সিয়েরা লিওনের যুদ্ধাহত শিশু, (বড়দের মৃত্যুতে) শিশু পরিচালিত বসাবাড়ি, এবং যুদ্ধের শিকার বা অত্যাচারিতদের চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রয়াসের ওপরে পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই এই চলচ্চিত্রটির উপজীব্য।

শিশু যোদ্ধা (ম্যাকুস্বা ইন্টারন্যাশনাল, ২০০২)
কে ইউসুফ, কে মুসা এবং স্টিভেন সোয়েনস্কের মতো ছোট ছোট তিন কিশোর ছিল যুদ্ধের সৈনিক। সিয়েরা লিওনের নয় বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধে ছোটদেরকেও

জোর করে জড়ানো হয়েছিল যুদ্ধে। ইউনিসেফ তথ্যে নিরূপিত হয়েছে যে, ওই সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। অন্যান্য সূত্র মনে করে যে সেটা ছিল ১০ থেকে ১৫ হাজারের মধ্যে।

রুয়ান্ডা ইন সার্চ অফ হোপ (হোয়াইট পাইন পিকচার্স, ১৯৯৯ - ৫৩ মিনিট)
রুয়ান্ডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ১২ জন কানাডীয় অভিযাত্রীর সঙ্গে যোগ দিন। তারা জানতে চায় যে, ১৯৯৪ সালের বসন্তকালে কেন মারা গিয়েছিল ১০ লক্ষ মানুষ! এটায় দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অনাথ এবং নারীদের ওপরে। বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ধর্ষণের শিকারের ওপরে এবং তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের ওপরে।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

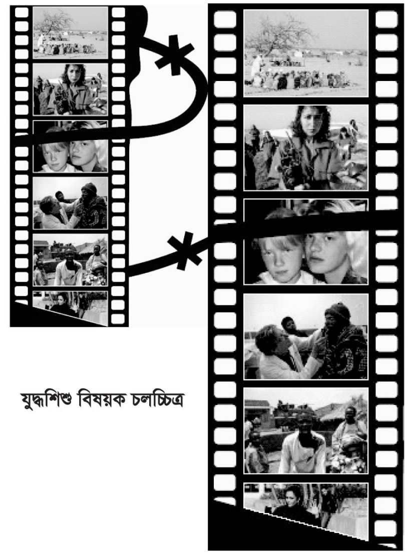

দারফুর ডায়রিজ

ম্যাকুইলাপোলিস

সেক্স স্লেভস

সেপং - এ
ক্লিনিক কলড হোপ

উগান্ডা রাইজিং

লেটস টক
অ্যাবাউট ইট

যুদ্ধশিশু বিষয়ক চলচ্চিত্র

এ চাইল্ডস সেঞ্চুরি অব ওয়ার

৮. ওয়ার বেবিজ (নেস ডে লা হাইন)
রেমন্ড প্রভেনশারের একটি তথ্য-চলচ্চিত্র

নির্মাতা: ম্যাকুম্বা ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড
মুক্তিকাল: শুক্রবার, ডিসেম্বর ৬, ২০০২
ধরন : তথ্য-চলচ্চিত্র
পরিচালনা, প্রযোজনা ও চিত্রনাট্য: রেমন্ড প্রভেনশার

যুদ্ধকালে ধর্ষণের পরে বেঁচে যাওয়া নারীদের ওপরে অনেক বেশি করে দৃষ্টি দেয়া হলেও, ওই যৌনসন্ত্রাসের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদের ওপরে মনোনিবেশ করার বিষয়টা এই প্রথম। বাংলাদেশ, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিকারাগুয়ার যুদ্ধশিশুদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এতে। বাংলাদেশে সংঘটিত যৌনসন্ত্রাসে জন্ম হওয়া রায়ানকে দত্তক হিসেবে নিয়েছিল কানাডীয় এক দম্পতি। বড় হয়ে সে ফিরে আসে তার জন্ম-উৎস বাংলাদেশে। উদ্দেশ্য ছিল তার জন্মদাত্রী মা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তার মাকে ধর্ষণকারী পাকিস্তানি সেনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তার দুশ্চিন্তায় লক্ষ্য করা যায় যে, সে ভাবে যে সে হয়তো তার শরীরে তার পিতার 'দুষ্ট জিন' বয়ে নিয়ে চলছে। ওই মুক্তিযুদ্ধে ২৫০,০০০ ধর্ষিত নারীর একজন তার মা।

রুয়ান্ডায় টুটসি নারীরা তাদের ওপরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে ভীত ছিল। একজন যুদ্ধশিশু হিসেবে একটি মেয়েকে তার মা একটু বেশিমাত্রায় ভালোবাসতো কারণ যুদ্ধকালে গণহত্যায় তার অন্য সকল ছেলেমেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। বসনিয়ায় অনেক নারী 'শত্রুর সন্তান ধারণ' এড়ানোর জন্য গর্ভপাত করানোর সুযোগ পেয়েছিল। এই তথ্য-চলচ্চিত্রটি যুদ্ধে এ ধরনের অপরাধের মাত্রা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী নির্দেশক। এডুকেশন মিডিয়া রিভিউ অনলাইনের জন্য রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কারেন হার্টম্যান বলেছেন, "আন্ত-বিষয়ভিত্তিক সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ওয়ার

বেবিজ চলচ্চিত্রটিকে খুব বেশি করে সুপারিশ করা যায়। একইসঙ্গে সমাজতত্ত্ব, অপরাধীদের বিচার, মনস্তত্ত্ব এবং নারীবিষয়ক পড়াশোনার জন্যও বিশেষভাবে উপযোগী।"

প্রিয়পাঠক, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধশিশু বিষয়ক বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও, ওয়ার বেবিজ (নেস ডে লা হাইন) নামের এই একটিমাত্র চলচ্চিত্রে [তথ্য-চলচ্চিত্র] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের পরিচিত্র। মূল চরিত্র রূপায়ণ করেছে কানাডায় দত্তকায়িত বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু রায়ান বাদল। চলুন, এবার লেখনীতে দেখি সেই তথ্য-চলচ্চিত্র।

পুরুষেরা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে, আর নারী হয়েছে সেই যুদ্ধে বিজয়ী সেনাদের হাতে বিজিত বা পরিত্যক্ত পণ্য! বিংশ শতাব্দি ধরে, নিকারাগুয়া থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, রুয়ান্ডা থেকে বাংলাদেশ এবং বসনিয়ায় একই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বারবার। সংঘটিত হয়েছে হাজার হাজার নারীদের ওপরে। যুদ্ধকালে ধর্ষণে আক্রান্ত হওয়ার পরেও বেঁচে যাওয়া নারীদের বর্তমান জীবনের প্রতিদিনের প্রতিচিত্রে মূর্ত হয়ে আছে সেদিনের ভয়াবহ চিত্রের জীবন্ত-রূপ: ওই জঘন্য অপরাধের ফসল হিসেবে জন্ম নেয়া শিশু - শত্রুর ঔরসজাত সন্তান। হয়তো সেসব যুদ্ধশিশুদের নাম রায়ান, হেয়লিং বা আকিমুনা। হয়তো তাদের গায়ের রঙ কালো, সাদা বা বাদামী। এই গ্রহের ওপরে ঘটে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিচিত্রে এঁকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রার প্রলেপ। আর আপাতত, এখনো কোনো আভাস পাওয়া যায়না যে, নতুন শতাব্দিটি বিগতটার চেয়ে কোনো অংশে ভিন্নতর হবে।

ওয়ার বেবিজ তথ্য-চলচ্চিত্রে সেই আমাদেরকে নিয়ে যায় নিকারাগুয়া, রুয়ান্ডা, বসনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের নারীদের প্রতি অত্যাচার, ধর্ষণ, ঘৃণা এবং কোনো কোনো সময়ে ভালবাসার শক্তি প্রত্যক্ষ করার আবেগময় পরিভ্রমণে।

চরিত্রসমূহ

রায়ান বি গুড বা রায়ান বাদল গুড অনটারিওর ওয়াটারলুতে বসবাসকারি একজন কানাডীয় নাগরিক। একটি কবিতায় সে লিখেছে তার নিজের জীবন-গাথা : 'আমার নাম রায়ান বাদল। আমার দু'জন মা - একজন ডাকে রায়ান, আর অন্যজন ডাকে বাদল। আমাকে রায়ান বলে ডাকা মাকে আমি চিনি সারা জীবন ধরে। বাদল বলে ডাকা মাকে আমি কখনো দেখিনি। বাংলাদেশে আমাকে বাদল বলে ডাকা মায়ের গর্ভে আমার জন্ম হয়েছিল। তিন সপ্তাহ পরে আমাকে রায়ান বলে ডাকা মায়ের কাছে আমার আবার জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে একজন পাকিস্তানি সেনা আমাকে বাদল বলে ডাকা মাকে ধর্ষণ করেছিল। আমি একজন যুদ্ধশিশু।'

৮২ বছর বয়সে মিসেস চুং বাস করে কোরিয়ার পিয়নটিয়াকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি সেনারা তাকে একজন কমফোর্ট উয়োম্যান হিসেবে ব্যবহার করার ফলে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে। সেসময়ে তার জন্ম দেয়া পুত্রটি সম্প্রতি তার পিতার প্রকৃত জাপানি পরিচয় আবিষ্কার করে।

সাত সন্তানের জননী সাবেরা। সম্প্রতি রুয়ান্ডাতে সংঘটিত জেনোসাইড বা জাতিসত্তা ধ্বংসের অংশ হিসেবে গণহত্যায় সাবেরার স্বামী এবং সকল সন্তানই নিহত হয়েছে। পরে সে আশ্রয় নেয় এক কম্যুনিটি সেন্টারে। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে অসংখ্য পুরুষ। এরপরে সে আবিষ্কার করে যে সে অন্তঃসত্বা। সাবেরার ৫ বছরের মেয়েটির নাম আকিমুনা। আকিমুনা শব্দের অর্থ 'যে আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে'!

নিরূপিত হয়েছে যে বসনিয়ায় **১৯৯১** সাল থেকে **১৯৯৫** সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বল্কান যুদ্ধে ২০,০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছে। নুসরেতা (নুসরাত) তাদেরই একজন। এক বন্দি শিবিরে আটকে রেখে সে এবং তার মেয়েকে রাতের পর রাত ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে নুসরেতা। সেখান থেকে পালানোর পরে হাসপাতালে যে কোনো ভাবে নিজ দায়িত্বে গর্ভপাত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে।

হেয়লিং মার্টিন **১৬** বছর বয়সী এবং ইতোমধ্যেই সে একজন মা। নিকারাগুয়াতে এক দশক ধরে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে তার স্মৃতিতে তেমন একটা কিছু নেই। কিন্তু সে জানে যে, তার নিজ-গ্রামের অনেক মেয়েকেই প্রতিবেশী বিরুদ্ধবাদীরা ধর্ষণ করেছে। সেসব মেয়েরা এখনো বসবাস করে এই গ্রামেই। তার মা'ও তাদেরই একজন এবং হেয়লিং নিজে ধর্ষণের ফসল অর্থাৎ একজন যুদ্ধশিশু। সে বিশ্বাস করে যে, সে তার ঔরসজাত পিতা এবং তার মায়ের ধর্ষককে শনাক্ত করতে পেরেছে।

পুরস্কার

২০০৪ : আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন : বান্‌ফ টেলিভিশন
২০০৩ : গিমক্স পুরস্কার [শ্রেষ্ঠ তথ্য-চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ গবেষণা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ]
২০০৩ : শ্রোতা পুরস্কার, হট ডকস কানাডীয় আন্তর্জাতিক তথ্য-চলচ্চিত্র উৎসব, টরোন্টো
২০০৩ : সাসকাচিউয়ানে ইয়র্কটন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ তথ্য-চলচ্চিত্র
২০০৩ : ডকুপোলিস আন্তর্জাতিক তথ্য-চলচ্চিত্র উৎসবে 'মানবাধিকার পুরস্কারের' তথ্য-চলচ্চিত্র

২০০২ সালে ম্যাকুম্বা ইন্টারন্যাশনালের ব্যানারে নির্মাণকালে এই তথ্য-চলচ্চিত্রের ওপরে গবেষণা করেছেন রেমন্ড প্রভেনশার, ফারজানা রুপা (বাংলাদেশের সাংবাদিক), ক্যাথারিন হেবার্ট, জিয়ানি মুকামুসোনি, সীয়ানা পাসিক, ফ্লর ডে মারিয়া রামিরেজ, এবং সঞ্জু ইয়ো।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

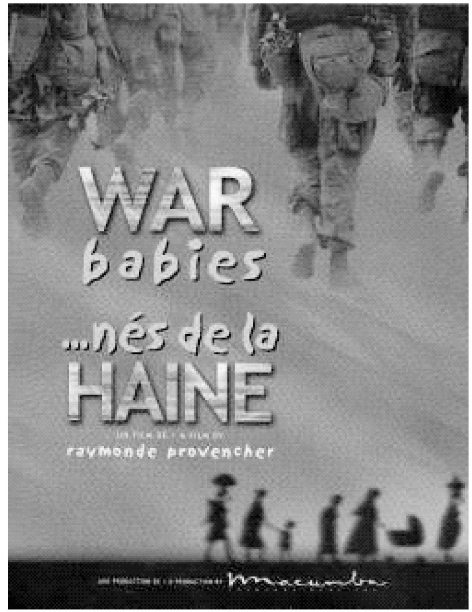

রায়ান বাদল, বাংলাদেশ

সাবেরা, রুয়ান্ডা

নুসরেতা, বসনিয়া

চুং, কোরিয়া

হেয়লিং মার্টিন, নিকারাগুয়া

৯. রেমন্ড প্রভেনশার - জীবনচিত্র

জীবনপথে সত্যানুসন্ধানে বিশ্ব চষে ফিরছেন রেমন্ড প্রভেনশার। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর প্রতি আগ্রহই তাকে বিগত ২৫ বছর ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে রেডিও-কানাডায় শুরু হয় তার রিপোর্টিং পেশা। প্রথম দশ বছর কেটেছে রেডিও-কানাডা এবং টেলি-কিউবেকের বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রামের কাজে। তার কর্মপরিধি বেড়ে যায় উল্লেখজনকভাবে। নির্মাণ করেছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান 'ফেমস ডি'আউজার্ড'হুই (১৯৭৩-৭৬)', প্রতিদিনের সংবাদ 'সে সইর (১৯৭৬-১৯৮০)' বিশেষ প্রতিবেদনসহ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান 'রেফারেন্ডাম ৮০ (১৯৮০)', বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান 'সাইন্স-রিয়ালিটি (১৯৮০)', এবং জনগুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'এল-অবজেকটিফ (১৯৮০-৮৩)'।

১৯৮৩ সালে রেমন্ড, চিত্রনির্মাতা রবার্ট কর্নেলিয়ার এবং প্যাট্রিসিও হেনরিকুয়েজ সম্মিলিতভাবে টেলি-কিউবেকের জন্য নির্মাণ করেন 'নর্ড-সুড' (নর্থ-সাউথ) শীর্ষক টেলিভিশন প্রোগ্রাম। দ্রুতই এটা হয়ে ওঠে প্রদেশটির জন্য মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ অনুষ্ঠান। এর পরের তের বছর ধরে, নর্ড-সুড অভিযানের বিস্তৃত কার্যক্রমে ত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করে রেমন্ড নির্মাণ করেন প্রায় ১০০টি টেলি-রিপোর্টিং। এসব রিপোর্টিংয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি অর্জন করে পুরস্কার। যেমন তাজওয়ার কাকার এবং মুজাহেদা আফগান পায় এমআইএম (মুসলিম, ইসলাম এবং মুসলিমস, ১৯৮৯) পুরস্কার; মালয়েশিয়া, কোস্টা রিকা এবং জাম্বিয়ার শরণার্থী নারীদের ভাগ্য নিয়ে নির্মিত তথ্য-চলচ্চিত্র 'ফেমস এন পেরিল' পায় টরন্টোর মিডিয়া ওয়াচ অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯) এবং জেনেভার রেনকন্ট্রে মিডিয়া নর্ড-সুডের তৃতীয় পুরস্কার (১৯৯০); এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণিতে 'লেস ডেফিস ডি'আর্টিটিড' লাভ করে গ্র্যান্ড প্রিক্স ডে লা কম্যুনুয়েট ডেস টেলিভিশন ফ্র্যাংকোফোন পুরস্কার (১৯৯১)।

১৯৯৫ সালে নর্ড-সুড অভিযান যখন সমাপ্তির পথে, তখন রেমন্ড এবং তার সহকর্মীদ্বয় (রবার্ট কর্নেলিয়ার এবং প্যাট্রিসিও হেনরিকুয়েজ) নিজেরাই একটা বেসরকারি প্রযোজনা সংস্থা 'ম্যাকুম্বা ইন্টারন্যাশনাল' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ত্রয়ীর প্রয়াসে দ্রুতই নির্মিত হয় 'লিভিং ইন দ্য সিটি'। ধারাবাহিক এই তথ্য-চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো দৃষ্টিপাত করা হয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি মনোমুগ্ধকর শহরের নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি। তেরটি পর্বের এই শহরের তথ্যচিত্রে রেমন্ড প্রভেনশার গবেষক এবং উপস্থাপক দুই ভূমিকাই পালন করেন। ২০০০ সালে সমাপ্ত হয় এটি।

একইসঙ্গে তিনি 'লেস প্রোডাকশন ভিরেজ ইনকর্পোরেটেডের' ব্যানারে কাজ করেন 'ডেস মারেলেস এট ডেস পেটাইটস ফিলিস' শীর্ষক তথ্যচিত্রের নির্মাণে। এই প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছিল রেমন্ডেরই উৎসাহে; শ্রেষ্ঠ গবেষণাসহ অর্জন করে তিনটা গিমোক্স অ্যাওয়ার্ড।

পরিচালক প্যাট্রিসিও হেনরিকুয়েজের একজন সহ-প্রযোজক হিসেবে যৌথ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে রেমন্ড প্রভেনশার কাজ করেন দুটো তথ্যচিত্রে: 'সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১: দি লাস্ট স্ট্যান্ড অফ স্যালভাদর অ্যালেন্ডে' এবং 'ইমেজেস অফ এ ডিকটেটরশিপ'। দুটিই অর্জন করে সমালোচকদের স্বীকৃতি এবং অসংখ্য পুরস্কার ও পদক।

২০০১ সালে, চারটি গিমোক্স পুরস্কারপ্রাপ্ত, 'এক্সট্রিমিস' ধারাবাহিকের অংশ হিসেবে, রেমন্ড নির্দেশনা দেন ফিলিপাইনের শিশু-শ্রমিক এবং প্যালেস্টাইনে পানি-চুরির ওপরে নির্মিত তথ্যচিত্রে।

পরের বছরে তিনি রচনা করেন এবং নির্দেশনা দেন, যুদ্ধকালে ধর্ষিত নারীদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদের ভাগ্য নিয়ে, পূর্ণ-দৈর্ঘ তথ্য-চলচ্চিত্র 'ওয়ার বেবিজ'। ২০০৩ সালে এটা অর্জন করে সমালোচকদের স্বীকৃতি এবং চারটি গিমোক্স পুরস্কার: শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র, শ্রেষ্ঠ গবেষণা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ। 'হট ডকস! কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল', টরন্টো, কানাডার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড (২০০৩), কানাডার সাসকাচেওয়ানে অনুষ্ঠিত ইয়র্কটন শর্ট ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র (২০০৩), এবং স্পেনের বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত ডকুপোলিস ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র (২০০৩) পুরস্কার।

বর্তমানে রেমন্ডের হাতে একইসঙ্গে প্রচুর কাজ। প্রায় শেষ করে এনেছেন অবৈধ অভিবাসনের ওপরে এক্সট্রিমিস ধারাবাহিক। পরের প্রকল্পটিতে উপস্থাপিত হবে বিশ্বজুড়ে শান্তিবাহিনীর অত্যাচার-অনাচার। আরো দুটি গবেষণায় নিয়োজিত আছেন: প্রথমটি নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং অন্যটি ইরাকে প্রথম মার্কিন জিআই (অ্যাশভিল জিআই) হত্যা।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

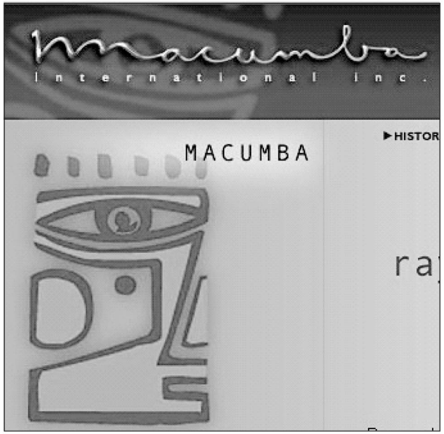

রেমন্ড প্রভেনশার
ওয়ার বেবিজ তথ্য-চলচ্চিত্রের নির্মাতা

১০. পিতার পাপ – ধর্ষণে জন্ম নেয়া শিশুর রেখাচিত্র

ম্যাথিউ হেজের কলমে ‘ওয়ার বেবিজ’ চলচ্চিত্র

নব্বইয়ের গোড়ার দিকে বল্কান যুদ্ধের সময়ে এবং পরের ভয়াবহতায় প্রেক্ষিতে যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য রূপ হিসেবে গণধর্ষণের বিষয়টি প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক দৃষ্টি কাড়ে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধজয়ের এই অপকৌশলকে যুদ্ধপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এর প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত করা হয়ে ওঠে সুশীল বিশ্ববাসীর নৈতিক কর্তব্য।

রেমন্ড প্রোভেনশার নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ ওয়ার বেবিজ তথ্যচিত্রে নির্মাতা যুদ্ধে ধর্ষণের মাত্রা ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছেন আরো গভীরে। ওই ঘৃণিত কাজের ফলে জন্ম নেয়া অসহায় শিশুদেরকে অবলোকন করেছেন অনুসন্ধিৎসু চোখে। অনুভূত হতে পারে যে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু প্রোভেনশার এই অবৈধ কাজের ফলাফল দেখাতে গিয়ে আরো দেখিয়েছেন যে কতজন শিশু তাদের উৎসের সঙ্গে পরিচিত হতে সচেষ্ট হয়েছে।

ধারাবাহিকভাবে একসারি রেখাচিত্র উপস্থাপন করার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন নির্মাতা প্রোভেনশার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি সেনাদল কর্তৃক বারংবার ধর্ষিত এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কোরীয় নারী মিসেস চুং। স্মৃতিচারণে সে বলে যে কীভাবে অতিসম্প্রতি তার ‘বড় হওয়া পুত্র’ জানতে পেরেছে কিভাবে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত চুং মুখোশের আড়াল থেকে ক্যামেরায় বলে যায় তার বেদনাগাথা। এখনো যে এসব কথা বলতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক ভারসাম্য ফিরে এলে, স্বীকার করে যে কি নির্দয়ভাবে সে তার নিজের স্বামী এবং পুত্রকে আঘাত করে থাকে। কারণ, ধর্ষণে মানসিক বৈকল্যের ফলে সে যে কোনো পুরুষকে ঘৃণা করে।

তথ্যচিত্রের আরেক চরিত্র হেইলিং মার্টিন্স একজন মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে যাকে সে তার জন্মদানকারী বলেই বিশ্বাস করে। মানুষটিকে নিয়ে মা ও মেয়ের মাঝে তর্ক-বিতর্কের দৃশ্যও ধারণ করা হয়েছে ক্যামেরায়। মেয়ে যখন বলে যে তার ওই [ধর্ষিতা] পিতার মাঝে ভাল দিকও রয়েছে, তখন মা বেদনাহত আবেগে ক্রুদ্ধ হয়ে যায়।

পুরো তথ্যচিত্র জুড়ে রয়েছে ওয়াটারলু শহরে বড় হয়ে ওঠা [একাত্তরের] পাকিস্তানি ঔরসজাত [বাঙালি] রায়ান। অন্যদের মতো তার পরিচয়টাও তার উৎসের ক্ষতচিহ্নে জর্জরিত। তথ্যচিত্রের একটিমাত্র আবেগময় শ্রান্তি আসে যখন রায়ান তার তীব্র বেদনার মুখোমুখি হয়, এক পর্যায়ে ঢাকায় আসে এবং এগিয়ে চলে। তথ্যচিত্রে এটা একটা একক এবং আশাবাদী মুহূর্ত।

আমার মন্তব্য: ওয়ার বেবিজ চলচ্চিত্রে জন্মদাত্রী মায়ের জন্য রায়ানের সন্ধান আবারো বিশ্বমানবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, নিকারাগুয়া, বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, বসনিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় কীভাবে সুপরিকল্পিতভাবে 'ধর্ষণ' ব্যবহৃত হয়েছে সন্ত্রাস এবং ধ্বংসের অস্ত্র হিসেবে। পরিসংখ্যান মনকে নাড়া দেয় গভীরভাবে; কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে নাড়া দেয় এ সম্পর্কিত 'নীরবতা' যা পর্দার আড়াল টেনেছে প্রয়োজনীয় তদন্ত বা অনুসন্ধানে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অসহায় শিকারের বিপরীতে অপরাধীদের শাস্তি হয়েছে মুষ্টিমেয়। পাকিস্তান যেভাবে বাংলাদেশে গণ-ধর্ষণ পরিচালনার কথা অস্বীকার করার (ব্যর্থ) চেষ্টা করে, তেমনি করে জাপানও অস্বীকার করার চেষ্টা করে হাজার হাজার কোরীয় মেয়েদেকে জোর করে কমেফোর্ট উইমেন হিসেবে যৌনসেবা প্রদানের বিষয়ে!

এই জ্বলজ্বলে তথ্য-চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত যুদ্ধের বর্বরতার ওপরে পরিশ্রমী গবেষণা হয়েছে কিন্তু এটা অবলোকন করা খুবই কঠিন। পরিচালক রেমন্ড প্রভেনশার রায়ান নামের এক তরুণকে অনুসরণ করেন। কানাডীয় একটি পরিবারে ১৯৭২ সালে দত্তকায়িত হয়ে সে। বড় হয়ে সে বাংলাদেশ ভ্রমণে আসে তার জন্ম হওয়ার পরিবেশ নিয়ে আরো বেশি করে জানতে। পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশু ছিল রায়ান। তার মাকে সন্ধান করার বিভিন্ন পর্ব মিশে গেছে কোরিয়া, বসনিয়া এবং রুয়ান্ডার নারীদের সাক্ষাৎকারে; যারা তাদের নিজ নিজ দেশে যুদ্ধকালে প্রায়শ বারবার শত্রু কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। সেসব নারীরা স্পষ্ট করে উচ্চরণ করে তাদের বিস্তারিত বেদনাগাথা। আর তাদের সেই বেদনার চিত্র অবলোকন করা প্রায়শ হয়ে ওঠে সুকঠিন। ফলে জন্মদাত্রী মায়ের জন্য রায়ানের

সন্ধানটি ছবিতে প্রদর্শিত নিদারুণ যন্ত্রণার পাশাপাশি আবির্ভূত হয় এক কঠিন বৈপরীত্যে। ছবিটি দেখতে দেখতে এক সময়ে সাময়িকভাবে মনে হয় যেন, পুরুষের প্রতি – যে কোনো পুরুষের প্রতিই ইতিবাচক দৃষ্টি রাখা কঠিন। এসব নারীদের কাহিনী শোনার পরে এসবই মূর্ত হয়ে ওঠে প্রচণ্ড আবেগ আর ধীমান উৎকর্ষে।

বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, বসনিয়া, নিকারাগুয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় যুদ্ধকালের যৌনসন্ত্রাসের মাঝ দিয়ে জন্ম নেয়া শিশু এবং বেঁচে থাকা ধর্ষিতা নারীদের ওপরে দৃষ্টিপাত করেছে এই তথ্য-চলচ্চিত্র। নারী ও শিশুরা তাদের নিজেদের কথা বলে এই তথ্য-চলচ্চিত্রটিকে যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে দিয়েছে একটা শক্তিশালী 'দণ্ড'।

শত্রু কর্তৃক ধর্ষণ – এটাই যুদ্ধের চূড়ান্ত কর্ম। যত দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, নারী থেকেছে সেই পর্বের পরিত্যক্ত অংশ হিসেবে। আর অসংখ্য নারীর জন্য, ওই ঘৃণ্য বর্বরতার মাঝ দিয়ে আবির্ভূত সন্তানের মধ্যে জীবন্ত হয়ে থাকে অত্যাচারের বেদনাগাথা। কীভাবে মা তার সেই সন্তানের চোখের দিকে চাইবে আর তার সেই অত্যাচারের কথা মনে করবে না? কীভাবে যুদ্ধশিশুরা বেঁচে থাকবে, তাদের অভ্যুদয়ের ভয়াবহ সত্যের সঙ্গে? মানসিক ও শারীরিকভাবে আহত এসব যুদ্ধনারী এবং শত্রুর ঔরসজাত যুদ্ধশিশুদের মধ্যে ভালোবাসাময় বন্ধনের কি কোনো আশা আছে? গতকালকে এরকম শিকাররা ছিল কোরীয়, বাঙালি, ফিলিপিনো এবং পোলিশ জু। আজকে তারা সোমালীয়, হাইতীয়, বসনীয় মুসলিম এবং রুয়ান্ডার টুটসি। আর আগামীকাল? সাহসিকতার সঙ্গে, সাহায্য এবং সুবিচারের প্রার্থনায়, যুদ্ধ-ধর্ষণের শিকার এবং যুদ্ধশিশুরা বলেছে তাদের নিজেদের কথা। এর মাঝ দিয়ে তারা তাদের ক্ষত সারা এবং আরো বর্বরতাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে।

বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ সশস্ত্র যুদ্ধ-বিগ্রহে ধর্ষণ ব্যবহৃত হয় যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে। এটাই চূড়ান্ত অস্ত্র। নারীর গর্ভে রোপিত হয় ঘৃণিত বীজ। এসব শিশুদের কী হয়? এই তথ্য-চলচ্চিত্র যুদ্ধকালে ধর্ষণে জন্ম নেয়া শিশুদেরকে দিয়েছে একটি উপযোগী কণ্ঠ।

ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক 'আর. চার্লি কার্পেন্টার' ২০০৪ সালে, ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে, 'চিলড্রেন অব এনিমি? ফোর্সড প্রেগন্যান্সি, হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিসট্যান্স অ্যান্ড চিলড্রেন্স রাইটস ইন দ্য বল্কানস' শীর্ষক এক গবেষণা কর্মে হাত দেন। বল্কান অঞ্চলে যুদ্ধে ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া শিশুরা ছিল তার গবেষণার মূল অংশ। ১৯৯০ দশকে বল্কান যুদ্ধের পরে, গণধর্ষণের ফলাফল হিসেবে শত শত শিশুর জন্ম হয় যাদের মায়েরা কখনোই

চায়নি এসব শিশুকে। সেসব শিশুদের অনেককেই দেখা হয়েছে 'শত্রুর সন্তান' হিসেবে। এরকম এক নাজুক অবস্থান ওইসব যুদ্ধশিশুদের শিক্ষা, পরিচয়, পরিবার এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে গভীরভাবে। যদিও 'নারী বিষয়' হিসেবে গণধর্ষণ এবং জোর করে গর্ভায়নের কথা বিশাল আকারে এসেছে এই গবেষণা প্রতিবেদনে, কার্পেন্টারের প্রকল্পটি যুদ্ধশিশুদের বিষয়টির প্রতিও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছে।

ওয়াব বেবিজ – একটি বিশ্লেষণ

যুদ্ধকালে সংঘটিত ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে 'ওয়ার বেবিজ'। এই তথ্য-চলচ্চিত্রটি আরম্ভ হয়েছে এর বর্ণনাকারীকে দিয়ে। সে একজন যুদ্ধশিশু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তার মাকে ধর্ষণ করেছিল একজন পাকিস্তানি সেনা। বড় হয়ে বাংলাদেশে সে ফিরে আসে তার জন্মদাত্রী মা এবং বাবাকে খোঁজার জন্য। ছবিটি এগিয়ে চলে রুয়ান্ডা, বসনিয়া, এবং নিকারাগুয়ার ধর্ষণের শিকার নারী এবং তাদের জন্ম দেয়া শিশুদের কাহিনীর মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বের পরে চিত্রায়ন ফিরে আসে বর্ণনাকারীর কাছে। দর্শক শুনতে পায় সেসব মাত্রায় তার চিন্তাপ্রসূত মন্তব্য এবং সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া।

শিকার হওয়া নারীরা, (পর্দায়) অদৃশ্য সাক্ষাৎকার-গ্রাহকের কাছে, বর্ণনা করে তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের চলমান জীবন-যুদ্ধের কথা। ছবিটি ধারণ করে দু'জন মা এবং তাদের কন্যাদের জটিল প্রতিক্রিয়ার চিত্র। প্রতিটি দৃশ্যে, সংবাদের ফুটেজের সঙ্গে বর্তমান সময়ের চিত্রকে সমন্বয় করে বোনা হয়েছে; এর সামনে শ্রুত হয়েছে নারীদের কথা। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে বর্ণনাকারীকে দেখা গেছে প্রদর্শিত সংঘর্ষে-যুদ্ধে ধর্ষিত নারী এবং ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুর সংখ্যা কম্পিউটারে টাইপ করতে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময়ে এই তথ্য-চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় একটা অস্পষ্ট অনুভূতি। তারপরেও এর কাহিনী এগিয়েছে সুস্পষ্টভাবে – "প্রতিটা যুদ্ধেই এমনটা ঘটে... অস্ত্র থাকার শক্তি।" শব্দ প্রক্ষেপণ কোনোমতে যথেষ্ট এবং নির্মাণে কোনোরকম বাড়তি অলংকরণ নেই। সরাসরি স্পষ্ট উপস্থাপনই এখানে দারুণভাবে কার্যকরী।

ছবিটির উপসংহার টানা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়ে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় রুয়ান্ডার জন্য গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনালে।

যদিও সেখানে মাত্র চারজনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়া হয়েছে, সেটা বিশ্বসভ্যতার এক অভূতপূর্ব বিজয়। ছবিটি দেখা শেষ করার পরে অবলোকন করা প্রতিচ্ছবি এবং উপলব্ধি করা সত্যের মুখোমুখি হয়ে যে কোনো হৃদয়বান দর্শক পেয়ে যাবেন সমাজতত্ত্ব, অপরাধ ও বিচার, মনস্তত্ত্ব ও নারী-বিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা এবং গবেষণার আধারে প্রবেশ করার দরোজা।

ওয়ার বেবিজ – একটি পর্যালোচনা

বিভিন্ন যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীরা এবং এসব জঘন্য কাজের ফসল হিসেবে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুরা তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলে। কানাডীয় দম্পতি কর্তৃক দত্তক নেয়া রায়ান আসে তার জন্মউৎসের দেশ বাংলাদেশে। তার পিতা একজন পাকিস্তানী সেনা যে তার মাকে মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষণ করেছিল। কোরিয়াতে মিসেস চুং তার ৫৫ বছর বয়সী পুত্রের কাছে স্বীকার করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রাজকীয় জাপানী সেনাবাহিনীর ব্রথেলে 'কমফোর্ট উয়োম্যান' হিসেবে কাজ করার সময়ে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। রুয়ান্ডায় সাবেরা তার শিশুকন্যাটিকে আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তোলে; যদিও মেয়েটি ছিল জাতিসত্তা ধ্বংস (জেনোসাইড) ও গণহত্যাকালে গণধর্ষণের ফসল। বসনিয়ার নুসরেতা একটা বন্দীশিবিরে বারবার ধর্ষণের শিকার হওয়ার পরে কোনোমতে গর্ভপাত করতে পেরেছিল। নিকারাগুয়ায় গৃহযুদ্ধকালে যুদ্ধশিশু হেয়লিং, যে মা তাকে বড় করে তোলে সেই মায়ের বেদনাহত স্মৃতি সত্ত্বেও, তার ধর্ষক পিতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে।

সুপরিকল্পিত ধর্ষণের পরে বেঁচে থাকা নারীদের সম্পর্কে প্রথম প্রতিচিত্রই ওয়ার বেবিজ। এখানে দেখানো হয়েছে যে সভ্যতাকে আবশ্যিকভাবে যেতে হবে আরো কতদূর। আর শেষ পর্যন্ত কতদূর পর্যন্ত গিয়েছি আমরা। এখানে দেখানো হয়েছে যুদ্ধোত্তর অবস্থা। আমাদেরকে বিবেচনা করতেই হবে যে এটাই যুদ্ধের সবচেয়ে চরম কষ্টের অধ্যায়। ঘৃণা এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুরা এবং তাদের মায়েরা 'এখনো শয়তান বিদ্যমান'-এর জীবন্ত প্রমাণ। যুদ্ধকালে ধর্ষণ একটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পরে, আশা করা যায় যে, এখন এ ধরণের চলচ্চিত্র আরো বেশি করে নির্মিত হবে।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

১১. সীয়ানা পাসিক : ব্যাক টু বসনিয়া

শৈশবে সারায়েভোতে বেড়ে ওঠার সময়ে সে যুদ্ধাক্রান্ত শহরের জীবনধারা সম্বলিত পত্রিকা সংগ্রহ করে রাখতো। তার আশায় ছিল যে সে যদি মরেও যায়, এসব পত্রিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।

গত ২০০৩ সালের নভেম্বরে সীয়ানা পাসিক (বর্তমানে, ২০০৪ সালে, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রী) ওয়ার বেবিজ চলচ্চিত্রটির ওপরে তার গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ, চলচ্চিত্রটির নির্মাতা রেমন্ড প্রভেনশার এবং ক্যাথারিন হেবার্টের সঙ্গে, যৌথভাবে লাভ করেছে জেমিনি পুরস্কার। বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, বসনিয়া, কোরিয়া এবং নিকারাগুয়ায় যুদ্ধকালে ধর্ষিত নারীদের কাহিনীতে বোনা চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রক্ষেপণের জন্য পুরস্কার লাভ করে।

১৫ বছর বয়সে সে তার মা ও ভাইয়ের সঙ্গে মন্ট্রিয়লে অভিবাসীয় হয়। ২০ বছর বয়স হওয়ার মধ্যেই সে শিখে নেয় ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশ ভাষা। তখন সে ডসন কলেজের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী। পাসিক ছিল প্রথমত একজন সঙ্গীতশিল্পী। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সকালে সে মেয়েদের কয়েরে সপ্তাহে তিনবার গান গাইতো। 'সঙ্গীত জীবনকে আমার কাছে অর্থবহ করে তোলে,' সে বলে। ক্যাফে সারায়েভোতে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে কাজ করার সময়ে রেডিও কানাডার 'লেস এনফ্যান্ট ডে লা গেরে' অনুষ্ঠানটির নির্মাতার চোখে পড়ে সীয়ানা। বসনিয়া ভ্রমণ এবং সেখানে বেঁচে যাওয়া কয়েকটি শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়ার কারণে তার শৈশবের সেই অভিজ্ঞতা তাকে তথ্যচলচ্চিত্রের একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় করে তোলে।

ওয়ার বেবিজ চলচ্চিত্রের পরিচালক রেমন্ড প্রভেনশার যখন জানতে পারল যে পাসিক বসনিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, দেরি না করে দ্রুত যোগাযোগ করে

সীয়ানা পাসিক

তার সঙ্গে। ইতোমধ্যেই প্রভেনশার দু'বার সেখানে গিয়েও যুদ্ধে ধর্ষিত কোনো নারীকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় যে তার নিজের দুঃসহ অভিজ্ঞতা বলতে ইচ্ছুক। অতএব ২০০১ সালের গ্রীষ্মে বসনিয়াতে গিয়ে পাসিক দুটি তথ্য-চলচ্চিত্রের জন্য দুটি গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হল।

'লেস এনফ্যান্ট ডে লা গেরে'-র বিষয়বস্তু ছিল যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বড় হওয়া শিশুরা বিশেষভাবে স্থিতিস্থাপক এবং বেশি সামর্থ্যবান। কিন্তু এটা পাসিকের কাছে পুরোপুরিভাবে সঠিক মনে হয়না। সে বলে যে, তারা বেশি শক্তিশালী কিন্তু যে দেশ এখনো যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ততা কাটিয়ে উঠছে সেখানে উন্নতি করতে অপারগ। 'এসব শিশুদের চুল একরাতেই ধূসর হয়ে যায়।'

প্রভেনশারের প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহ, একটি বন্দী শিবির এবং একটি সম্মেলনের কাছে যায় পাসিক। ওই সম্মেলনে ধর্ষণের শিকার হওয়া একদল নারী একটি আবেদনপত্র সংঘটিত করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সার্ব কর্তৃক বন্দী নারীদের ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃত করানোর আহ্বান জানানো। সেখানে নারীদের প্রতি সে সরাসরি একটি আবেদন রাখল: যুদ্ধকালের ধর্ষণের ওপরে যদি কোনো তথ্য-চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, এবং সেখানে বসনিয়ার কথা উল্লেখিত নাহয়, তাহলে যে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে কারা তা অস্বীকারের পালা চলতেই থাকবে, এবং অপরাধীরাই সম্ভবত জয়ী হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত একজন নারী, নাম গোপন রাখার শর্তে, তার কাহিনি প্রকাশের জন্য সম্মত হল। সে এবং তার ১৭ বছর বয়সী কন্যাকে ভিসেগ্রাদে আটক করা হয়। এরপরে তাদেরকে বন্দী করে একটি হোটেলে রেখে দেয় সার্বীয় সৈন্যরা। মেয়েকে ঘুমের বড়ি দিয়ে কিছু কিছু বাজে অভিজ্ঞতা থেকে বাঁচিয়েছিল সেই মা।

ওয়ার বেবিজে বর্ণিত কাহিনিগুলো ভয়ঙ্কর। যে কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে সাধারণ দর্শকেরা এসব দেখে স্থির হয়ে যাবে নাকি মনোযোগ দিয়ে শুনতেই থাকবে। পাসিক বলে, "কিন্তু আমরা যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি তারা খুবই সাহসী! আমার কাছে এটা বেশ আশাব্যঞ্জক। চলচ্চিত্রটিতে কাজ করা সবাই ছিল আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত। সেটাই ছিল সামনে এগিয়ে চলায় আমাদের

শক্তি। আপনারা দেখুন যে এসব নারী যারা ধর্ষিত হয়েছে এবং হারিয়েছে নিজ নিজ পরিবার, তারা সবাই এখনো জীবন চালিয়ে যাচ্ছে।"

চলচ্চিত্রটির নির্মাণকর্মীদের ফেরার দু'সপ্তাহ আগেই অক্টোবরে বসনিয়ায় ফিরে আসে পাসিক এবং শুটিংয়ের জন্য পাঁচদিন থেকে যায়। সে প্রয়োজনীয় অনুবাদ করেছে, লোকেশন স্থির করেছে এবং এমনকি ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরায় উপস্থাপনাতেও অংশ নিয়েছে। একাজগুলো খুব দ্রুতবেগে সারতে হয়েছে, কারণ বিসেগ্রাদের যে দালানে শুটিং করা হয়েছিল সেটা দখল করে রেখেছিল সার্বীয় শরণার্থীরা। সে বলে, "ধরা না পড়ার জন্যই আমাদেরকে যথাসম্ভব দ্রুত কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছে।"

আলোচ্য চরিত্রটি যে হোটেলে ধর্ষিত হয়েছিল সেই সার্বীয় হোটেলের মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলচ্চিত্রের ক্রু-দল। সে ছিল কিছুটা দুর্বলচিত্তের। তবে, যেমনটা ভাবা হয়েছিল তেমনিভাবেই, ক্রুদের প্রতি সে ছিল শত্রুভাবাপন্ন। পাসিক এবং প্রভেনশার তাকে ব্যস্ত রেখেছে এবং সেই ফাঁকে ক্যামেরাম্যান দালানটির যত বেশি সম্ভব ততটা ছবি ধারণ করে নেয়।

যুদ্ধের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জবানবন্দী শোনার তুলনায়, পাসিকের মনে হয় যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষন শোনাটা বেশি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। গত সেমিস্টারে তার পাসিকের কোর্স ছিল বসনিয়ার ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে। যুদ্ধকে ঘিরে সংশয়াগ্রস্ত চিন্তাচেতনা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নির্লিপ্ততা ছিল হৃদয় বিদারক।

"মানুষেরা যখন বলতো যে এটা একটা ধর্মীয় যুদ্ধ, সেটা হতো এক হাস্যকর কথা। আমি একজন মুসলিম এবং আমি খ্রিষ্টার চার্চে গিয়ে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় গান গেয়েছি; একইসঙ্গে গেয়েছি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সঙ্গীত। আমরা কোনো পার্থক্য করিনি।"

"আমি ভেবেছিলাম যে সবাই যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এখন, একটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিতে, আপনারা দেখুন যে সেটা কখনোই বিবেচিত হয়নি। এটা খুবই বেদনাদায়ক যে কীভাবে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।"

যদিও পাসিক একজন প্রতিভাময়ী সঙ্গীতশিল্পী, নারী ও শিশুদের অধিকারে মনোনিবেশ করা এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে কাজ করার দীর্ঘদিনের লালিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে লেখাপড়া করে আন্তর্জাতিক আইনে। শৈশবে সংগ্রহ করা সেইসব পত্রিকাগুলো প্রকাশ করার ইচ্ছ পোষণ করে পাসিক। শৈশবে সে জীবনের কিছু কিছু বিষয় এত শান্তচিত্তে প্রকাশ করেছে যে এখন মনে হয় সেটা ছিল অবিশ্বাস্য।

যেভাবে সে গণহত্যার সংবাদ সংরক্ষণ করতো, তার বাবা-মা তাকে কয়ের প্রস্তুতিতে অংশ নেয়ায় বিরত করতোনা। রিহার্সাল প্রস্তুতির স্থানটিতে পৌঁছতে সাধারণত সময় লাগে বিশ মিনিট; কিন্তু যুদ্ধকালে ছোটদেরকে সরুপথ এড়িয়ে চলার জন্য লাগতো এক ঘণ্টা। "অনেকবার আমি একটা কোণ অতিক্রম করে গেছি, যেখানে পাঁচ মিনিট পরে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে!"

বসনিয়ার মেয়ে সীয়ানা পাসিক বসবাস করে কানাডার মন্ট্রিয়লে।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

১২. বসনীয় যুদ্ধশিশুদের মনে সুপ্ত প্রশ্ন

অনেকদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়া মায়ের দিকে এগিয়ে আসা একটি ছেলের বেঁচে থাকার চিহ্ন ছিল সেটা। যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিধ্বস্ত একটা দেশে, এক দশকেরও আগে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছে ক্ষতের গভীরে। 'আমার মাকে শুভেচ্ছা... ইতি, তোমার ছেলে রেডে। ছবিসহ জরাজীর্ণ কাগজে লেখা চিঠিটা পড়ল মা। ১৩ বছর বয়সী রেডেকে কখনোই বলা হয়নি যে তার বসনীয় মা, মাত্র ১৫ বছর বয়সে বারবার এক সার্ব সেনা কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। পরে সেই সেনাই ছেলেটিকে লালন-পালনে উদ্যোগী হতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ইউরোপের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার দশ বছর পরে বর্তমানে এখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং ঘটনা পরিক্রমায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ। জাতিগত অবিশ্বাস থাকার পরেও, সার্ব, ক্রোট এবং বসনীয় মুসলিমরা এখন একটা ফেডারেল সরকারে সহযোগিতা করছে।

কিন্তু রেডের মতো শিশুদের জন্য যুদ্ধ এখনো থেমে যায়নি। এসব যুদ্ধশিশুরা বয়ঃসন্ধীকালে পৌঁছানোর পরে এখন তারা তাদের অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করেছে। আর উত্তর নিয়ে যারা আছেন তারা মুখোমুখি এক বৈপরীত্যের সামনে– ওইসব কিশোর-কিশোরীদেরকে অন্ধকারেই রেখে দিবে নাকি বলে দিবে মর্মান্তিক সত্যকথা।

"মা এখন অস্ট্রিয়ায়। ভালভাবে বিবাহিত এবং শিশুটির জন্য তার আর কিছুই চাইনা," বলেন সমাজকর্মী বাকিরা হাসেকিক। বাকিরা বসনীয় যুদ্ধের একজন ধর্ষিতা যে এখন অন্যদেরকে ভয়াবহতা থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছে।

যে মা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে অবিকল সেই মায়ের মতো চেহারার রেডে বড় হয়েছে সার্বীয় গ্রাম আরিয়েলিতে। তাকে বলা হয়েছিল যে তার মা তাকে জন্ম দেয়ার পরে সীমান্ত থেকে বসনিয়ার দিকে ১৩ কিলোমিটার ভেতরে চলে গিয়েছে। সেখানেই সে তার চিঠিটা পাঠিয়েছে।

হাসেকিক বলেন, "চিঠিটা খোলার পরে তার নানী দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত!" হাসেকিকের নিজের বোনকেও প্রাণ দিতে হয়েছে সার্বীয় ধর্ষণ ক্যাম্পে। "ছেলেটা আসবে জেনে উত্তেজনায় মায়ের সাহস কমে আসছিল। কিন্তু তারপরে...; ছেলেটাকে জানতে হবে সমগ্র সত্যি কথা। ঘৃণার মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশু সে!"

সার্ব এবং ক্রোট মেয়েরা যখন ধর্ষিত হচ্ছিল, বসনীয় মুসলিমরা ছিল মূল শিকার। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে শেষ হওয়া আড়াই বছরের যুদ্ধে ধর্ষিত হয়েছে ২০ হাজার মুসলিম মেয়ে। একই সময়ে হারিয়ে গেছে বা নিহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। দশ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ছাড়তে হয়েছে নিজ ঘরবাড়ি।

বেশিরভাগ অপরাধীরাই ছিল সার্ব, যারা সন্ত্রাসের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে 'গণধর্ষণ'।

অসংখ্য মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এবং তাদের ওপরে বারবার পরিচালিত হয়েছে ধর্ষণের অত্যাচার। কাউকে কাউকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে স্বামীদের সামনে ফেলে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বহু মেয়েকে তাদের নিজ নিজ স্বামীদের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে শুধুমাত্র মানসিকভাবে অত্যাচার করার জন্য।

ওই সুপরিকল্পিত ধর্ষণের পথ ধরেই, বসনীয় সংঘর্ষে হত্যা-সন্ত্রাসে অভিযুক্তদেরকে বিচারের মুখোমুখি করেছে জাতিসংঘের ওয়ার-ক্রাইমস ট্রাইবুনাল। পাশাপাশি স্বীকৃত হয়েছে যে ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তার প্রেক্ষিতে পরিচালিত ওই গণধর্ষণ ছিল এক জঘন্য যুদ্ধাপরাধ; যা সংঘটিত হয়েছিল সার্বদের 'বিধর্মী পরিষ্কারকরণ' অভিযানের অংশ হিসেবে!

গুপ্ত/গোপনীয় জনসংখ্যা

সম্প্রতি সমাপ্ত ইউনিসেফের এক খসড়া প্রতিবেদন দৃষ্টিপাত করেছে বসনিয়ার যুদ্ধশিশুদের ওপরে। অসমর্থিত প্রমাণের দেখা যায় যে অনেক যুদ্ধশিশুদেরকেই জন্মের পরপরই মেরে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে আরো পাওয়া যায় যে অজ্ঞাত সংখ্যক বেঁচে থাকা শিশুরা বর্তমানে 'গুপ্ত জনসংখ্যা এবং বিশেষভাবে নাজুক'।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এসব শিশুদের অনেকেই কৈশোরে পদার্পণ করার পর এখনও বিবেচিত হয় অবাঞ্ছিত হিসেবে এবং বসবাস করছে রাষ্ট্র-পরিচলিত আশ্রয়-কেন্দ্রে।

জন্ম-উৎস প্রকাশিত হয়ে গেলে, নিজ পরিবারে বসবাস করা শিশুরা তাদের বাড়ি-কেন্দ্রিক সম্প্রদায়ের কাছে 'অযাচিত বা একঘরে' হয়ে পড়ে। পিতার জন্য

নিজের মাকে যে ঘৃণা বা অপবাদ পোহাতে হয় তা দেখে নিজেরাও ভোগে মানসিক যন্ত্রণায়।

ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, একটি পরিবার তাদের ঘরের মেয়ের যুদ্ধশিশুটিকে শিখিয়েছে যে তার অস্তিত্বটি একটি ভুল এবং জোর করে অতিথিদের কাছে বলতে বাধ্য করেছে যে সে তার মায়ের লজ্জার ফসল।

দত্তক নেয়া বেশিরভাগ মানুষই 'যুদ্ধের পিতা' বা হারিয়ে যাওয়া মা সম্পর্কে কাহিনী বানিয়ে থাকে। ইউনিসেফের খসড়া প্রতিবেদন বলে, "যতক্ষণ তাদের জন্ম গোপন থাকে, সেসব শিশুরা সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে। অবহেলা বা সংস্পর্শ বা বৈষম্যমূলক কোনো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়না সে।"

কিন্তু কোনো কোনো সময়ে বাবামা-রা অনুভব করে যে অন্যের কাছ থেকে চরম সত্য জানার চেয়ে নিজেদের মুখ দিয়ে তাকে জানানোটা কঠিনতর।

সোসাইটি অব থ্রেটেন্ড পিপলের বসনিয়া শাখার প্রধান ফাদিলা মেমিসেভিক বলেন, "আমি জানি যে একটি মেয়ে 'কে আমার বাবা?' বলা শুরু করেছে।"

"তার মা বলে, 'সে ছিল এক বীর যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল'; কিন্তু মেয়েটি এরকম উত্তর গ্রহণ করতে রাজি নয়। বিস্ময়করভাবে সে সন্ধান করছে তার মূল উৎস।

গোরাজে-র এক মুসলিম পরিবারে দত্তকায়িত ১২ বছর বয়সী বালক অ্যালেন মিউহিক 'সে একজন যুদ্ধের ফসল' এটা জানার পরের বেদনাটা ভালভাবেই কাটিয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

২০০৪ সালে তার কাহিনী নিয়ে নির্মিত তথ্য-চলচ্চিত্র 'এ বয় ফ্রম এ ওয়ার মুভি'-তে দেখানো হয়েছে যে সে খুশিমনে খেলছে তার স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে। (কৌতুকচ্ছলে) ঝগড়া করছে দত্তক-পিতার সঙ্গে। বসবাস করছে বাড়িতে অন্য দুজন দত্তক শিশুর সঙ্গে।

নয় বছর বয়সে, "একটি ছেলে আমাকে বলেছে যে আমি দত্তকায়িত। পরিবারটি আমার নয়।" ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলে মিউহিক; ঠোঁটের কোণে শুকনো হাসি। "তক্ষুণি আমি দৌড়ে যাই বাবার কাছে এবং প্রশ্ন করি এই ঘটনা সম্পর্কে। আমাকে কোলে নিয়ে তিনি বলেন যে কে আমার মা এবং কীভাবে আমার জন্ম হয়েছে।"

শহরের কিছু অধিবাসী যখন তাকে, তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত একটা প্রচলিত সার্ব নাম, 'পেরো' বলে ডাকে, মিউহিকের তখনকার মনের বেদনাটি প্রকাশিত হয়নি ওই তথ্য-চলচ্চিত্রে।

পারিবারিক সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ করে ইউনিসেফ বলে যে, স্কুলে উত্ত্যক্ত করার ফলে আত্মহত্যা-প্রয়াসের একটি কষ্টের পর্ব পার করে অ্যালেন। এরপরে কিছু সময়ের জন্য সে তার জন্মদাত্রী মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করে মরিয়া হয়ে। কিন্তু সেই মা তার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দেয় ক্রোধভরে। অ্যালেনের দত্তক মা আদিভা মিউহিক অ্যালেনের কাছে চরম সত্য বলার সময়ের কঠিন পরিস্থিতির কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে এপির সংবাদকর্মীদের কাছে।

"এরপরে আমরা যেন প্রবেশ করি নরকে," কাঁদতে কাঁদতে বলে আদিভা। রাগে-দুঃখে সে জ্বলে ওঠে। অনেকদিন ধরে সে চিৎকার করে কথা বলে এবং কাঁদে, 'কেন তোমরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ? কেন আমাকে মিথ্যা বলে এসেছ?' তারস্বরে, দত্তক মায়ের পেট দেখিয়ে বলে, 'তুমি বলেছ যে তুমি ওখানে আমাকে ধারণ করেছ!'

[লেখক কর্তৃক সংকলিত এবং সম্পাদিত]

১৩. যুদ্ধশিশু বিষয়ক সঙ্গীত

১. ওয়ার বেবী
শিল্পী: মাইক জ্যাগার
অ্যালবাম: প্রিমিটিভ কুল

আমি জন্মেছিলাম এক যুদ্ধে
আর তাই তারা আমাকে ডাকে যুদ্ধশিশু
আর এটা আমাকে যুদ্ধান্ধ করে তোলে না
আর বন্দুক শুরু করে চিৎকার
আর সড়ক ছাপিয়ে যখন বয়ে যায় বহ্নিশিখা
উন্মত্ত।

কেন আমরা একসঙ্গে পথ চলতে পারি না
পারি না রাখতে আমাদের সন্তানদের নিরাপদে।

যুদ্ধ – যুদ্ধশিশু

আর যুদ্ধ আমাদেরকে করেছে দরিদ্র
আমাদের ভবিষ্যতকে করেছে অনিশ্চিত
আবছা।

কেন আমরা এই দৌড় দিইনা একসঙ্গে
রাখি আমাদের সন্তানদের নিরাপদে

তবে অস্ত্রের দৌড় চলছেই
আর সড়কে গড়িয়ে চলে ট্যাংক
সবগুলো অস্ত্রের সঙ্গীন অবস্থান

আমরা যখন অপেক্ষায় ওই চিৎকারের
অস্ত্রের, অস্ত্রের...

কামানগুলো শুরু করে বর্ষণ
জাহাজ থেকে মাটির পানে
আর বোমাগুলো পড়তে থাকে
যখন আমরা হামা দিতে থাকি হলের পানে
যখন তারা নিয়ম ভেঙে ফেটে পড়ে
ওমাহা সৈকতের ওপরে

কেন আমরা একসঙ্গে এই পথে দৌড়াইনা
কেন আমরা একটা নিরাময় আশা করতে পারিনা

তবু চলে অস্ত্রের ঝনঝনানি
আর সড়কে গড়িয়ে চলে ট্যাংক
সবগুলো অস্ত্রের সঙ্গীন অবস্থান
আমরা যখন অপেক্ষায় ওই চিৎকারের
সৈন্যরা গুলি করতেই থাকে
নৌ-সেনারা সাগরণে চলে যায়
আমরা দ্রুত পালাতে থাকি
আমরা অপেক্ষায় থাকি ওই চিৎকারের
অস্ত্রের, অস্ত্রের...

যুদ্ধ – যুদ্ধশিশু।

২. ওয়ার বেবিজ

ব্যান্ডদল : সিম্পল মাইন্ডস

দেখ গড়িয়ে যায় সাদা মেঘ
অনুভূতি পড়ে থাকে আমার সামনে
পড়ন্ত বুনোফুলগুলোকে ধর
এ এমন এক ক্ষত যা কখনো রক্ত ঝরায় না
শোনো সাইরেনের আহ্বান
তাদের প্রদর্শনী ঘুরছে আর ঘুরছে
থাম – আমার খুব কাছে একটি মুহূর্ত
খুব ধীরে ধরে নামাও এটা

আমার হও, আমার হও, ও যুদ্ধশিশু
আমার হও, আমার হও, ও যুদ্ধশিশু

তুমি কি এখনো চলতে পার?
ভাঙাচুড়ো টুকরোগুলোকে পাশে ফেলে
চূড়ান্ত পর্বের মুখোমুখি হতে, জেনে যে
কিছু একটা আছে যা তুমি লুকোতে পারবে না।

আমার হও, আমার হও, ও যুদ্ধশিশু
আমার হও, আমার হও, ও যুদ্ধশিশু

অতএব সৈন্যরা কি চলে যেতে দিবে?
নাকি থেকে যাবে প্রেতাত্মা?
ভবিষ্যতবেত্তা হোক তোমার দৃষ্টি
মনে হয় আজ কিছু একটা ঘটবে

কিছু লজ্জার কোনো তুলনা নেই
আর কোনোকিছুই এরকম অনুভূত হয় না
কোনোকিছুই এরকম অনুভূত হয় না

ও যুদ্ধশিশু
আমার হও, আমার হও, ও যুদ্ধশিশু
কোনোকিছুই এরকম অনুভূত হয় না
ও যুদ্ধশিশু
ও যুদ্ধশিশু
কোনোকিছুই এরকম অনুভূত হয় না
আমার হও
আমার হও
ও যুদ্ধশিশু

৩. ওয়ার বেবি – সান অব জোরো

ব্যান্ডদল: হল অ্যান্ড ওটস
অ্যালবাম: ওয়ার বেবিজ

সে এক যুদ্ধশিশু, জোরোর পুত্র
সে এক যুদ্ধশিশু, জোরোর পুত্র
যুদ্ধশিশু
পার করেছে চড়াই-উৎরাই আর বোমা
সে নিজেই এক যুদ্ধ, সে নিজেই এক যুদ্ধ
সে নিজেই এক যুদ্ধ
সে এক যুদ্ধশিশু
সে এক ঘৃণ্য শিশু, জন্মেছে '৪৫-এ
সে এক ছিন্নভিন্ন শিশু, তবু বেঁচে আছে এখনো
ভীত শিশু, এখনো কি আণবিক-কাল?
যুদ্ধশিশু
পানির বরফ, সোজাসাপ্টা যুদ্ধ, স্বৈরাচারী, আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি
দেবদূত চোখ, হ্যাঁ, আমি জানি
সে এক পবিত্র শিশু, ভয় পায় বিমানকে
শত আকাশ-আক্রমণকালে সে লুকোয় ডেস্কের নীচে, পবিত্র শিশু
গর্ত খোঁড়ে আবর্জনায়, আণবিক যুগে
সে এক যুদ্ধশিশু, জোরোর পুত্র

সে এক যুদ্ধশিশু, জোরোর পুত্র
যুদ্ধশিশু
মা, বোমা আর আবেগের মাঝ দিয়ে চলে সে
সে এক যুদ্ধ, সে এক যুদ্ধ
সে এক যুদ্ধ
সে এক যুদ্ধশিশু
সে এক যুদ্ধ, সে এক যুদ্ধশিশু
সে এক যুদ্ধ, এক যুদ্ধশিশু।

৪. ইলেকট্রিক স্প্যাংকিং অব ওয়ার বেবিজ
শিল্পী : জর্জ ক্লিনটন

এই যে ভাই, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলছ? কী নিয়ে?
সম্ভবত তুমি আমাকে চেননা, ঠিক না? [না, আমি তোমাকে চিনি না।]
আহ্-হা, তবে আমি তোমাকে চিনি [সেটা কী? আমি চিনি না?]
আমি, আমার সতের বছর বয়সে
দত্তক নিয়েছিল অজানা মানুষ
[হাঃ হাঃ হাঃ]
দত্তক নিয়েছিল অজানা মানুষ
[হাঃ হাঃ হাঃ হায় ঈশ্বর]
সেটাই ঠিক, আমি বলেছি যে
অজানা আগন্তুক [আহ্]
এই বার্তা নিয়ে ফিরে যাবার জন্য
আমাকে প্রোগ্রাম করার পরে
অনেক সময় পেরিয়েছে।

যখন তুমি নাচতে শেখ
তুমি ভুলবে না কখনো
উউহ, তুমি যদি নাচতে চাও
তুমি ভুলবে না কখনো
যখন তুমি নাচতে শেখ
তুমি ভুলবে না কখনো

তুমি আমার জুতোয় হাঁটতে পার এক মাইল
কিন্তু তুমি আমার পায়ে একটি ধাপও নাচতে পারবে না

একবার সুযোগ নিতে পার
নাচতে পার... উ..উ..হ

খোঁজ করাটা কষ্টের (পথের পানে আঘাত কর)
কারণ তোমার মন (পথের পানে আঘাত কর)
আর তোমার পেছনটা (পথের পানে আঘাত কর)
পেয়ে যায় চমৎকার সময়।

পথের পানে আঘাত কর
পারলে মেরেও ফেল

আমরা হিসাব করি একটা সঠিক বাজের অনুভূতির?

আমার জুতো পরে হাঁটতে পার এক মাইল
কিন্তু কিছুতেই নাচতে পার না আমার ছন্দে!

খোঁজ করাটা লজ্জার
কারণ তোমার মন
আর তোমার পেছনটা
সঠিক সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায়।

যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক

আহা! খোঁজ করাটা লজ্জার
কারণ তোমার মন
আর তোমার পেছনটা (বৈদ্যুতিক)
সঠিক সময়ে হয়ে যাবে পরিষ্কার (যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক)

তুমিতো বোমাটা দেখেছ (বৈদ্যুতিক)
ভিয়েতনাম (সঠিক বিদ্যুৎ-চমক)
এলএসডি (যুদ্ধশিশু)
তুমিতো দেখেছ যে...?
তুমিতো দেখেছ ডিএনএ

তাদেরকে চাঁদের পানে যেতে দেখ
সরাসরি টেলিভিশনে।

পথের ’পরে ধাক্কা দাও
আমরা একটা সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করব।
ডিজিটাল?
আমরা একটা সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করব

তুমি নাচতে পার... উ..উ..হ

আহা! খোঁজ করাটা লজ্জার
কারণ তোমার মন
আর তোমার পেছনটা (বৈদ্যুতিক)
সঠিক সময়ে হয়ে যাবে পরিষ্কার (যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক)

পথের ’পরে ধাক্কা দাও

তুমিতো বোমাটা দেখেছ
ভিয়েতনাম
এলএসডি
তুমিতো দেখেছ
তুমিতো দেখেছ ডিএনএ
তাদেরকে চাঁদের পানে যেতে দেখ
সরাসরি টেলিভিশনে।

যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক

পথের ’পরে ধাক্কা দাও
মৃত, নাকি আসক্তি?
আমরা একটা সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করব।
যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক

আমরা একটা সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করব।
আমরা একটা সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করব।

যুদ্ধশিশুর সঠিক বিদ্যুৎ-চমক।

৫. ওয়ার বেবি
ব্যান্ডদল : ডেড মুন

অসৎ হৃদয় থেকে উৎসারিত
পরাজয়ের যুদ্ধবাজ অস্ত্র
পরাজিত সৈন্যরা মার্চ করে
রাত থেকে বেরিয়ে, ভোরের পানে

যুদ্ধশিশু
এই যে তুমি, চেহারা নেই, নেই কোনো আকার
তোমার যুদ্ধে কে আমাদেরকে লিপ্ত হতে বলে
কত সহজে দেখা যায় অদৃশ্য
বিশ্বাস করি যে কিছু একটাতো পেয়েছি
যুদ্ধশিশু

তোমরা ধর্ষণ করেছ এবং আক্রমণ করেছ, আমাদের এড়িয়ে
কখন থামবে তোমরা?

তোমরা গড়েছ আমাদেরকে, রক্ষা করেছ আমাদের
তোমাদের কলম দিয়ে হত্যা করেছ আমাদের চিন্তাকে
অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রশিক্ষিত করেছ
ফিসফিসিয়ে বলেছ আমরা অনেক ছোট
যুদ্ধশিশু

৬. ওয়ার চাইল্ড
ব্যান্ডদল : ব্লন্ডি

শহরের আলো আমি চাই
সুরক্ষা এবং অস্ত্রশালা
জানার কোনো পন্থা নেই
আমার জীবনের স্থায়িত্বকাল

আমি শিখি প্রতিরোধ
যেভাবে আমি শিখি দেখতে
একটা জীবন্ত সাক্ষী
একটা একাকী শরণার্থী
আমি এক যুদ্ধশিশু
আমি এক যুদ্ধশিশু
আর সেটাই পার্থক্য
তোমার আর আমার মাঝে
আমি এক যুদ্ধশিশু

আমার পেশা
এ মুহূর্তে দখল হয়ে আছে
এককোণে আমি থেমে আছি
শনাক্ত হওয়ার জন্য

সীমান্ত জুড়ে
তারা বিজয়ের অভিনয় করছে
আমি খেলছি আবর্জনার মাঝে
আর স্বপ্ন দেখছি গন্তব্যের

আমি এক যুদ্ধশিশু
আমি এক যুদ্ধশিশু
আর সেটাই পার্থক্য
তোমার আর আমার মধ্যে
আমি এক যুদ্ধশিশু

খেমার রুজ তোমাকে আবিষ্কার করতে পারেনি
রাতের সংবাদে আমরা শুনতে পাই সমস্যার কথা
পিএলও-প্রেমিকরা কারফিউয়ের পরে বিচার চায়
তোমার বাবা-ভাইদের রয়েছে ওয়েস্ট ব্যাংক ব্লুজ।

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত]

১৪. যুদ্ধশিশু বিষয়ক কবিতা

কানাডায় দত্তক হিসেবে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু রায়ান বাদল গুড স্মরণে বাংলাদেশের 'দৈনিক মানবজমিন' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁকে স্মরণ করে সমস্ত যুদ্ধশিশুকে নিয়ে এনওয়াই বাংলা ডট কমের 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক প্রকাশনার জন্য এ কবিতা। উল্লেখ্য, যুদ্ধ শিশু রায়ান গুড ৩০.১২.৯৭ সালে কানাডা থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিল।

যুদ্ধশিশু
জাকির

এই ভূপৃষ্ঠে আগমন
এই প্রকৃতি, শান্ত সকাল
সূর্যের ঘুম ভাঙ্গা, পর্বতের তুহিন
সে ইচ্ছে করে দেখেনি।
এই নিষ্ঠুর নিয়মে আসবে সে ভাবতে পারেনি
প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর দায়ে দণ্ডিত করে
সৈনিক পালিয়ে যায়।
কুরুক্ষেত্র নির্বাক
সময়কে পালা করে অঙ্কুরিত হয় সে মাতৃগর্ভে
যন্ত্রণার গ্লানি আর ঘৃণায় আত্মহত্যা করে গ্লা
প্রসূতি, হয়ত কখনো ফিরে আসেনি লোকালয়ে
স্বাধীন ভূমি তাকে করেছে অস্পশ্যা
অথচ তার অংশগ্রহণকে
স্বীকার করলো না আজও
তাকে পুনর্বাসন না করে, দেয়া হল নির্বাসন
তাও, কোন এক নিষিদ্ধ পল্লীতে
তার মৃত্যু হয়েছিল, প্রায় দুই যুগ আগে।
আর বেঁচে গেল একটি রাষ্ট্র, তার জাতি এবং কৃষ্টি
যে মৃত্যু দিয়ে গেল জীবন
তাকে খুঁজলো না কেউ রণাঙ্গনে

কিন্তু আজও কি পেরেছি দিতে?
তার কুসুম কলিকে
একটু স্নেহ, একটু আশ্রয়
অতঃপর !
বিশাল পৃথিবীতে পেয়েছে সে
বাঁচার নিশ্চয়তা
অথচ, যে মাটিতে তার জন্ম
যেখানটায় রয়েছে তার নাড়ীর সম্পর্ক
যে মাতৃত্বের বন্ধনে সঁপে দিতে
ব্যাকুল হয়ে ফিরে আসে বারে বারে,
যে স্বাধীনতা এনেছে তাকে
সেখানে সে কেবলি আগন্তুক
তথাপি,
তার আনন্দ
প্রতিদিনের গর্ব
সুপ্ত অহংকার
সে কেবলি এ বাংলার।

১৫. যুদ্ধশিশু বিষয়ক সংবাদ

১.

১৯৭৫ : যুক্তরাজ্যে নামল 'অপারেশন বেবি-লিফট'

৯৯ জন ভিয়েতনামি অনাথ শিশুকে নিয়ে হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে একটি বিমান। ব্রিটিশ ডেইলি মেইল সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ভাড়া করেছিল ওই বোয়িং ৭৪৭। সম্পাদক ডেভিড ইংলিশ মার্কিন অপারেশন বেবি-লিফটের মাধ্যমে প্রেরণ পেয়েছিলেন। শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মাত্র কয়েক মাস বয়সী! সায়গন থেকে ১৮ ঘণ্টার ফ্লাইটে ওই শিশুদের সঙ্গী ছিল ব্রিটিশ চিকিৎসক ও নার্স। অন্তত ৩০টি শিশু ভুগছিল নিউমোনিয়ায়। হিথরোয় পৌঁছেই ৬ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

সায়গনে সাহায্য সংস্থা পরিচালিত ওকেনডেন ভেঞ্চার নামের অনাথ-আশ্রমে ছিল এসব শিশু। যুক্তরাজ্যে এসব শিশুদের দেখাশোনা করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল ফর এইড ফর রিফিউজিস। সারা ব্রিটেন থেকে অসংখ্য ফোনকল আসছে এসব শিশুকে দত্তক হিসেবে নিতে আগ্রহী মানুষদের কাছ থেকে।

অন্যদিকে, সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক মোরলি ফ্লেচার উচ্চারণ করেছেন এক সাবধানবানী। "এরা প্রকৃতপক্ষেই অনাথ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা হতে পারে।" তিনি আরো বলেন, পরিস্থিতির উন্নতি হলে কিছু শিশুকে সায়গনে ফেরত পাঠানোই হতে পারে তাদের জন্য উত্তম।

ওই প্রচার-চমকের কারণে ডেইলি মেইলের উদ্যোগটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। রেডক্রসের মতো শীর্ষস্থানীয় সাহায্য সংস্থা মন্তব্য করেছে যে, এখানে (যুক্তরাজ্যে) এসব শিশুদের জন্য দেয়া সুযোগ-সুবিধা অপর্যাপ্ত; তাদেরকে তাদের নিজদেশেই সাহায্য দেয়া শ্রেয় ছিল।

ওই ডেইলি মেইল ফ্লাইটে দুজন ছিল গত সপ্তাহে সায়গনের কাছে ভূপাতিত মার্কিন বিমানের দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শিশু। চলমান অবস্থায় দরোজা খুলে পড়ে

যাওয়ার কারণে, মার্কিন বিমান বাহিনীর বিমানটি জরুরি অবতরণ করলে আঘাতে মৃত্যু হয় ১৫০জন অনাথ এবং ২৮ জন বয়স্ক মানুষের। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন বাহিনীর প্রস্থানের প্রস্তুতিকালে ২,০০০ অনাথ শিশুদের মধ্যেই ছিল এই নিহত হতভাগ্য শিশুরা।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড বলেছেন যে, তিনি ভীত এই ভেবে – পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য বিজয়ী কম্যুনিস্ট ভিয়েতকংদের কোনো সহানুভূতি নাও থাকতে পারে। বিশেষত যেসব শিশু জন্মেছে মার্কিন সেনাদের ঔরসে।

অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডাও ভিয়েতনামি অনাথ শিশুদের উদ্বাসনে (এভ্যাকুয়েশন) উদ্যোগী হয়েছে।

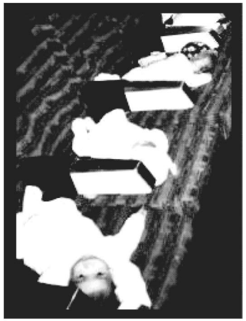

অপারেশন বেবি-লিফট
আকাশপথে চলেছে যুদ্ধশিশুরা
দূর পরবাসে...

২. নাজি উত্তরাধিকার – জার্মান সেনাদের ঔরসে ৫০,০০০ ডাচ যুদ্ধশিশু!

আমস্টারডামঃ ২৮ মে ২০০৪ [এক্সপ্যাটিকা নিউজ ২০০৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসনের সময়ে ডাচ নারীদের গর্ভে জার্মান সেনা কর্তৃক জন্ম দেয়া শিশুর সংখ্যা আগে যা অনুমিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলে জার্মান সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে। জার্মান সেনাবাহিনীর ১৯৩৫-৪৫ সময়কালের সরকারি 'জার্মান ওয়েরম্যাখট আর্কাইভ' প্রমাণ দেয় যে, যুদ্ধকালে জার্মান সেনারা ডাচ নারীদের গর্ভে ৫০,০০০ যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছে।

ডাচ ইন্সটিটিউট ফর ওয়ার ডকুমেন্টেশন এবং কন্ট্যাক্ট গ্রুপ ফর জার্মান সোলজার্স চিলড্রেন পূর্বে এই সংখ্যা নিরূপণ করেছিল ১০,০০০।

আর্কাইভের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ডয়েচ ডিয়েনস্টেল ওয়াস্টের' পরিচালক গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রচারিত ডাচ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অনুষ্ঠান নোভায় বলেছেন যে, 'জার্মান পিতাদের' সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ে ডাচ জাতির পক্ষ থেকে অসংখ্যবার অনুরোধ করা হয়েছে। পরিচালক গারহার্ড বলেন যে, অনেক শিশুর মায়ের মৃত্যু হওয়ার পরে জানা গেছে যে তাদের পিতারা প্রকৃতপক্ষে ছিল জার্মান সেনা।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠানটিতে দু'জন যুদ্ধশিশু রিয়েট এবং অ্যাড্রি লিনথরস্টের জার্মান সামরিক আর্কাইভে যাত্রার চিত্রায়নও দেখানো হয়েছে। যুদ্ধের পরে, জার্মান সেনার সন্তান হিসেবে, তাদের মা তাদেরকে নিয়ে যায় দাদার বাড়িতে। তাদেরকে বলা হয় যে তাদের বাবা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে সন্দেহ জেগে ওঠে।

১৯৯৮ সালে তাদের মা মারা যাওয়ার পরে, লিনথরস্টের বাচ্চারা বহু বছর ধরে তালা-বন্ধ করে রাখা একটা আলমারি খুলে সেটায় খুঁজে পায় তাদের পিতার নাম! সিদ্ধান্ত নেয় জার্মান সেনাদের আর্কাইভের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার বেদনায় হতাশা ব্যক্ত করে তারা বলে যে তারা যদি আরো আগে থেকে শুরু করতো তাদের অনুসন্ধান!

আর্কাইভে জানা গেল যে, দুই ডাচ শিশুর জন্ম দেয়ার সময়ে সেই সৈন্যটি নিজদেশে বিবাহিত ছিল। পরে আবার সে বিয়ে করে এবং মারা যায় ১৯৯৮ সালের ২৯শে নভেম্বরে। তারিখটা ছিল রিয়েট এবং অ্যাড্রির মা মারা যাওয়ার ঠিক একমাস আগে। ভাইবোন দুজনেই মানসিক ধাক্কায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বলে যে তারা সেরকম একটা সংবাদ আশা করেনি।

পরিচালক গারহার্ড উপলব্ধি করেছিলেন যে কেন তাদের মা তাদের পিতা সম্পর্কে নীরব ছিলেন: "একজন 'জার্মান হোর (পতিতা)' হওয়ার লজ্জা আর বেদনা অনেক নারীকে তাদের গর্ভজাত যুদ্ধশিশুদেরকে নিজ নিজ পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করিয়েছে।" তিনি ধারণা করেন যে জার্মান সেনা কর্তৃক জন্ম দেয়া যুদ্ধশিশুর সংখ্যা সম্ভবত আরো বেশি হবে। কারণ ১৯৪৪ সালে গণনা করা বন্ধ করে দেয় ওয়েরম্যাখট কর্তৃপক্ষ। ওই বছরটি পর্যন্ত দখল করা দেশগুলোতে অবস্থান করা সেনাদেরকে জন্ম সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ করতে হতো ওয়েরম্যাখটে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আক্রান্ত মায়েরা 'পিতাদের' কাছ থেকে এবং জার্মান সরকার থেকে অর্থ পেতো। সেসব অর্থ প্রদান সংক্রান্ত সকল তথ্য ধারণ এবং নিবন্ধিত রয়েছে।

গারহার্ড বলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, জার্মান সেনাদেরকে নেদারল্যান্ড ও নরওয়ের মতো দেশগুলোতে সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছিল। এসব শিশু আর্য প্রকৃতির এবং সেজন্যই থার্ড রেইখে (নাজি জার্মানিতে) স্বাগত হয়েছে।"

'জার্মান ওয়েরম্যাখট আর্কাইভের' একজন প্রতিনিধি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "এখনো পর্যন্ত বিদেশে কতজন যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী, সেসম্পর্কে তারা কোনো ঘোষণা দেয়নি। এতেই ধরে নেয়া যায় যে এটা অতি-গ্রহণযোগ্য। এই সংখ্যাটি আমার কাছে নতুন।

যুদ্ধশিশু পুত্রকন্যারা এখন বার্লিনে গিয়ে নিজ নিজ পিতার সন্ধান করে হতাশ হয়ে যায়। আলোচিত বেশিরভাগ জার্মান পুরুষই মারা গেছে। স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৩. ডেনমার্কের বিস্মৃত শত্রু-সন্তান

কোপেনহেগেন পোস্ট: ১৭ এপ্রিল ২০০৫

[সম্পাদকের মন্তব্য: আমাদের আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হলেও, এখানে বিবৃত হয়েছে যে, যুদ্ধের পরে শত্রুর সন্তানদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয় এবং কীভাবে তাদেরকে দায়ীও করা হয়।]

নতুন এক ঐতিহাসিক গবেষণা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডেনমার্কের আচরণ সম্পর্কে খুলে দেয় ইতিহাসের এক নতুন কালো অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ডেনমার্ক থেকে ১০,০০০ জার্মান ঔরসজাত যুদ্ধশিশু পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত তথ্য গোপন করেছিল বা এড়িয়ে গিয়েছিল ড্যানিশ

কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণালব্ধ পিএইচডি অভিসন্দর্ভের উপসংহারে এই তথ্যই উল্লেখিত হয়েছে।

চিকিৎসক ও ইতিহাসবিদ কার্সটেন লাইলফ আবিষ্কার করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ড্যানিশ বন্দি শিবিরে অবস্থানকারী হাজার হাজার জার্মান শরণার্থী, যাদের বেশিরভাগই শিশু, মারা গিয়েছে ক্ষুধা আর রোগে। কারণ ড্যানিশ কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকরা তাদেরকে খাবার বা চিকিৎসা সুবিধা দেয়নি; দিলে হয়তো তাদের জীবন বাঁচতো।

লাইলফ বলেন যে, ডেনমার্কে জার্মান অনুপ্রবেশের পরে ডেনরা জার্মান শরণার্থীদেরকে সাহায্য করাকে অদেশপ্রেমমূলক হিসেবে বিবেচনা করেছে। ফলে, ১৯৪৫ সালে ডেনমার্কে ১৩,৪৯২ জন জার্মান শরণার্থীর মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে ৭ হাজার শিশুর বয়স ছিল ৫ বছরেরও কম। ৩ হাজার শিশুর বয়স ছিল ১ বছরেরও কম!

লাইলফের গবেষণার ফলাফল সম্পূর্ণ ডেন জাতিকে হতাশ করেছে। সাংবাদিকরা বন্দি শিবিরে বেঁচে থাকা কিছু শরণার্থীকে খুঁজে বের করে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। কেউ কেউ বলে যে, তাদেরকে শুধুমাত্র শুকনো আলু খেতে দেয়া হয়েছে। খুব কমবয়সী, খুব বেশি বয়সী, বা খুব দুর্বল শরণার্থীরা এমন আচরণ সহ্য করতে পারেনি বলে ক্ষুধা এবং রোগে ভুগে মারা গেছেন কীটপতঙ্গের মতো।

গত সপ্তাহে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইলফ তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের যুক্তি প্রদর্শন করেন। সেখানে তিনি, থার্ড রেইখের (নাজি জার্মানি) পরিণামে মিত্র এবং রুশ সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালানোর সময়ে বাবা-মাকে হারিয়ে ফেলা, শুধুমাত্র জার্মান শিশুদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা চারটি বন্দি শিবিরের ওপরে তার গবেষণার দৃষ্টিপাত করেন।

অনেক শিশুই চোখের সামনে দেখেছে যে কিভাবে মেরে ফেলা হয়েছে তার পুরো পরিবারকে! অন্য অনেকেই হৈহট্টগোলের মধ্যে আলাদা হয়ে হারিয়ে গেছে নিজ নিজ বাবা-মা-ভাই-বোনদের থেকে। লাইলফ বলেন যে, ডেনমার্কে তাদেরকে কোনো ধরনের সহানুভূতি দেখানো হয়নি।

'তাদেরকে বিবেচনা করা হয়েছে ডেনমার্কের শত্রু হিসেবে এবং জার্মানদের প্রতি ডেনদের ঘৃণা বা যুদ্ধের জন্য শাস্তিও দেয়া হয়েছে', বলেন লাইলফ। 'তারা যে ধরনের ব্যবহার পেয়েছে তাকে শুধু একটা মানবিক বিপর্যয় হিসেবেই বর্ণনা করা যায়।'

শরণার্থীদের বিরুদ্ধে ডেনদের এই বৈরী অবস্থানের পক্ষে অনেক ঐতিহাসিক যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন এবং বলেছেন যে যুদ্ধ-পরবর্তী সেই কঠিন সময়ে এই জাতির খুব বেশি দেয়ার মতো কিছু ছিল না। তবে লাইলফ বলেন, (একই সময়ে) পোলিশ, নরওয়েজীয় এবং ডাচ শরণার্থী শিশুদেরকে ডেনমার্কে ভালভাবে বরণ করা হয়েছিল।

লাইলফ এই বৈরী আচরণকে জাতিগত ঘৃণারূপে চিহ্নিত করেছেন। 'আমরা যখন রুয়ান্ডা এবং বল্কানদের ক্ষেত্রে জাতিগত পবিত্রকরণের (এথনিক ক্লিনজিং) ভয়াবহ চিত্রের কথা শুনি, তখন আমাদেরও মনে করা উচিত যে আমরাও একইভাবে জাতিগত বিদ্বেষপ্রসূত আচরণ করেছি।'

৪. যুদ্ধশিশুরা ফিরছে তাদের উত্তরাধিকারে

ত্রিশ বছর আগে 'অপারেশন বেবিলিফট'-এ তারা ছেড়ে গিয়েছিল ভিয়েতনাম
এপি: ১৬ই মে ২০০৫ [প্রতিবেদক: এরিন হেইন্স]

আলফারেটা, জর্জিয়া : তানিয়া বাকাল তার জন্মস্থান 'ন্‌গুয়ে থু কিম ফুং' ছেড়ে জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে ভিনদেশে। তিন দশক পূর্বে, ভিয়েতনামের ওই স্থান, জন্মদাত্রী মা এবং সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুদ্ধেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ 'অপারেশন বেবিলিফট' তানিয়াকে উড়িয়ে নিয়ে আসে মার্কিন মুল্লুকে। সে আশা করছে যে সে আগামী মাসেই ফিরে পাবে সবকিছু।

তানিয়ারা যাবে ৯,২০০ মাইল দূরে হো চি মিন সিটিতে যার পূর্বনাম ছিল সায়গন। সঙ্গে থাকছে আরো উনিশ জন বড় হয়ে ওঠা তরুণ-তরুণী। এরা সবাই ছিল এদেশে আসা অনাথ শিশুদের প্রথম দলে। সেসময়ে ৩,০০০ ভিয়েতনামি শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

তারা কেউ ভিয়েতনামি ভাষা বলতে পারে না। বদলে গেছে অনেকের নাম। তানিয়াসহ কেউ কেউ তাদের আসল জন্মদিনও জানে না।

"প্রত্যেকেরই একটা সূচনা রয়েছে," বলে তানিয়া যে মনে করে যে সে ৩১ বছর বয়সী। "আমি আমারটা খুঁজে পেতে চাই।"

একরত্তি বাচ্চা তানিয়া ছিল ৫৭টি শিশুর একজন। তাদের বেশিরভাগই ছিল হয় অনাথ নাহয় পরিত্যক্ত। ১৯৭৫ সালের ২রা এপ্রিলে ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজের সাবেক প্রেসিডেন্ট মি. এড ড্যালি ব্যবস্থা করেছিল ওই ফ্লাইটটির। পিচকালো রানওয়ে ছাড়িয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে নিরাপত্তার জন্য নিভিয়ে রাখা হয়েছিল বিমানটির আলো; যেন ভিয়েতনামি সেনারা গুলি করে ভূপাতিত না করতে পারে।

ওই ফ্লাইটটির সংবাদ দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিল চারদিকে। পরদিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড অসংখ্য ফোনকলের মাধ্যমে জোরালো অনুরোধ পেলেন যেন তিনি ভিয়েতনামের শিশুদের জন্য কিছু করেন। সেই এপ্রিলে সায়গনের পতনের সময়ে ভিয়েতনাম থেকে আরো হাজার হাজার শিশুকে নিয়ে আসে মার্কিন সরকার।

শার্লি পেক-বার্নস তার 'ওয়ার ক্র্যাড্‌ল' শীর্ষক গ্রন্থে অপারেশন বেবীলিফট সম্পর্কিত তথ্য ধারণ করেছেন। তিনি এই ঘটনাকে বিগত শতাব্দির সবচেয়ে 'বন্ধুবৎসল মানবিকতা' রূপে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, "এটা ভিয়েতনাম যুদ্ধের একটা দিক যা মার্কিনিদেরকে কিছুটা স্বস্তির অবকাশ দিয়েছে।" "তারা বাচ্চাদেরকে বাঁচাচ্ছিল।"

সাম্প্রতিক সময়ের আগে পর্যন্ত, তানিয়ার কাছে ভিয়েতনাম ছিল শুধুই একটা জন্মভূমি। তার সায়গন যাত্রা তার জীবনে শুধু একটা যতি; কোনো নির্দিষ্ট পর্ব নয়।

তাকে দত্তক নিয়েছিল রিড এবং লরা ডিলবেক দম্পতি। বেশিরভাগ সময়ে বড় হয়েছে মারিয়েটার আটলান্টা শহরতলীর শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকায়। মিশে যেতে চেয়েছে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে।

গ্রোসারি স্টোরের টিনএজার ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত অবস্থায় একজন প্রাক্তন সেনা তাকে ডাকতো 'গুক' বলে। বছর বছর ধরে তার আকাঙ্ক্ষায় ছিল তার চোখজোড়া হবে বড় বড়, গোলাকার এবং আরো বেশি করে ককেশীয়।

"আমার সারাটা জীবন ধরে, আমি কখনোই তাদেরকে খুঁজতে চাইনি," ভিয়েতনামে বসবাসরত তার চীনা মা এবং তার ধারণায় মার্কিন সেনা বাবাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে, ভিয়েতনামি সংবাদপত্রে, নিজের সন্তানসহ একটি ছবি সম্বলিত, একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তানিয়া। এই আশায় যে, তার জন্মদাত্রী মা তাকে চিনতে পারবে এবং উপস্থিত হবে। তানিয়া আরো মনে করে যে, তার প্রত্যাবর্তনটি পুনর্মিলনকেও বোঝায়; নাহলে অন্তত সে এখন যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে সেসবের জবাব।

"আমি যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আমি এটাকে (প্রত্যাবর্তন) নিশ্চিত ভেবেছিলাম," বলে সে। "কিন্তু আমি এখন সত্যিই অনুভব করছি যে আমি ইতিহাসের একটি অংশ।"

৫. যুক্তরাষ্ট্রে দত্তকায়িত শিশুরা ফিরছে ভিয়েতনামে

১১ই জুন ২০০৫

সূত্রঃ ক্রাইইংলিশ ডট কম

বেইজিং, জুন ১১ঃ ওয়াশিংটন ডিসির ভেটারান্স মেমোরিয়ালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত মানুষদের জন্য শ্রদ্ধার ঢল বইছে। কিন্তু কিছু সাবেক সৈনিক আসছে ৩০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের স্মরণের আয়োজন করছে।

ত্রিশ বছর আগে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা অনাথ আশ্রম থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানেই জন্ম নেয়া টিম হোলটান। সে এখন ভিয়েতনামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

"তারা আমাকে বলেছিল যে সেই সময়ে সেখানে একটা যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধগুলো বিয়োগান্তক আর সেসব থেকে যদি কোনো ভালকিছু বের হয়ে আসে সেটা হল সেখান থেকে শিশুকে দত্তক দেয়া। আর তাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে।"

ত্রিশ বছর পূর্বে 'অপারেশন বেবিলিফটের' মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন নীড়ে' আসা আরো উনিশ জন যুদ্ধশিশুর (যারা এখন অন্তত একত্রিশ বছরের তারুণ্যদীপ্ত) সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড হয়ে জন্মভূমিতে ফিরছে হোলটান।

সেসময়ে টিম হোলটানের বয়স ছিল মাত্র আঠারো মাস। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি থেকে নিয়ে আসা অনাথ শিশুদের প্রথম দলগুলোর একজন ছিল টিম।

তার নিজের জন্মদাতা মায়ের পরিবারকে খোঁজার ক্ষেত্রে নানামুখী সমস্যায় যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধ-পরবর্তীকালের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা।

একজন সাবেক ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ প্রেসিডেন্ট মি. এড ড্যালি ১৯৭৫ সালের ২রা এপ্রিলে সায়গন থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে ১,৫০০টি শিশুকে আকাশপথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ডালির পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রথম ফ্লাইটটিতে ৫৭টি শিশু নিয়ে রওনা হন তিনি। যাহোক তার সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জন্ম নেয় 'অপারেশন বেবিলিফট'।

ওই এপ্রিলে ভিয়েতনাম থেকে তিন হাজারেরও বেশি শিশুকে নিয়ে এসেছিল মার্কিন সরকার।

শিশুদের অর্ধেকের বেশি ছিল মিশ্রবর্ণের – ভিয়েতনামের লজ্জার চিহ্ন। আর কিছু ছিল মার্কিন সেনাদের ঔরসজাত যারা পরে যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

প্রত্যাগত কিছু তরুণ-তরুণীরা তাদের জন্মদাত্রী মাদেরকে খোঁজার পরিকল্পনা করছে। হোলটান বলছে যে সে দেশে সময় কাটানো এবং ভিয়েতনামি

হওয়া ও ভিয়েতনামে বসবাস করার অপেক্ষা করছে।

'অপারেশন বেবিলিফট – হোমওয়ার্ড বাউন্ড' ফ্লাইটটি ভিয়েতনামে পৌঁছবে ১৫ই জুনে (২০০৫)।

৬. তিমুরে জাতিসংঘের লজ্জার উত্তরাধিকার

[প্রতিবেদনটি তিমুরে জাতিসংঘ কর্মীদের কিছু আপত্তিকর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে।]

২২ জুলাই ২০০৬, দিলি, তিমুর [প্রতিবেদক : লিন্ডসে মারডক]

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী, দারিদ্র্যপীড়িত তিমুরীয় নারীদের গর্ভে এবং নিজেদের ঔরসজাত, অন্তত ২০টি যুদ্ধশিশুকে পরিত্যক্ত করেছে। জাতিসংঘের তদন্ত দল 'আড়াল করে রাখার সংস্কৃতি' প্রকাশ করেছে যেখানে, শান্তিরক্ষী বাহিনীর ঔরসে এবং জাতিসংঘ-কর্মীদের যৌন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিগত সাত বছর ধরে যুদ্ধশিশুদের জন্মের বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছিল। কারণ, একটা গভীর ধর্মভিরু দেশে, তারা লজ্জা ও অপমানের আশঙ্কায় ভুগছিল।

অনুসন্ধানী এসব তথ্য জাতিসংঘের প্রশাসনকে বেশ নাড়া দিয়েছে কারণ তারা পূর্ব তিমুরে হাজার হাজার শান্তিবাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। 'দি এজ' কর্তৃক সংগৃহীত, তদন্তের একটি প্রতিবেদনে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হওয়ার দুই মাস পরে দেশগঠনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োজিত জাতিসংঘ কর্মীদের ক্ষেত্রে, যৌন-অসদাচরণ সম্পর্কে শূন্য-সহ্য বা জিরো-টলারেন্স নীতির সুপারিশ করা হয়েছে।

পূর্ব তিমুরে প্রেরিত জাতিসংঘ বাহিনীকে শিশু-যৌনাচার, পাশবিকতা, নারী ও শিশুকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার মতো অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। একজনকেও এপর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

কিন্তু এই প্রতিবেদনটি প্রথমবারের মতো প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ঔরসে জন্ম নেয়া শিশুদেরকে কোনোরকমের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই পরিত্যাগ করে দেয়া হয়েছে।

এটা আরো পরিষ্কার করে যে, এসব শিশুদের জন্ম এবং জাতিসংঘ বাহিনীর অন্যান্য যৌন-অসদাচরণের তথ্যাদি সম্ভবত যথাসম্ভব কমিয়ে অবহিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি বলে যে, জাতিসংঘ বাহিনীর ঔরসজাত শিশুদের তিমুরীয় মায়েরা কলঙ্কিত-নিন্দিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজ নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক বিতাড়িতও হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব নারীকে জাতিসংঘ কর্তৃক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কফি উৎপাদনকারী পার্বত্য জেলা এরমেরায়, সৈন্যরা বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্কে জন্ম দেয়া সাতটি শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। বোবোনারো জেলায়, চারটি শিশুর জন্ম হয়েছে জাতিসংঘের দুই পুলিশ এবং দুই সিভিল কর্মীর ঔরসে।

সাধারণত পরিবারগুলোকে দেয়া হয় যৌতুক (অর্থ)। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, মায়ের পরিবারকেই এসব শিশুর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে শুরু হয় ১১৩টি দেশ থেকে আগত সামরিক ও বেসামরিক ১৮,০০০ জন জাতিসংঘ-কর্মীর শান্তিরক্ষার কার্যক্রম। এসব কর্মীদের ক্ষেত্রে বা মাধ্যমে সংঘটিত লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রভাব সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নিয়োজিত নৃতত্ত্ববিদ সোফি অসপিনা তৈরি করেছেন এই প্রতিবেদন।

আগামী মাসেই পূর্ব তিমুরে চলমান মিশনের কার্যকাল সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর নতুন একটি মিশন প্রেরণের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি আয়ান মার্টিন, নিরাপত্তা কাউন্সিলকে সুপারিশ করেছেন যেন প্রেরিত পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্সও প্রেরণ করা হয়। তিনি আরো সুপারিশ করেছেন যেন, মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়া, জাতিসংঘের উপদেষ্টাগণ কর্তৃক নির্বাচনে সহায়তা প্রদান পর্যন্ত সেখানে সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

বর্তমানে পূর্ব তিমুরে নিয়োজিত রয়েছে ২,৫০০ অস্ট্রেলীয় সেনা ও পুলিশ; এদের বেশিরভাগেরই অবস্থান রাজধানী দিলিতে।

১৯৯৯ সাল থেকে হাজার হাজার অস্ট্রেলীয় সেনা ও পুলিশ কাজ করে আসছে পূর্ব তিমুরে; একজনের বিরুদ্ধেও কোনো ধরনের যৌন-অসদাচরণের অভিযোগ ওঠেনি। কিছু শান্তিরক্ষী সেনার বাজে ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়েছে বেশ কিছু জাতিসংঘ-কর্মী; এদের অনেকেই বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দিয়ে চলে যান।

মিজ অসপিনার প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বিবৃত অনেক ঘটনার একটিতে বলা হয়েছে, একটি নাম উল্লেখ না করা দেশ থেকে আগত শান্তিরক্ষী সেনা দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়েকে ওয়েকুসী অঞ্চলে।

২০০১ সালের প্রথমদিকে, ছাগলের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের চেষ্টা করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুজন সৈন্যকে ক্ষত-সম্বলিত শিশ্ন-সহ পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের বাড়িতে।

মিজ অসপিনা বলেন যে, জাতিসংঘের অন্যান্য কার্যক্রমের মতোই, শান্তিরক্ষী বাহিনীর আগমন আকর্ষন করেছে পতিতাবৃত্তিকে। তার একটি গবেষনায় দেখানো হয়েছে যে, ২০০৪ সালে ২৫০ জন পুরুষ এবং ১১০ জন নারী যৌনকর্মী ছিল দিলিতে। পুরুষদের ৭৫ শতাংশের বয়স ছিল ১৮-র নীচে।

প্রতিবেদনটি বলে যে, জাতিসংঘের ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সংঘটিত অসদাচরণ সম্পর্কে অবহিত করার ক্ষেত্রে ভীতি এবং অবহেলা যুক্তিযুক্ত। অপরাধী এবং সাধারণত যার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় - দুজনই তুলনামূলকভাবে ক্ষমতার উঁচু স্থানে অবস্থান করে।

স্থানীয় প্রশাসন সাধারণত, রক্ষণশীল ক্যাথলিক ধ্যানধারণায় প্রভাবিত সনাতনী মানসিকতা-সম্পন্ন। এটা বলে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে নারীরা কোনো ধরণের সহানুভূতিশীল সহায়তা আশা করতে পারেনা।

প্রতিবেদনটিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয় যে, কর্মীদের যৌন-অপরাধে শাস্তি প্রদান করার অসামর্থ্যের কারণে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে।

প্রতিবেদনে কমান্ডারদেরকে যৌন-অনাচারের ক্ষেত্রে অবহিতকরণ এবং একটি শূন্য-সহ্য বা জিরো টলারেন্স নীতি প্রবর্তন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অনাসৃষ্টিকারিদেরকে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা শ্রেয়।

প্রতিবেদনটি বলে যে, যৌন-অত্যাচারের অভিযোগ এবং গুজবের সবই তদন্ত করে দেখা উচিত। তিমুরীয় নারীদের সঙ্গে যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট গর্ভ এবং জন্মের বিষয়টি নথিভূক্ত করা বাঞ্ছণীয়। জাতিসংঘের নিশ্চিত করা উচিত যে, বেসরকারি এনজিও-সমূহ এসব মা ও শিশুদেরকে সহায়তা প্রদান করে।

৭. অবিচারের কারণে সেনা-সন্তানেরা ক্ষুব্ধ

২৯ অক্টোবর ২০০৬ : ভিয়েতনাম নিউজ সার্ভিস

বেশিদিন আগের কথা নয়। ভিয়েতনামী নাগরিকদের মধ্যে যারা বিদেশীদের ঔরসে জন্ম নিয়েছে তাদেরকে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হতো অত্যন্ত ঘৃণাভরে। তিন দশক ধরে চলমান দুটি ভয়াবহ যুদ্ধকালে দেশটিকে ওলট-পালট করে দেয়া ফরাসী এবং মার্কিন সেনাদের ঔরসজাত শিশুদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল

ভবিতব্য। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে সদা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত সমাজটির গভীর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিনদেশি শক্তির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে উদ্ভূত সবকিছুর প্রতি সন্দেহের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমাজটিতে মিশ্র বাবা-মার সন্তানদের অবস্থান ভিনদেশী।

কিম লেফেভারের খুবই কষ্টের শৈশব থাকার কারণ – সে ছিল এক অর্ধ-ফরাসি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সামান্য আগে জন্ম হয় মেয়েটির। তার পিতা, যে ছিল এক বিদেশি সেনাসদস্য, তাকে ফেলে ফিরে যায় নিজদেশে। কিমের মা এসেছিল 'নাম ডিন' প্রদেশ ত্যাগ করা এক পরিবার থেকে। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফরাসি সেনাকে যে পরে তাকে ফেলে চলে যায়।

ছয় বছর পরে, কিমকে ভর্তি করানো হয় হ্যনয়ের এক অনাথ আশ্রমে; অন্যদিকে রুজি-রোজগারের সন্ধানে তার মা চলে যায় দক্ষিণে। ১৯৪৫ সালে আগস্ট বিপ্লবের পরে সে তার মার সঙ্গে মিলিত হয়। সেসময়ে তার মা সায়গনের চো লোনের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

যাহোক আবার পড়াশোনা শুরু হয় কিমের। বৃত্তি পেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে ফ্রান্স থেকে সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতে সমর্থ হয়। তার লেখা মেটিশে ব্ল্যানশে (বার্নার্ড ব্যারল্ট, প্যারিস ১৯৮৯) কিম স্মৃতিচারণ করে উল্লেখ করেন, তার লেখাপড়ার জন্য তার মায়ের আত্মত্যাগ এবং কলেজে পড়ার সময়ে এক ক্যাথলিক সিস্টারের নিঃস্বার্থ সাহায্যের কথা।

তীব্র বেদনার সঙ্গে সে তার তিনটি দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে – নারী হওয়া, অনাথ হওয়া এবং অর্ধ-অস্পৃশ্য হওয়া। একবার সে শুনতে পায় যে তার চাচা তার মাকে বলছে, 'তোমার বুকের দুধ পুষ্টি জুগিয়েছে এক বিষধর সাপের। ওই শ্রেণিটি জানে না কোনো ধরনের কৃতজ্ঞতা।' প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়ে এক শিক্ষক তার সঙ্গে এমনভাবে রুক্ষ ব্যবহার করছিল যেন চলমান ফরাসি আগ্রাসনের জন্য কিমই দায়ী! কোনো কোনো সময়ে কিম তার ফরাসি-অর্ধাংশকে অভিশাপ দিয়েছে। আবার পরের মুহূর্তেই উপলব্ধি করেছে যে, সে শুধুমাত্র উপনিবেশবাদীদের আগ্রাসনে জর্জরিত মানবগোষ্ঠীর একটি শিকার। মানসিক ও শারীরিকভাবে বড় হয়ে এবং সাথে ভালোবাসাভরা হৃদয় নিয়ে অল্পদিন আগে কিম ফিরে এসেছে ভিয়েতনামে; তার ভিয়েতনামে, তার মায়ের দেশ ভিয়েতনামে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের গারল্যান্ডে বসবাসকারী 'এনগক অ্যান' নামের আরো একজন নারী অনেক সুবিধার মধ্যে থেকেও ভুলতে পারে না যে সে কোথা থেকে এসেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতি বছরে প্রকাশিত সম্প্রদায়-ভিত্তিক পত্রিকা ভিয়েত বাও-য়ের এক কাহিনীতে এই চল্লিশ বছরের ভিয়েতনামি-মার্কিন বিবৃত করেছে ১৯৫৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত অশ্রুবিজরিত জীবনের কান্না; বিশেষভাবে মার্কিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক পরের সময়ের কথা। প্রাইমারি স্কুলে তাকে তার পুরু রুক্ষ চুলের জন্য ভর্ৎসনা করা হতো। বারবার শাস্তি দেয়া হতো প্রতিঘাত করার জন্য।

যুদ্ধকালে মার্কিন সেনাদের ঔরসজাত শিশুদেরকে নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত হলেও এনগক অ্যানের কষ্টের সমাপ্তি হয়না। একটা তৃতীয় দেশে (ভিনদেশে) শরণার্থীদের ট্রানজিট ক্যাম্পে পুরনোদের কাছে সে ছিল অনাস্থার এক জীব! অবিবেচিতভাবে সবাই মনে করতো যে এসব অর্ধ-জন্মা বা মিশ্র-জন্মারা স্বাভাবিকভাবেই চোর!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে অনেকগুলো সুখময় বছর পার করার পরেও এনগক অ্যান এখনো বিরহে ভোগে তার জন্মভূমির জন্য। অভাববোধ করে ধানের ক্ষেতে ব্যাঙের ডাক, জোৎস্না রাতে কোকিলের কুহুতান, হ্যামকে দোল দেয়া মায়েদের ঘুম পাড়ানী গানের।

খোলাখুলিভাবে সে ঘোষণা করে, 'ভিয়েতনামিদের সম্পর্কে যারা বাজে কথা বলে আমি তাদের ঘৃণা করি, যদিও আমি শারীরিকভাবে একটুও তাদের মতো নই।'

[লেখক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত]

১৬. বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধশিশু ‘জয়’

বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধশিশু জয়

বেশিরভাগ যুদ্ধ শিশুকেই বিজয়ের পর কানাডা, সুইডেন ও নরওয়েতে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। এদের একজন জয় (নামটা বাংলাদেশের জয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানিয়েছেন তার দত্তক পিতা)। প্রথমে মোজেস নিকলাস এবং এখন সভেন নিকলাস স্টর্মবার্গ নাম। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তার ঠাঁই হয় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। সুইডেন টিভির হয়ে সে সময় ঢাকায় যুদ্ধ কাভার করছিলেন সভেন স্টর্মবার্গ। ১৬ ডিসেম্বর জয়ের বয়স মাত্র ১০ দিন। সভেন লামপেল নামে একজন ডাক্তার হলি ফ্যামিলির দায়িত্বে ছিলেন তখন। আরেকজন জার্মান স্কুপলিন সেখানে কাজ করছিলেন। যুদ্ধোত্তর কালে এত শিশু নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এদিকে স্টর্মবার্গ দুই মেয়ের বাবা, তার স্ত্রীকে নিয়ে দেখা করলেন স্কুপলিনের সঙ্গে। তাকে বুঝিয়ে দত্তক নেন জয়কে। বাংলাদেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রথম যুদ্ধ শিশু জয়।

জয়ের বয়স এখন ৩৫ ছুঁই ছুঁই। স্টকহোমে পড়াশোনার পর এখন সহ-মনোবিদ হিসেবে কাজ করছেন জয়। দেশে এসেছিলেন। তার ভাষ্য, আমি কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নই। স্টকহোমেই বেড়ে উঠেছি, এখানেই এক হাসপাতালে সহকারী মনোবিদ হিসেবে কাজ করছি। বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, দেখি ওখানকার সবাই আমার মতোই দেখতে। অনেক ছোট থাকতে জেনেছি আমার এখনকার মা-বাবা আমার আপন নন। আমি আমার সত্যি বাবা-মার খোঁজ পাইনি, জানি না তারা বেঁচে আছেন কীনা।

স্টর্মবার্গ নিজেও সে সময়কার ডকুমেন্ট নিয়ে দেখা করেছেন বিভিন্ন মহলে। জয়ের কোনো আত্মীয়স্বজন আছেন কীনা খোঁজ করেছেন। পান নি।

সূত্র : http://www.jonmojuddho.com/first-war-child/

১৬ ডিসেম্বর জয়ের বয়স মাত্র ১০ দিন

১০ দিন বয়সে স্টর্মবার্গ-এর কোলে জয়

৩৫ বছর বয়সে জয়

১৭. যুদ্ধশিশু শিখার মেয়ে ক্যাটারিনার সঙ্গে কিছুক্ষণ – ২০১৫ সালের ২২শে নভেম্বরে চট্টগ্রামের শিশুস্বর্গে

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নাগরিকদের একজন ছিল সদ্যোজাত যুদ্ধশিশু একরত্তি শিখা। নতুন এক দেশে ততোধিক নতুন এক শিশু। পবিত্র হয়েও অপবিত্র! ঠিকানা থেকেও ঠিকানা-বিহীন! বাবা-মা থাকতেও পিতৃমাতৃহীন অনাথ! শরীরে স্বাভাবিক রক্ত বইলেও তা অস্বাভাবিক! নিজদেশে পরবাসী! অতএব, প্রথম সুযোগে 'বিদায় কর' এই অপয়া-অজন্মাদের। কিন্তু যাবে কোন নির্বাসনে? কি হবে ভিনদেশে নিরাপদ নীড়ের সন্ধান করে – চলে যাক কোনো অজানায়।

ডেটলাইনঃ ১৯শে জুলাই ১৯৭২। বুধবার বিকেল। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। অল্পদিন আগে চালু হয়েছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। এখান থেকে আজ কানাডায় নতুন আশ্রয়ের পথে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চেপে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে ১৫ জন যুদ্ধশিশু। বিশেষত মাদার তেরেসা হোম এবং সহযোগী অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে বিদেশে দত্তকায়িত যুদ্ধশিশুদের মধ্যে এরাই প্রথম দল। বিভিন্ন সাদামাটা আশ্রয়কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছে এসব যুদ্ধশিশু। যুদ্ধশিশুদের এই প্রথম দলটি কানাডীয় মানব-হিতৈষী প্রতিষ্ঠান 'ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের' সৌজন্যে, টরন্টো ও মন্ট্রিয়লের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে যাত্রা করছে। সেখানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যেই নির্বাচিত ১৪টি পরিবারে দত্তক হিসেবে আশ্রয়ণ হবে এসব শিশুর। এদের মাঝে একটি পরিবার, মি. ও মিসেস বনি ক্যাপুসিনোর।

প্রিয়পাঠক, এবার চলুন দৃষ্টিপাত করি ওই ১৪ জনের একজনের ওপরে। সে ছিল আমাদেরই একজন – মাত্র চার মাস বয়সের ছোট্ট শিশু 'শিখা'। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের অযাচিত অপবিত্রতাকে ধুয়েমুছে নিয়ে চলে গেছে আরেক নির্বাসনে। কানাডার কিউবেক নিবাসী মি. ও মিসেস ক্যাপুসিনোর কোলে। কানাডার মাটিতে বেড়ে ওঠা, প্রায় পঞ্চাশে পা দেয়া শিখার হৃদয়ে-মননে

বাংলাদেশের অস্তিত্ব এক বহ্নিশিখা - যদিও হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা। তবুও সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, ওই সুদূরে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ভুখণ্ডটাই তার শিকড় - তার স্বপ্ন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থেমে থাকেনা। থেমে থাকে না পৃথিবীর আবর্তন। দীর্ঘজীবনের শেষপ্রান্তে এসেও বয়সের ভারে একটুও ক্লান্ত হননি সেই বনি ক্যাপুসিনো। দুস্থ শিশুদের পুনর্বাসনে কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন অনাথ আশ্রম 'শিশুস্বর্গ'; নেপাল ও ভারতেও তাঁর রয়েছে অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠান।

এবারের ২য় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছে 'ক্যাটরিনা ক্যাপুসিনো' - বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের ২য় প্রজন্ম। ১৯৭২-এ জন্ম নেয়া সেই যুদ্ধশিশু শিখার কন্যা – ক্যাটরিনা। ১৯৭২ সালের দীর্ঘ ৪৩ বছর পরের এই দৃশ্যপটে, ২০১৫ সালে মায়ের সেই প্রিয় দেশের মাটিতে এসেছে 'যুদ্ধশিশুর কন্যা'! বনি ক্যাপুসিনোর সঙ্গে এসেছে মায়ের দেশ মাতৃভূমি বাংলাদেশ দেখতে! নিজের মা শিখা সম্পর্কে ক্যাটরিনা বলে, "আমার মা এ দেশটাকে তাঁর স্বপ্নে এবং আত্মায় লালন করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি এখানে থাকতে পারেননি। কিন্তু তিনি আমায় বলেছেন, তাঁর শিকড় এখানেই।" বলতে বলতে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে তার চোখ, "চমৎকার এই দেশটাতে আমি আবার আসতে চাই। আমার মা, বোনসহ।"

২০১৫ সালের ২২শে নভেম্বর। চট্টগ্রামের 'শিশুস্বর্গে' এসেছে যুদ্ধশিশু শিখার কন্যা ২১ বছর বয়সী ক্যাটরিনা। ২০০৯ সালে প্রকাশিত আমার 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু – কতটা অবহেলায়, কতটা ভালবাসায়' বইটার মাধ্যমে আমার বাচ্চারা যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে বেশ আগ্রহী। ওদের নিয়ে গেলাম ক্যাটরিনার সঙ্গে দেখা করতে। চমৎকার এক মানুষ ক্যাটরিনা। মুহূর্তেই নিবিড় হয়ে আলাপে মেতে ওঠে আমার দুই কন্যা নিসর্গ নিগার দ্যুতি আর বহ্নিশিখা নিগার দিয়ার সঙ্গে। পুত্র সিয়াম সাজিদ দীপ্র ঢাকায় থাকায় অনুপস্থিত। শিশুস্বর্গের বাচ্চারা বনি ক্যাপুসিনোকে ডাকে 'বনি-মা' বলে। চমৎকার এক পরিবেশ। আমার 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' বইটা উপহার দিলাম ক্যাটরিনাকে। বইয়ের ভেতরে তাঁর মায়ের নামটা দেখে উচ্ছ্বসিত সে। বাংলা পড়তে না পারলেও, মায়ের নামটা বুঝতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই! একসঙ্গে বসলাম। গল্প করলাম। বাংলাদেশ এবং এদেশের মানুষের প্রতি ক্যাটরিনার আগ্রহ সীমাহীন। সকলের জন্য তার হৃদয়ভরা ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা।

লেখকের দুই কন্যা (দিয়া, দ্যুতি), লেখক, ক্যাটারিনা ক্যাপুসিনো, বনি-মা এবং পেছনে মনি-মার ২ দত্তক পুত্র

ক্যাটারিনা ক্যাপুসিনো

১৮. একাত্তরের যুদ্ধনারী – যুদ্ধশিশুদের সেবক ডা. জিওফ্রে ডেভিস

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত লক্ষ লক্ষ বাঙালি যুদ্ধনারীদের সেবায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে নিয়োজিত ছিলেন অস্ট্রেলীয় [সিডনি নিবাসী] চিকিৎসক জিওফ্রে ডেভিস। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ছয় মাস ধরে যুদ্ধনারীদের গর্ভপাত এবং অন্যদিকে, জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুদের যত্নে প্রয়োজনীয় কাজ করেন তিনি। এছাড়াও, অদক্ষ বা গ্রাম্য পন্থায় গর্ভপাত করানোর ফলে উদ্ভূত যৌনরোগ ও বিভিন্ন জটিলতার শিকার হওয়া কয়েক হাজার ধর্ষিতা নারীরও চিকিৎসা প্রদান করেন।

লন্ডনের পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনালের অনুরোধে বাংলাদেশে আসেন ডেভিস। 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল, ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন (ইউএনএফপিএ), ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সম্মিলিত উদ্যোগে। প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হন ডা. জিওফ্রে ডেভিস। পুরো প্রকল্পটি ছিল গোপনীয়। কারণ কেউই গর্ভপাতের মতো স্পর্শকাতর কার্যক্রমে সংযুক্ত হতে আগ্রহী ছিলনা। ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন ডেভিসের যাতায়াত ভাড়া ও সামান্য পরিমাণে দৈনিক ভাতা প্রদান করলেও কোনো মাসিক বেতন ছিল না। তার মূল কাজটি ছিল বিভিন্ন শহরে টার্মিনেশন ক্লিনিক স্থাপন করা। আগস্ট পর্যন্ত সেসব ক্লিনিকের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় চিকিৎসকদের নিরাপদ গর্ভপাতের কৌশল প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

নিয়মিত পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকে 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণার কাজে কয়েক বছর ধরে জেনেছি বাংলাদেশের

যুদ্ধনারী ও যুদ্ধশিশুদের সেবক এই মহান ব্যক্তির কথা। সবসময়ে মনে হতো - কোনোভাবেও যদি অস্ট্রেলিয়া যেতে পারি তাহলে তার সঙ্গে দেখা হবে! ব্যয়বহুল বলে বিষয়টা নিয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাবতে পারিনি। ইন্টারনেটে পাওয়া তার দেয়া সাক্ষাৎকার বাংলায় অনুবাদ করে 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু (২০০৯ সালে সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত)' শীর্ষক বইটির পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার সময়ে তার সঙ্গে আত্মীক সম্পর্ক আরো গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

সংক্ষিপ্ত জীবনধারা

পূর্ণনাম :

জিওফ্রে ল্যাঙ্গেলট রুটার ডেভিস (১৯৩৩-২০০৮)

পড়াশোনা :

সিডনির ট্রিনিটি গ্রামার স্কুল – ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫০)

ইউনিভার্সিটি অব সিডনি, মেডিসিন ফ্যাকাল্টি - এমবিবিএস (১৯৫০ - ১৯৫৭)

পেশাগত কর্ম:

১৯৫৮ সালে সিডনি হাসপাতালে জুনিয়র রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার

১৯৫৯ সালে সিডনি হাসপাতালে সিনিয়র রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার

১৯৬০ সালে সিডনি হাসপাতালের ক্যানেমাতসু ইনস্টিটিউটে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো

১৯৬১-১৯৬২ সালে সিডনি হাসপাতালের ক্যানেমাতসু ইনস্টিটিউটে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

১৯৬২-১৯৬৮ সালে সিডনির তিনটি শল্য-কেন্দ্রে জেনারেল প্র্যাকটিশনার

১৯৬৯-১৯৭০ সালে লন্ডনে সহকারী প্র্যাকটিশনার

১৯৭১-১৯৭৪ সালে লন্ডনের হারলে স্ট্রিটে প্র্যাকটিস

১৯৭১-১৯৮৪ সালে ইউএসএইডের অধিভুক্ত পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক

[এ সময়ে পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল, ইউনাইটেড ন্যাশনস ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাকটিভিটিজ

এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের আওতায় 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামের' পরিচালক]

১৯৭২-১৯৭৩ সালে তিউনিশিয়ায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রামের পরিচালক

১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ভারতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রামের পরিচালক

১৯৭৪-১৯৮৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ওশেয়ানিয়ায় পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক

১৯৮৪-১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক

১৯৮৮ সালে সিডনির পটস পয়েন্টে প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে অবসর গ্রহণ;

১৯৯০ দশকে সিডনিতে চিকিৎসাসেবায় বিভিন্ন শলা-পরামর্শ প্রদান

ব্যক্তিগত জীবন

প্রথম স্ত্রী ডনে মারা যাওয়ার পরে বিয়ে করেন জেলেনাকে। তিনিও মারা যান এবং শেষে বিয়ে করেন হেলেনাকে। ক্যাটরিওনা, ডেমিটার, জার্ভেস, উইলিয়ম ও বেঞ্জামিনের পিতা এবং দামিয়ান ও ফ্রান্সেসকার সৎ-পিতা। তার শখের তালিকায় ছিল বিমান ও গাড়ি চালনা, মাছধরা, বইপড়া এবং গান শোনা। *[তথ্যসূত্র: ডা: ডেভিসের পুত্র উইলয়ম ডেভিস]*

সাক্ষাৎকার – ১

২০০২ সালের ১লা জুনে ডা. জিওফ্রে ডেভিসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত গবেষক বাংলাদেশের বীনা ডি'কস্টা। ওই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, ধানমন্ডির একটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে ঢাকার অন্যান্য স্থান এবং দেশের অন্য জেলাগুলোতেও গর্ভপাত বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করেছেন ডেভিস। তার সেসব কাজ শুরু করার আগেই বিচারপতি কে এম সোবহানের পরিচালনায় স্থাপিত হয় নারী পুনর্বাসন কার্যক্রম; এর আওতায় ছিল অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের নিরাপত্তা, গর্ভপাত এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া যুদ্ধশিশুদেরকে বিদেশে দত্তকায়নের উদ্দেশ্যে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসেসে [ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত দত্তকায়নে নিয়োজিত একটি বড় প্রতিষ্ঠান] প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড।

ডেভিস বলেন যে, ইয়াহিয়া খান এবং টিক্কা খানের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল যে একজন ভাল মুসলিম, পিতা ছাড়া যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। অতএব পাকিস্তানি সেনারা [হত্যাসহ অন্যান্য অত্যাচারের পাশাপাশি] যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব তত বেশি বাঙালি মেয়েদেরকে জোর করে অন্তঃসত্ত্বা করেছে। সেটাই ছিল এরকম করার পেছনের তত্ত্ব। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে অধিকৃত বাংলাদেশে সৃষ্টি হতো এক বিরাট ও বিশেষ প্রজন্ম যা জন্ম নিতো পাকিস্তানি রক্ত নিয়ে। কুমিল্লার একটি বন্দীশালায় গিয়ে কয়েকজন পাকিস্তানি বন্দী সেনাদের সঙ্গে আলাপের

এক পর্যায়ে সেনারা 'ধর্ষণের পক্ষে' ডেভিসকে বলেছিল, 'আমাদের কি করা উচিত ছিল? এটা ছিল একটা যুদ্ধ (আমরা ছিলাম আদেশপ্রাপ্ত)!'

ডেভিস নিজে দিনে প্রায় একশটি করে গর্ভপাত করেছিলেন। তার ওই গর্ভপাত কার্যক্রম, সরকারের সচিব রব চৌধুরীর পক্ষ থেকে জারি করা একটি পত্রের মাধ্যমে, সরকারিভাবে বৈধ ছিল। ডেভিস আরো উল্লেখ করেন যে, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য শহরগুলোতেও বিভিন্ন সংখ্যায় গর্ভপাত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক ধর্ষিতা গর্ভপাত করানোর জন্য কলকাতায় গিয়েছিল। যারা সন্তান জন্মদান করতো তারা নিঃসঙ্কোচে সদ্যোজাত সন্তানদেরকে পুনর্বাসন সংস্থাগুলোকে দিয়ে দিয়েছে। সামান্য সংখ্যক মা তাদের নিজ নিজ বাচ্চাগুলোকে রেখে দেয়ার বিষয়ে আগ্রহও প্রকাশ করেছে।

সাক্ষাৎকার – ২

সিডনী নিবাসী সমাজকর্মী জনাব কামরুল আহসান খান এবং ড. আবুল হাসনাৎ মিল্টন কর্তৃক গৃহীত ডা. জিওফ্রে ডেভিসের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাদের ধর্ষণের ফলে উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে ডা. ডেভিসের অবদানের কথা। লন্ডনের প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন জেনেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাচক্র কর্তৃক জোর করে বাঙালি মেয়েদেরকে গর্ভবতী করার পরিকল্পনার কথা; এর ভিত্তি ছিল যে, একজন উত্তম মুসলিম যে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু আপন পিতা ছাড়া। বিষয়টি এসেছিল টিক্কা খানের মাথা থেকে। যুদ্ধের পরে কুমিল্লায় কয়েকজন বন্দি পাকিস্তানিদের বক্তব্যে জানা যায় যে, সেনাসদস্যদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালে কয়েক লক্ষ নারী শুধু যে গর্ভবতী হয়েছিল তাই নয়, একইসঙ্গে এদের অনেকেই (ধর্ষিতা গর্ভবতী বা শুধু ধর্ষিতা) বিভিন্ন ধরনের জটিল যৌন-বাহিত রোগেও আক্রান্ত হয়েছিল। ফলাফলে, অনেকেই সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। সার্বিকভাবে বিষয়গুলো স্পর্শকাতর হওয়ার কারণে সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। ধর্ষিতা গর্ভবতী মায়েদের গর্ভে যুদ্ধশিশুর জন্ম হওয়া বাচ্চাদেরকে মাদার তেরেসা ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে প্রেরণ করা হয়। ডেভিস আরো মন্তব্য করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধকালে স্টালিনের বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিতা জার্মান নারীদের বিষয়ে বিশ্ব নিশ্চুপ। সে বিষয়ে কোনো রচনা নেই, সাহিত্য নেই – কিছুই নেই। বাংলাদেশে টিক্কা খানের কার্যক্রমটি ছিল পূর্ণমাত্রায় অশ্লীল যা নাজি জার্মানির হেইনরিখ হিমলারের লেবেন্সবর্ন মিনিস্ট্রির সঙ্গে তুলনীয়।

বঙ্গবন্ধু-জিওফ্রে সাক্ষাৎ

মৃত্যুর অল্পকাল আগে এক সাক্ষাৎকারে ডা. জিওফ্রে ডেভিস বলেন, "বাংলাদেশে আমার অবস্থানের মাঝামাঝি সময়ে (মে ১৯৭২ সাল) সাক্ষাৎ হয় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। বেশ কয়েক মাস আমি সেখানে কাজ করেছিলাম এবং সেখানকার প্রশাসনের কাছে বেশ সুপরিচিতও হয়ে উঠেছিলাম। তাহলেও (একা না গিয়ে) ভন শুলজ এবং আমি একসঙ্গে তার কাছে যাই। বলতে পারিনা যে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাদেরকে সেখানে তলব করা হয়েছিল কিনা বা কেউ ডেকেছিল কিনা। তবে আমরা তার কাছে যাই এবং তিনি আমাদেরকে সানন্দে বরণ করেন।

তিনি ভন শুলজের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন; কারণ শুলজ তার [শেখ মুজিবের] সন্তানদেরকে নীতিহীন নিষ্ঠুর পাকিস্তানিদের হাত থেকে আক্রমণের শুরুতে রক্ষা করেছিল। তবে আমার প্রতিও তার কৃতজ্ঞদৃষ্টি লক্ষ্য করলাম। তিনি খুবই অমায়িক। আমি দেখলাম যে তিনি একজন পরিপূর্ণ জ্ঞানবান এবং সজ্জন ব্যক্তি। আমাদেরকে বিদায়ের সময়ে তিনি কিছুটা দুঃখ প্রকাশও করলেন। তবে সেটাতো রাজনীতি, তাই না?

আমাকে অনেক করে ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, 'দেখ, তোমাকে দেয়ার মতো আমাদের কিছুই নেই। কোনো অর্থ নেই, কোনো পদক নেই, কোনো কিছুই নেই – তবে আমার এই ছবিটা নাও।' ফ্রেমে বাঁধানো ছাপানো একটা পোর্ট্রেট দিলেন আমাকে এবং সেটা এখনো আমার কাছে আছে। তিনি দেখতে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর মতো; তাকেও আমি হারিয়েছি। তার নাম প্রফেসর কে জি ডব্লিউ ক্রস (কেনেথ জি ওয়ালটন ক্রস)। দুজনকে অদল-বদল করা যেত! এরপর আমি বাংলাদেশ ত্যাগ করি এবং তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।"
[ইংরেজিতে প্রদত্ত ডেভিসের বক্তব্যের অডিও ফাইল থেকে অনূদিত।]

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ!

অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার একটা সুযোগ এসে গেল! ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের ঢাকা অফিসের উদ্যোগে পরিচালিত 'টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং রিফর্ম প্রজেক্ট'-এর আওতায় একদল পেশাদার ব্যক্তিবর্গ সফর করবে অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা। আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওই দলে। আইএলও বিশেষজ্ঞ মিজ স্যান্ডি চ্যানের নেতৃত্বে মোট ১৭ জন যাব

প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি (২৯ মে - ৭ জুন ২০০৯) এবং পরে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে (৭ জুন - ১১ জুন ২০০৯)। আর সিডনি শহরেই বাস করেন আমার কাঙ্ক্ষিত ডা. জিওফ্রে ডেভিস।

৮ মে ২০০৯। শুক্রবার। ছুটির দিন। মহাউৎসাহে ইন্টারনেটে প্রবেশ করলাম সিডনিতে ডেভিসের বাড়ির ঠিকানার সন্ধানে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সর্বশেষ তথ্য জেনে বিষাদে ভারী হয়ে গেল মনটা। কয়েক বছরের অপেক্ষা পরিণত হল চিরস্থায়ী অপেক্ষায়! ২০০৮ সালের ৩রা অক্টোবর শুক্রবারে সিডনিতে পরলোক গমন করেছেন এই মহান পুরুষ। ১৩ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে বেলা ১-০০ টায় সিডনীর রকউড ক্রেমাটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সিডনিতে বসবাসকারী অনেক বাংলাদেশী প্রবাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিডনিতে পরিচিত/অপরিচিত কয়েকজনের কাছে তার বাসার ঠিকানা চেয়ে ইমেইল পাঠালাম। এরমধ্যে সাড়া মিলল কামরুল আহসান খান, প্রবীর মিত্র, গবেষক বীণা ডি'কস্টা এবং আমার ব্যাচমেট (রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ৯ম ব্যাচ) মাহবুব আহমেদের [তপন] কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত ইন্টারনেটেই পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা। আমাদের আনুষ্ঠানিক সফরের মাঝে কীভাবে কখন ক্যানবেরা-সিডনিতে যাব, জিওফ্রে ডেভিসের ছেলে উইলিয়মের সঙ্গে দেখা করব এবং ডেভিসের বাড়িতে যাব - এসব নিয়ে সিডনি প্রবাসীদের সঙ্গে ই-মেইলে সব ঠিক করে ফেললাম।

সিডনিতে পৌঁছালাম ২৯ মে বিকালে। পরদিন সকালে বন্ধু মাহবুব এল হোটেলে। ১৬ বছর পর দেখা! কিন্তু মনের মিল-অভিব্যক্তিটি সেই একই রকমের! সে, ভাবী [কাকতালীয়ভাবে তার নামও বীণা!] এবং মাহবুব মিলে গেলাম ক্যানবেরায়; আমাদের আরেক ব্যাচমেট এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ার বিপুলের বাড়িতে। সেখানেই ৩১ তারিখ সকালে বীণা ডি'কস্টার উদ্যোগে আয়োজিত হল, সময় প্রকাশন কর্তৃক বইমেলা ২০০৯-এ প্রকাশিত, আমার 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' বইটি নিয়ে আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন বিশেষত 'সিডনি দৃষ্টিপাত'-এর সদস্যরা। কামরুল আহসান এবং বীণার কাছ থেকে জানলাম যে কীভাবে তারা খুঁজে বের করেছিলেন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মহান সেবক ডা. জিওফ্রে ডেভিসকে। ওইদিন বিকেলে ফিরলাম সিডনিতে। এরপরে ২ জুন তারিখ রাতে সিডনির রেডিও ক্ষণিকার পক্ষ থেকে টিটো সোহেল আমার একটা ৩০ মিনিটের সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রচার করল; বিষয় ছিল আমার বই একাত্তরের যুদ্ধশিশু এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা।

এরমধ্যে বীণা ডি'কস্টার মাধ্যমে যোগাযোগ হল ডেভিসের ছেলে উইলিয়মের সঙ্গে। ৫ তারিখে রাতে সে এবং তার বন্ধু [শ্রীলংকার] ইয়াসমিন হোটেলে এল। উপহার দিল ডেভিসের ছবি এবং ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ডেভিসের 'চেঞ্জিং ফেস অব জেনোসাইড – বাংলাদেশ ১৯৭১-৭২' শীর্ষক প্রতিবেদনটির একটি কপি। ভালই হল; আমার সংগ্রহে থাকা কপিটির চেয়ে এটা বেশ স্পষ্ট। একসঙ্গে রাতের আহারের সময়ে সে পরদিন জিওফ্রের বাড়িতে যাওয়ার প্রোগ্রামও ঠিক করল। তারা দুজন এবং আমি ও মাহবুব মিলে তার গাড়িতে যাব। মাহবুব আহমেদ তপন হবে আমাদের ওই যুগান্তকারী পরিদর্শন-ভ্রমণের অফিসিয়াল ভিডিওগ্রাফার!

জিওফ্রের বাড়িতে!

নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরদিন দুপুরে উইলিয়ম ও ইয়াসমিন এল তপনের বাড়িতে। এরপরে চারজন মিলে রওনা দিলাম অ্যানানডেলে অবস্থিত ডেভিসের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি 'অ্যাবী'-র উদ্দেশ্যে। চালকের আসনে উইলিয়ম। সমতল রাস্তায় দ্রুতবেগে চলতে কার না ভাল লাগে! আহা! এমন সড়কপথ কবে হবে আমাদের দেশে! পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত বাড়িটির সামনে। দি অ্যাবী, ২৭২, জনস্টন স্ট্রীট, অ্যানানডেল ২০৩৮, সিডনি।

সামনে উইলিয়ম ও ইয়াসমিন। পরে ভিডিওগ্রাফার (!) তপন। শেষে আমি। প্রবেশ করলাম বাড়ির আঙিনায়। সড়ক থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত বাড়িটি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম ওপরে। সামনে খোলা চত্বর। বারান্দার মতো রেলিং ঘেরা। এক কোণায় একটা ভাস্কর্য। বাড়ির চেহারায় প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আভিজাত্য। কতকটা আমাদের দেশের রাজবাড়িগুলোর মতোই। উইলিয়মের আহ্বানে ভেতরে গেলাম। নীচতলায় কয়েকটা ঘর। ডেভিসের শখ ছিল বেড়ালের। তার পোষা বেড়ালের সংখ্যা ছিল এক ডজনেরও বেশি! বারান্দায় দেখা মিলল কয়েকটা বেড়ালের। মনিবের অবর্তমানে কিছুটা ম্রিয়মান মনে হল বৈকি। একটা কথা বলা প্রয়োজন। দেশ থেকে রওনা হওয়ার আগেই ইন্টারনেটে জেনেছি যে, মাত্র দু'সপ্তাহ খানেক আগে নিলামে বিক্রী হয়ে গেছে বাড়িটির যাবতীয় জিনিসপত্র। চোখে পড়ল যে, ক্রেতার লোকজন সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেসব।

পুরো বাড়ি জুড়ে বইপত্রের সংখ্যাই বেশি; বিষয়: কলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, যুদ্ধ, কমেডি, জীবনী, এনসাইক্লোপেডিয়া ইত্যাদি। এছাড়া, বইয়ের তাক, ক্যাবিনেট, ডেস্ক, গৃহস্থালির তৈজসপত্র, কাপড়চোপড়, গানের রেকর্ড এবং

রেকর্ড প্লেয়ার। সঙ্গীতপ্রেমী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ডেভিসের দাদা। সেই দাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডেভিস ইলেক্ট্রো কোম্পানী। বেতার সম্প্রচারের প্রাথমিক পর্বেও ছিল তার আগ্রহ। সেকারণে শৈশব থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন ডেভিস। তার সংগ্রহের তালিকায় আছে ৩০,০০০ রেকর্ড (লং-প্লে এবং ৭৮ আরপিএম) এবং বিচিত্র ধরনের বাদ্যযন্ত্র। বিশেষ করে একটি ব্রডউড গ্র্যান্ড পিয়ানো। সারা বাড়িতে সেসব সংগ্রহের চিহ্নও চোখে পড়ছে। ঘরে ঘরে ঘুরছি; আর সেইসঙ্গে চলছে আমার আর উইলিয়মের কথোপকথন। বলাই বাহুল্য যে পাশাপাশি চলছে চলচ্চিত্রায়ন!

সুবিশাল বাড়ি। বাড়িটির দুটি অংশ। পেছনের অংশটি আরো বড় এবং তিন তলা বিশিষ্ট। দুই অংশের মাঝে সিঁড়ি; কারণ, পেছনের অংশটি বেশ উঁচুতে অবস্থিত। লৌহ-নির্মিত রেলিং। সারাবাড়িতে দৃষ্টিনন্দন ঝাড়বাতি, ঘড়ি এবং আসবাবপত্র। কক্ষের সংখ্যা পঞ্চাশ! চারপাশে প্রচুর গাছপালা; সবুজের আধিক্য এত বেশি যে দূর থেকে বাড়িটিকে দেখে ছোটখাট পার্কের মতোই মনে হয়। বাড়িতে ডেভিসের আরো বংশধর-আত্মীয়রা বসবাস করে। একফাঁকে ডেভিসের কন্যা ফ্রান্সেসকা এসে দেখা করে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম দোতলায়। নিলামে বিক্রী হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় ঘরই ফাঁকা বা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ওপরের ঘরে রাস্তার দিকে ঘেরা বারান্দা। খেয়াল করলাম যে সেখান থেকে দূরে অবস্থিত সিডনি হারবার ব্রিজ এবং অপেরা হাউজের শীর্ষ দৃশ্যমান। এখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। কথোপকথনের মাঝ দিয়ে উইলিয়ম এবং ইয়াসমিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হল ডেভিসকে ঘিরে তাদের স্মৃতিগাথা। কীভাবে তার মাঝে বাংলাদেশ জীবন্ত হয়ে বেঁচে ছিল, কিভাবে তিনি প্রাত্যহিক জীবনে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা শোনাতেন – সবকিছু শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাই আমি আর তপন। ভাবছিলাম – সুদূর অস্ট্রেলিয়ার একজন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধনারী ও যুদ্ধশিশুদের সেবায় নিয়োজিত মানুষটি আমাদের বাংলাদেশে যুদ্ধশিশুদের মতোই 'বিস্মৃত'! সিডনিতে এসে জানলাম যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, তার জীবদ্দশায়, ব্যক্তি পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি ছাড়া, বাংলাদেশের সরকার বা কোনো সংস্থা থেকে কখনোই কেউ ডেভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

বাড়ির আঙিনায় বাগান। বিচিত্র ধরনের গাছপালা। বাগানের মাঝে বেলেপাথরের (স্যান্ডস্টোন) স্থাপত্য, রোপনকারী, স্নানাগার, লণ্ঠন, ধাতব লিফট-কেজ এবং অন্যান্য স্থাপত্য-নিদর্শন। বাগানের একপাশে চিড়িয়াখানা। ডেভিস বেঁচে থাকতে জীবজন্তু বিশেষত পাখি ছিল। এখানেই উইলিয়ম নিয়ে গেল সেলার বা নীচের ঘরে। এই ঘরটি ছিল ডেভিসের একান্ত কক্ষ। চিকিৎসা

গবেষণা বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গানবাজনা শুনতেন এখানেই। একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকের শখ – সঙ্গীত, প্রাণী এবং বৃক্ষলতা; নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ একজন আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন তিনি।

ঐতিহ্যবাহী অ্যাবী

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের সিডনি শহরের অ্যানানডেল সাব-আর্ব (উপশহর) এলাকায় জনস্টন স্ট্রীটে অবস্থিত 'অ্যাবী' নামের বাড়িটি সরকারিভাবে সিডনির রেজিস্টার অব দ্য ন্যাশনাল এস্টেট এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের হেরিটেজ রেজিস্টারে নিবন্ধিত ২৪টি 'হেরিটেজ হোমের' অন্যতম। সিডনি শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। জনস্টন স্ট্রিটেরও রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটাই সিডনি শহরের প্রথম ১০০ ফুট প্রশস্ত সড়ক। নির্মাণের পরে প্রায় এক শতকেরও বেশি সময় ধরে এই বাড়িটির ৫৬ মিটার উঁচু গম্বুজ-সদৃশ চূড়াটিই ছিল সিডনিতে সর্বোচ্চ। পরে সিডনিতে ৭০ মিটার উঁচু সেন্ট মেরিজ ক্যাথেড্রাল নির্মিত হয় ২০০০ সালে।

ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসী জন ইয়ং নির্মাণ করেছিল দি অ্যাবী। পেশায় ছিলেন একজন নির্মাণ-মিস্ত্রী বা রাজমিস্ত্রী। মেলবোর্নে কিছুদিন কাজ করার পরে চলে আসেন সিডনিতে। ১৮৭৭ সালে অ্যানানডেলে জমি কেনেন। উদ্দেশ্য ছিল সিডনি হারবারের পাশে অবস্থিত সিডনির সবেচেয়ে চমৎকার 'ডারলিং পয়েন্ট' সার্ব-আর্বের চেয়েও আকর্ষণীয় একটা এলাকা তৈরি করার। সেই অনুযায়ী নির্মাণ করেন আটটি অসাধারণ অভিজাত দৃষ্টিনন্দন বাড়িঃ দি অ্যাবী, অয়বিন, কেনিলওয়ার্থ, রোজেলা (কেন্টভিল – ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে), গ্রেবা, হকিংডন, হাইরয়েড এবং ক্লেয়ারমন্ট (ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে)। স্কটিশ ঢঙে বিলাসী-আলস্যে নির্মিত কাল্পনিক রোমান্টিক 'অ্যাবী' ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যবহার করেছিলেন সেসময়ে সদ্য-আবিস্কৃত রি-ইনফোর্সড কংক্রিট। ভিক্টোরিয়ান পাথরে গোথিক এবং প্রাক-র‍্যাফেল ঢঙে নির্মিত বাড়িটি বৈশিষ্ট্যে অনন্য। বাইরে এবং ভেতরের দেয়ালে দেয়ালে স্টেনসিল-কাজ, হাতে আঁকা প্যানেল, কাঠের স্থাপত্যকর্ম, গোথিক ভল্ট এবং ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য টাওয়ার। প্রবেশ-তোরণ, ত্রিকোণাকার ছাদ, গম্বুজ, খিলান – সবকিছুতেই ভিক্টোরিয়ান ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ নির্মাণশৈলীর ছোঁয়া। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছিল ১৮৮২ সালে।

স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ইয়ং নির্মাণ করেছিলেন বাড়িটি। কিন্তু তারা কখনোই বসবাস করেনি এখানে। তারা বাস করতো রোজেলা উপসাগরের পাশে কেন্টভিল নামের বাড়িটিতে। ১৮৮৭ সাল থেকে অ্যাবীর অংশবিশেষ ব্যবহৃত

হয়েছে একটা বেসরকারি বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন হিসেবে। ১৯২৪ সালে এটাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে 'ফ্ল্যাটের' রূপ দেয়া হয়। ১৯৫৯ সালে বেতার প্রকৌশলী ল্যান্সেলট ডেভিস, তার পুত্র সিডনির শৈল্য-চিকিৎসক [আমাদের আলোচিত] জিওফ্রে এল আর ডেভিসের জন্য, ৪৫ হাজার ডলারে ক্রয় করেন বাড়িটি। এরপরে দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটির মূলরূপ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে দৃষ্টি ছিল ডেভিসের। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এটা থাকে ডেভিস পরিবারের মালিকানায়। ২০০৮ সালে জিওফ্রে ডেভিসের মৃত্যুর পরে ২০০৯ সালে মে মাসে নিলামে বিক্রী হয়ে যায় বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র। পরে ২০০৯ সালেরই নভেম্বরে ৪.৮৬ মিলিয়ন ডলারে বিক্রী হয়ে যায় পুরো বাড়িটি। অ্যানানডেল এলাকায় বিক্রীত বাড়িসমূহের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ মূল্যমানের! এর পূর্বে ২০০৭ সালে কেনিলওয়ার্থ বিক্রী হয়েছিল ৩.৩৫ মিলিয়ন ডলারে।

মজার তথ্য!

জিওফ্রে ডেভিসের এক কন্যা জার্ভেস ডেভিস দাবি করে যে বাড়িটি ভুতুড়ে! বিভিন্ন সময়ে সে অশরীরি উপস্থিতি অনুভব করেছেন। এমনকি সাদা পোশাক পরা একজন নারীকে প্রায়শ দেখা যায় বাড়ির ভেতরে! ১৯৭০ দশকে ভূত-শিকারীর দল 'একটোপ্লাজমিক মেশিন' দিয়ে বাড়িটি পরখও করেছে। ডেভিসের কন্যা ফ্রান্সেসকা বিশ্বাস করে যে ডেভিসের পোষা বিড়ালগুলো অশরীরি আত্মার উপস্থিতি টের পেয়ে থাকে।

বিদায়!

আমাদের দেশের এক স্পর্শকাতর পর্বে ডেভিসের নিঃস্বার্থ অবদান অতুলনীয়। বারবার মনে পড়ছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে লিখতে লিখতে একাত্ম হয়ে গিয়েছি এই মহান ব্যক্তিটির সঙ্গে। আজ তার বাড়িতে আমি! কিন্তু তিনি নেই! তবে প্রতিটি ঘরেই আমি যেন শুনতে পাচ্ছি তার নিঃশ্বাস নিঃসৃত বাংলাদেশের জন্য ভালবাসা। উইলিয়মের মাঝে যেন খুঁজে পাচ্ছি ডেভিসের প্রতিচ্ছায়া। আবেগঘন পরিবেশে উইলিয়মকেও মনে হল বিদায় দিতে চাইছে না। 'কতকটা অনিচ্ছাতেই' সমাপ্ত করলাম আমাদের পরিদর্শন। ফিরলাম 'জিওফ্রে ডেভিসের স্মৃতিবিজড়িত অ্যাবী' থেকে। উইলিয়ম পৌঁছে দিয়ে গেল তপনের বাড়িতে। আমার 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' বইটি উপহার হিসেবে দিলাম উইলিয়মকে। বাংলায় লেখা বইয়ের অবোধ্য লেখার মাঝে যুদ্ধশিশু সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ছবি দেখে খুবই খুশি সে। বিদায়বেলায় বলল যে বাংলাদেশে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিমেল, আরিফ, নীরা প্রমুখ কর্তৃক নির্মীয়মান 'যুদ্ধশিশু' তথ্য-চলচ্চিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশে যাবে সে। খুবই ভাল লাগল। হাসিমুখে বললাম, নিয়ে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে কাটানো সময়ের জীবন্ত স্মৃতি। প্রিয়বন্ধু চৌকস ভিডিওগ্রাফার মাহবুব আহমেদ তপনের ক্যামেরায় ধারণ করা জিওফ্রে ডেভিসের বাড়ি অ্যাবীর এক ঘণ্টার ভিডিওচিত্র। তোমার এবং ইয়াসমিনের আন্তরিকতায় মুগ্ধ আমরা। বাংলাদেশে দেখা হবে!

তথ্যসূত্র : উইকিপেডিয়া, সিডনি প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে কথোপকথন এবং নিজের অভিজ্ঞতা

লেখক : কিশোর মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর-৭ (sajidocean@yahoo.com)

১৯৭২-এ বাংলাদেশে ড. জিওফ্রে ডেভিস

১৯৭২-এ বাংলাদেশে একজন সহযোগীর সাথে ড. জিওফ্রে ডেভিস

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর বাড়িতে লেখক ও মাহবুব আহমেদ তপন

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর বাড়িতে লেখক, উইলিয়াম ডেভিস ও মাহবুব আহমেদ তপন

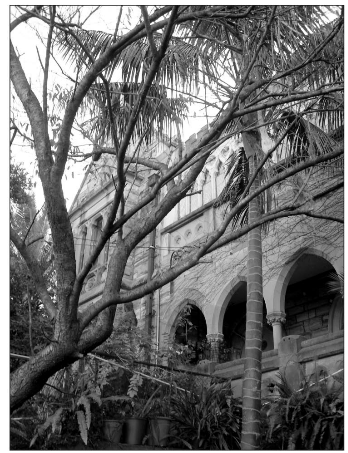

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর বাড়ি

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর বাড়িতে উইলিয়াম ডেভিস ও তার বান্ধবীর সাথে লেখক

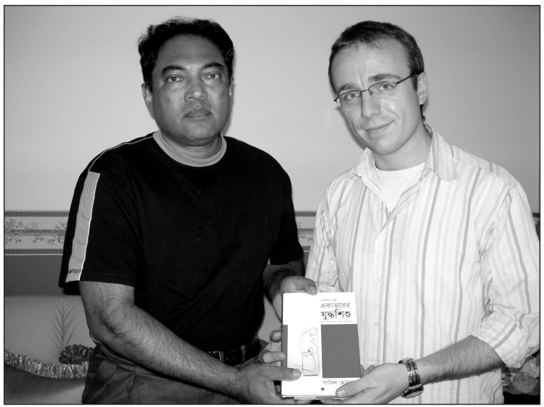

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর পুত্র উইলিয়াম ডেভিসকে প্রকাশিত
একাত্তরের যুদ্ধশিশু বই উপহার দিচ্ছেন লেখখ

সিডনিতে ড. জিওফ্রে ডেভিস-এর বাড়ি

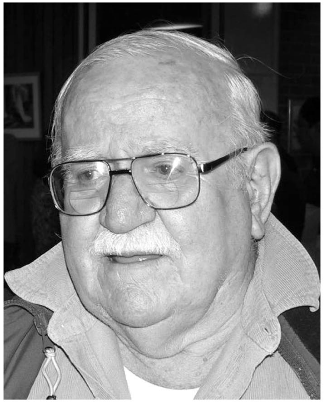

ড. জিওফ্রে ডেভিস

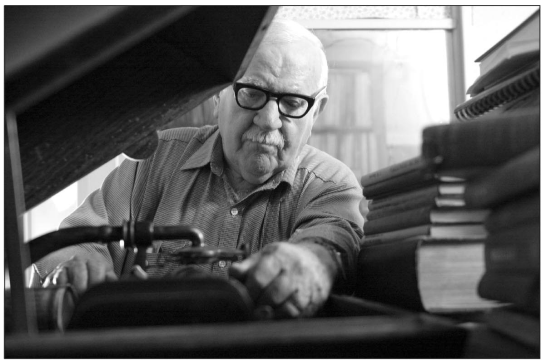

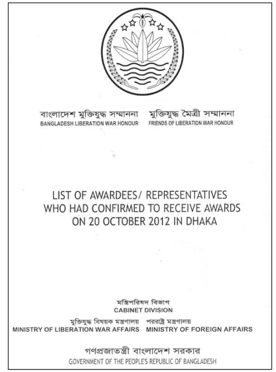

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা
BANGLADESH LIBERATION WAR HONOUR FRIENDS OF LIBERATION WAR HONOUR

LIST OF AWARDEES/ REPRESENTATIVES
WHO HAD CONFIRMED TO RECEIVE AWARDS
ON 20 OCTOBER 2012 IN DHAKA

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
CABINET DIVISION

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

FRIENDS OF LIBERATION WAR HONOUR

SN	Name	Representative	Relation	Country
27.	Late Janab Mansur Ali Former Deputy Minister, Tripura, India	Janab Baharul Islam Majumder	Son	India
28.	Late Begum Gauri Ayyub Professor and Social Worker, India	Dr. Pushan Ayyub	Son	India
29.	Late Janab Kaifi Azmi Poet and Lyricist, India	Begum Shabana Azmi	daughter	India
30.	Late Shri Dipendranath Bandyopadhyay Author and Journalist, India	Shri Meghandranath Bandopadhyay	Son	India
31.	Late Shri Sibnath Banerjee Politician, India	Barrister Jnan Banerjee	Son	India
32.	Late Shri Anil Bhattacharya Journalist, India	Shrimati Sunanda Bhattacharjee	wife	India
33.	Late Shri Bhupen Datta Bhaumik Journalist, India	Shri Biret Dutta Bhaumik	Son	India
34.	Late Dr. Sisir Kumar Bose Physician, India	Shrimati Krishna Bose	wife	India
35.	Shri Nirendranath Chakraverti Poet, India	Shri Krishnarup Chakraborty	Son	India
36.	Late Shri Nripen Chakraverti Former Chief Minister and Leader of the Communist Party (Marxist), Tripura, India	Shrimati Rupa Ganguly	Niece	India
37.	Late Donald Chesworth Politician, UK	Mr. Mark Kiddle	Representative	UK
38.	Late Dr. Geofrey Davis Physician, Australia	Mr. William Davis	Son	Australia
39.	Late Shrimati Maitreyi Devi Novelist, Poet and Social Worker, India	Shri Pryadarshi Sen	Son	India
40.	Professor Bidhu Bhushan Datta Professor and Social Worker, India	Shri Sabyasachi Dutta	Son	India
41.	Shaheed Lance Naik Albert Ekka Param Vir Chakra 14 Guard Regiment, Indian Army, India	Shrimati Balamdin Ekka	wife	India
42.	Shri Santosh Kumar Ghosh Journalist, India	Shrimati Kakoli Chakraborty	Daughter	India

ড. জিওফ্রে ডেভিসকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্মাননা পদক প্রদান

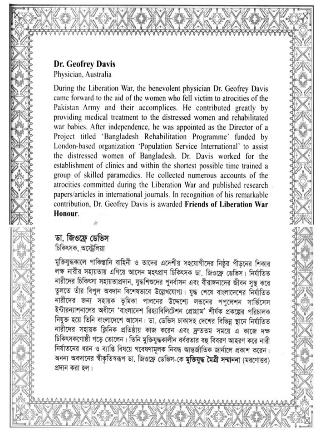

Dr. Geofrey Davis
Physician, Australia

During the Liberation War, the benevolent physician Dr. Geofrey Davis came forward to the aid of the women who fell victim to atrocities of the Pakistan Army and their accomplices. He contributed greatly by providing medical treatment to the distressed women and rehabilitated war babies. After independence, he was appointed as the Director of a Project titled 'Bangladesh Rehabilitation Programme' funded by London-based organization 'Population Service International' to assist the distressed women of Bangladesh. Dr. Davis worked for the establishment of clinics and within the shortest possible time trained a group of skilled paramedics. He collected numerous accounts of the atrocities committed during the Liberation War and published research papers/articles in international journals. In recognition of his remarkable contribution, Dr. Geofrey Davis is awarded **Friends of Liberation War Honour**.

ডা. জিওফ্রে ডেভিস
চিকিৎসক, অস্ট্রেলিয়া

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নিষ্ঠুর পীড়নের শিকার লক্ষ নারীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন মহৎপ্রাণ চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস। নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা সহায়তাপ্রদান, যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসন এবং বীরাঙ্গনাদের জীবন সুস্থ করে তুলতে তাঁর বিপুল অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশের নির্যাতিত নারীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে লন্ডনের পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনালের অধীনে 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক নিযুক্ত হয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। ডা. ডেভিস ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত নারীদের সহায়ক ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন এবং দ্রুততম সময়ে এ কাজে দক্ষ চিকিৎসকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন বর্বরতার বহু বিবরণ আহরণ করে নারী নির্যাতনের ধরন ও ব্যাপ্তি বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেন। অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডা. জিওফ্রে ডেভিস-কে **মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা** (মরণোত্তর) প্রদান করা হল।